পুরানো কথা

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

নিবেদন

আমার 'পুরানো কথা'র এই অংশ ত্রৈমাসিক পত্রিকা "পরিচয়"এ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকার

অনেক দিনের কথা। শাহজাদা সেলিম সবে জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছেন, আর মেহেরউন্নিসাকে ছিনিয়ে এনে তাঁর জহান আলো করার ফন্দি আঁটছেন। সেই সময়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে এক কুঁড়েঘরে অশীতিপর এক ফকির বাস করেন। বৃদ্ধ হয়েছেন, আর ঘরের বাহির হন না। বহু লোক তাঁর কাছে আসে, পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য নয়, গল্প শুনতে। ফকির রাজা-উজিরের পুরানো গল্প অনেক করেন। সব গল্প যে নিছক সত্য তা বলা যায় না, তবে সত্য-মূলক বটে। আকবর বাদশাহের আমলে অনেক বৎসর ধরে প্রতিদিন এই শাহ সাহেব রাজধানীর এক প্রশস্ত রাজপথে ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে বসতেন। নীরবে বসে থাকতেন। কখনও 'এক পয়সা দাও বাবা' বলে লোককে বিরক্ত করতেন না। তবু অযাচিত দানে তাঁর ভাণ্ড রোজ ছাপিয়ে উঠত। কেউ কেউ অলস অকর্মণ্য বলে গালিও দিত না, এমন নয়। তবে ফকির গালিগালাজ গায়ে মাখতেন না, ভিক্ষা-লব্ধ ধন নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় আল্লার নাম করতে করতে বাসায় ফিরতেন। সেই রাজপথে অবিরাম জনস্রোত বয়ে যেত— রাজা মহারাজা আমীর ওমরাহ সিপাহী সৌদাগর সব রকমই। ফকির সবাইকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন, সবাইকে পরিচিত বন্ধু বলে মনে করতেন। এক শীতের সন্ধ্যায় খোদ বাদশাহ সেই পথে যেতে যেতে তাঁকে এক কাশ্মীরী শাল বখশিশ করেন। আর একবার মিঞা তানসেন তাঁকে দুই আশরফী দান করবার সময় সুর করে কি এক গজল গেয়ে দিয়েছিলেন। ফৈজী, বীরবল, আবুল ফজল, টোডরমল এদের হাত থেকে তো কতবারই ভিক্ষা পেয়েছিলেন। মানসিংহ কাবুল থেকে বিজয়বাহিনী নিয়ে ফেরবার পথে ফকিরকে পাঁচ আশরফী দিয়ে প্রণাম করে দুয়া চেয়েছিলেন। এই রকম নানা কাহিনী ফকিরের সঞ্চয় ছিল। ডালপালা দিয়ে এই সব পরের কথা বলাই ছিল তাঁর বৃদ্ধ বয়সের পেশা। নিজের কথা বলতেন না, কারণ বলবার মতো কিছু ছিল না। লোকরঞ্জনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

আমার অবস্থাও কতকটা এই শাহ্ সাহেবের মতো। যে যুগে অর্ধশতাব্দীর বেশি কাটিয়েছি সে যুগ আকবরের যুগের মতো সমৃদ্ধ না হলেও ভারতের ইতিহাসে এক মহাসন্ধিস্থল। ফকিরের মতো আমিও এই পঞ্চাশ বৎসর ধরে অনেক অযাচিত দান পেয়েছি আর নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছি। সে সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বন্ধুমহলে অনেক গল্পই করে থাকি। তারই দু-দশটা নিয়ে আজ সাহস করে এই বড়ো আসরে হাজির হয়েছি। পড়ে কারও ভালো লাগলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হবে। একটা ছোট গল্প বলে আমার মনের কথাটা আরও পরিষ্কার করে নিই। এক দিন ভোরের বেলায় এক বলদ তার মুনিবের ক্ষেতে লাঙল টানছিল। সেই সময় তার এক স্বজাতি সেখান দিয়ে যেতে যেতে তাকে সম্ভাষণ করে বললে, 'কি ভাই, এত ভোরে করছ কি?' বলদ কিছু বলবার আগেই, তার শিঙে বসেছিল এক মাছি, সে গম্ভীর গলায় জবাব দিলে, 'আমরা ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছি।' ঐ মাছির মতো আমিও ঘটনাচক্রে শৃঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত হয়েছি, কিন্তু 'লাঙল দিচ্ছি', এ কথা মনে করার মতো কল্পনাশক্তি কখনও হয় নেই।

উত্তরাধিকার স্বত্রে আমি বর্ধমান জেলার লোক। বর্ধমানের নাম না শুনেছেন এমন কি কেউ আছেন? যদি থাকেন, তো তাঁর জন্য নিজের জেলার গুণগান একটু করব। একদিন সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজকুমার সুন্দর বহু আয়াসে এইখানে বিদ্যালাভ করেন। লাভ করার আগে কিন্তু মশানে প্রায় নিজের মাথাটা দিয়ে ফেলেছিলেন। সুন্দর যা পারেন নেই, শের আফগান সপ্তদশ শতাব্দীতে সেটা করলেন। কাঁচা মাথাটা দিলেন, মেহেরউন্নিসাকে বিয়ে করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। অনেক দিন গেল, আবার একজন এখানে মাথা দিলেন। তিনি হিন্দু বীর শোভাসিংহ। মোগলসৈন্যকে হারিয়ে দিয়ে মেদিনীপুর হতে অপ্রতিহত-গতিতে মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বর্ধমানে মতিচ্ছন্ন ধরল। রাত্রে শিবিরে রাজকুমারীর ছোরার ঘায়ে তাঁর হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন শেষ হল। ইদানীং, কই আর, এ রকম ঘটনা বর্ধমানে হওয়ার কথা শুনি নেই। সব চুপচাপ।

এই বিখ্যাত জেলার এক প্রান্তে দামোদর পারে অতি ক্ষুদ্র এক গ্রামে আমার বাড়ি। দু-তিন পুরুষ আগে গ্রামখানা আমাদেরই ছিল। শুনেছি প্রপিতামহ-মহাশয় চাষিদের উপর রাগ করে তাদের জব্দ করবার অভিপ্রায়ে রাতারাতি এক নামজাদা জবরদস্ত জমিদারের কাছে বেচে দেন। সেই থেকে আমরাও নিজ গ্রামে প্রজা হয়ে গেলাম। নিকটস্থ দু-একটা গ্রামের এক-আধ পাই বখরা থাকার দরুন একেবারে প্রলেটেরিয়েট শ্রেণীভুক্ত হওয়া গেল না। 'গাঁয়ের বাবুরা' নামটা রইল। পিতামহ নিরীহ লোক ছিলেন, তবে পুরানো বাড়ির দেউড়ির চালায় লুকানো শ'খানেক মরচে-পড়া সড়কির মাথা একবার ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। এক সময় সেগুলো ব্যবহারে লাগত মনে করলে দোষ হয় না। আমরা শাক্তবংশ বটে, কিন্তু সড়কি দিয়ে তো আর পাঁঠাবলি হয় না। বর্ধমান জেলার নামও খারাপ ছিল। শুনতে পাই, যখন খ্যাতনামা কাপ্তেন শ্লীম্যান ঠগী দমন করে

এলেন তখন কোম্পানি-বাহাদুর আমাদের জেলার লোককে শান্তশিষ্ট করবার ভার তাঁকে দেন। তিনি এমন জোরে শান্তিস্থাপন করেছিলেন যে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। এখনও খায় কি না, জানি না। কারণ আবার যা দিনকাল পড়েছে, গোরুর কথা দূরে থাক, ছাগলেও বাঘসিংহীর জল কেড়ে খাচ্ছে।

আমার মামার বাড়ি রায়না। গ্রামটা এক সময়ে সকলেই জানত, তবে 'ডাকাতে রায়না' এই নামে। বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডাকাইতে জমিদারে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ভব্য শিষ্ট আমরা এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই, কিন্তু কথাটা সত্য। আমার মাতামহকে ছেলেবেলায় দেখেছি। সেকালের গ্রাম্য জমিদারের দোষগুণ সবই তাঁ'তে ছিল, কিন্তু মানুষের মতন মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখলেই একটা রোমান্টিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসাতে প্রাণ ভরে উঠত। তিনি রায়খাদে কি দামোদরের চরে ডাকাতি কখনও করেন নেই বটে, কিন্তু আশ-পাশের যত পাক, লেঠেল, ঠ্যাঙাড়ে তাঁকে যমের মতন ভয় করত। অনেকেই লাঠি খেলায় তাঁর সাকরেদ ছিল, আর জানত যে তিনি নিজে লাঠি ধরলে দশজন লোকের মওড়া নিতে পারেন। দাদামশায়ের প্রধান কাজ ছিল প্রতিবেশী জমিদারদের সঙ্গে দাঙ্গা করা। এই করে শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। আমার মনে আছে একদিন বলেছিলেন, "—কোম্পানি জেলায় জেলায় যে-রকম কাজী কোটাল বসিয়েছে, আর ভদ্রলোকের বাঁচবার উপায় রাখলে না।" সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। আমাকে এক চমৎকার কুকরী ও আমার দুই ভাইকে এক তলোয়ার ও এক সাঁজোয়া উপহার দিয়েছিলেন। সেগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ করেন নেই, তবে ইঙ্গিত করেছিলেন যে কুকরীটা সব-রকম রক্তই খেয়েছে। আমি যে যুগের লোক, তাকে সব-রকম খোরাক আর কোথা থেকে দেব, তবে অনেক অভ্যাসের পর ছেলেবেলায় দু-চারটে ছাগমুণ্ড কেটেছি। স্বয়ং দেবী যখন আজ ছাগ-রক্তে তুষ্ট, তখন খড়্গের তুষ্টি হয় নেই, মনে করার কারণ নেই। দাদামহাশয়ই বা ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে তাঁর হাতিয়ারকে নররক্ত কী করে যুগিয়েছিলেন, তা পাঠককে বোঝানো দরকার। তাঁর রীতি এই ছিল যে প্রতিপক্ষকে খবর না দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করতেন না। কারও সঙ্গে মন-কষাকষি হলে তাকে এই রকম একটা চিঠি দিতেন, "কাল ভোর চারটের সময় আমি অমুক গ্রামে আমার কলুপুকুরে মাছ ধরতে যাব, আপনার রুচি হয় তো আমাকে বাধা দেবেন।" কলুপুকুরের মালিকী সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার আছে কি? বিপক্ষ রাত তনটা হতে পুকুর ঘেরাও করে বসে থাকতেন। এঁরা চারটের সময় মশাল জেলে

লাঠি হাতে উপস্থিত হলে বল পরীক্ষার পর কলুপুকুরে মাছ ধরবার হক্ সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। কোম্পানির আদালত উকিল জেঁকে বসবার আগে এর আর আপীল চলত না। সচরাচর এই রকমের হাঙ্গামায় নায়েব হুকুম দিলেই কাজ হত। বড়ো জোর দু-চারটে হাত-পা ভাঙত। কিন্তু ঝগড়ার কারণটা একটু গুরুতর হলে লড়াই হত a l'outrance, অর্থাৎ খুনের মার। খুনের মারের বিশেষত্ব এই ছিল যে কর্তা নিজে অভিযানের নেতা হয়ে গিয়ে হুকুম না দিলে লাঠি সড়কি উঠত না। হুকুমটা দিয়ে চলে গেলেই নিয়ম পালন হত, কিন্তু আমার দাদামহাশয় "Go on, lads"-এর পরিবর্তে "Come on, lads" বলাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এইরকম কোনও শুভলগ্নে তাঁর কুকরীদেবীর নররক্ত পান ঘটে থাকবে। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে আমার মাতুলকুল বৈষ্ণব। কিন্তু তাতে কাজ বাধত না। বৌদ্ধ হিন্দু, শাক্ত বৈষ্ণব, আর্য অনার্যের মহা সমন্বয়ের ক্ষেত্র এই বাংলা দেশ।

একবার তাঁর কুকরীঠাকরুণকে এই রকম রক্তপান করানোর পর দাদামহাশয় পালকি চেপে দু-আড়াই ঘণ্টায় আটক্রোশ পথ ভেঙে সদরে গিয়ে ভোর বেলা ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সঙ্গে 'জনাব, মেজাজ শরীফ' করে এলিবি প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর পালকিটার হাতল বড় করা যেত, আর আটজন বাহক একসঙ্গে কাঁধ দিয়ে সেটাকে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে পারত। সাহেব এতটা জানতেন না। তখন তো আর সি. আই. ডি. ছিল না!

সেকালে গ্রামে বিনা অনুমতিতে পুলিস ঢুকত না। আমার যে ভাই গ্রামে এখন আমাদের প্রতিনিধি, তিনি গৌরব করে বলেন, 'বড়দা, আর তো সব গেছে, কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদে আজও গাঁয়ে পুলিস ঢুকতে দিই নেই।' আজ এটা কথার কথা, কিন্তু এক সময়ে এই জাঁকের একটা গভীর অর্থ ছিল। এই ভাবের জন্যই বাংলা বারোভুঁইয়া বাংলা ছিল, আর বারোভুঁইয়া ভাঙতে সম্রাটদের এত কষ্ট পেতে হয়েছিল। রাজনীতি এসে পড়ছে, আবার গল্পের রাজ্যে আশ্রয় নিই। একটা রীতি সেকালে ছিল যে গ্রামের মাঝখান দিয়ে কেউ পালকি বা ঘোড়ায় চড়ে যেত না, গেলে গ্রামের বাবুর অসম্মান করা হত। একদিন আমার মাতামহ বৈঠকখানা বাড়িতে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে আছেন। একটা সামাজিক ব্যাপারের বিচার চলেছে। পাইক জন-কয়েক নীচে বসে আছে। এমন সময় দূরে পালকিবেহারার অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ব্যাপার কি দেখতে পাইক দুজন ছুটে গেল। তারা এসে জানালে যে পুলিসের একজন ছোকরা সাহেব পালকি করে যাচ্ছেন। কর্তা তখন তাঁর এক মুসলমান

সর্দারকে বললেন, 'যা তো একবার, এ কি মগের মুল্লুক নাকি!' সর্দার একটু পরে ছোকরা সাহেবকে নিয়ে উপস্থিত হল। দাদামহাশয় সাহেবকে গ্রামের রেওয়াজ কি, তা জানালেন। সাহেবের মোটা বুদ্ধি, সে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে না চেষ্টা করে জোর ইংরেজিতে কি কি চীৎকার করে বললে। দাদামহাশয় ইংরেজি বুঝতেন না, বেতমিজ, গোস্তাগী ইত্যাদি কয়েকটা ফারসি শব্দ প্রয়োগ করে হুকুম দিলেন যে সাহেবকে গ্রামের বাহির দিয়ে চলিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। সর্দার হুকুম পালন করলে, কিন্তু শোনা যায় যে দু-চার ঘা পাদুকা প্রহারও করেছিল। দুদিন বাদ ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব দাদামহাশয়কে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে তিনি হীরালালবাবুকে আশরাফ আদমী বলে জানতেন, কিন্তু বাবু যখন সাহেবের ইজ্জৎ রাখতে জানেন না তখন তিনিও আর বাবুর ইজ্জৎ রাখবেন না। দাদামহাশয় নিতান্ত ভালোমানুষ সেজে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি হয়েছে। যা শুনলেন তাতে বুঝলেন যে ছোকরা সাহেব জুতো মারার কথাটা প্রকাশ করে নেই। তখন তিনি বললেন, 'সাহেব, তোমরা তো কেউ কোনোও দিন আমার গ্রামের পথে পালকি চড়ে যাও না। এ সাহেব নাদান, না জেনে গিয়েছিল, তাই আমার লোক তাকে গ্রামের বাহিরের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল। সেজন্য আমি মাফ চাইছি। তাঁকে ডাকাও, তিনি যদি বলেন যে আমার আর কিছু কসুর হয়েছে, তা হলে আমাকে সাজা দিও।' ছোকরা সাহেবটি এলেন কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলেন না যে জুতো খেয়েছেন। তখন দাদামহাশয় তার কাছে মাফ চেয়ে বললেন, 'সাহেব, তুমি নূতন হাকিম, এখনও সব বোঝ না, কিন্তু এটা মনে রেখ যে তোমরা আমাদের মান না রাখলে আমরাই বা তোমাদের মান কি করে রাখব?' বড়ো সাহেবও এই মর্মে দু-চার কথা বলার পর শান্তি স্থাপন হয়ে গেল, দাদামহাশয় রোকশত নিলেন।

গল্পগুলো শুনে হয়তো অনেকে চিন্তাকুল হবেন, ভাববেন যে এই সব আধা ফিউডল্ জমিদারের ঘরে বর্তমান যুগের ভাবপ্রবণ কাব্যশাস্ত্রবিনোদী তরুণের দল কি করে জন্মালো? কিন্তু কবিভাব বাঙালীর মজ্জাগত। জয়দেব ঠাকুর যেদিন গেয়েছিলেন 'দেহি পদপল্লবমুদারং', সেদিন হতে আজ পর্যন্ত এই ভাবের ধারা শুকায় নেই। লাঠিবাজী ও ললিতকলা মোগল যুগে কিরকম পাশাপাশি চলেছিল, তার আভাস তো রবিবাবু বউ-ঠাকুরানীর হাটে দিয়েছেন। আমার দাদামহাশয়ের আমলে তো বাংলা দেশে সনেট আসে নেই, তখন যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন, হাফ আখড়াইয়ের দিন। তিনি এ সবেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দিবারাত্র ছড়া

কাটতেন, গজল আওড়াতেন, কখনও আবার যাত্রার পালা পর্যন্ত বেঁধে দিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারেও জমিদারি চাল ছিল। একটা গল্প বলি। গ্রামে এক ভিখারি বৈষ্ণব গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়াত। একবার সে কোথা হতে এক নূতন গান শিখে এসে মহা ধুম লাগিয়ে দিলে। গানটা ছিল 'নদীয়ায় অবতরি ইত্যাদি।' গোঁসাই কিন্তু জোর করে গাইত, 'নদীয়ায় রব তরী'। দাদামহাশয় সব বিষয়ে যেমন গ্রামের একচ্ছত্রী রেফারী ছিলেন, সাহিত্যেও তাই। তিনি গোঁসাইকে ডেকে অনেকবার সাবধান করে দিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী! সে আবার একদিন বৈঠকখানার সামনে এসে খুব সুর করে 'রব তরী' গাইতে লাগল। তখন আমার কবি-দাদামহাশয় হতাশ হয়ে জমিদার-দাদামহাশয়ের শরণাপন্ন হলেন। হুকুম হল, 'বোষ্টম ব্যাটাকে কয়েদ করে রাখ, যতক্ষণ না অবতরি বলতে শেখে।' কয়েক ঘণ্টা অবরোধে থেকে বৈষ্ণব শেষটা বুঝলে যে গোরাচাঁদ নদীয়ায় 'অবতরণ' করেছিলেন, 'রব তরী' করেন নেই। এ সব জমিদারের দল বাংলা দেশ থেকে আজ অন্তর্ধান হয়েছেন। হয়তো ভালোই হয়েছে! কিন্তু তাঁদের প্রভাব বোধ করি আজও পুরোদস্তুর বলবৎ রয়েছে। নইলে 'অটোক্রাট' বিহনে বাংলা দেশে কোনও কাজ চলে না কেন?

আর দেশের কথা বলব না, ক্রমশঃ প্যাক্স্ ব্রিটানিকা ও ম্যালেরিয়া দেশে জমি নিয়ে বসল। আমার বাবা গ্রাম ছেড়ে ইংরেজি শিক্ষা ও চাকরির পথে বাহির হয়ে পড়লেন। আমারও দেশে জন্ম নেওয়া হল না। কোথায় বা দামোদর অজয়, কোথায় বা সেই কাঁকরে ভরা লাল মাটি, কোথায় বা ধানের ক্ষেতের সমুদ্রের মাঝে ছোটো ছোটো গ্রাম! জন্মালেম গিয়ে সুদূর উত্তরে হিমালয়ের কোলে এক স্বাধীন রাজ্যের মন্ত্রী-মহাশয়ের ঘরে। স্বাধীন রাজ্য শুনে কেউ হাসবেন না যেন! স্বাধীনতা জিনিসটা আপেক্ষিক। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভাণ্ড-দুই মধুপানের পর মুনিবে গোলামে কোনোও তফাত থাকে না, দুজনেই সমান স্বাধীন। যাক্, আমার এই জন্মস্থান খেলাঘরের স্বাধীন রাজ্য হলেও ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ আমাদের মহারাজকে দেখলে স্বতঃই মনে হত সেকালের কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, কোশলের রাজাদের কথা। ছেলেবেলাকার কল্পনা এঁকে নিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত স্বপ্নই না দেখেছে! মহারাজ সাহেবদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাতেন। এই নিয়ে নূতন রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্দীপ্ত দেশের লোক তাঁর নিন্দাবাদও অনেক করত কিন্তু তাঁর নিজের জাতীয় গৌরব যে কত বেশি ছিল, তা যে

তাঁকে কাছাকাছি দেখেছে, সেই জানে। দুই-একটা গল্প এখানেই বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না, যদিও অনেক পরের কথা।

ইং ১৯০৩ সালে বৃটিশ বাদশাহীর ইজ্জৎ বাড়াবার জন্য লাট কার্জন সাহেব দিল্লীতে দরবারের বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর কার্জন বাহাদুরের নিজের গৌরব বৃদ্ধি যে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তা সে সময়ের সবাই জানেন। বাদশাহের খুড়া মহাশয় এসেছিলেন বটে, কিন্তু সব বিষয়ে তাঁর হল দ্বিতীয় স্থান। জিনিসটা রাজাদের ভালো লাগে নেই, কিন্তু তাঁরা বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। দুই-এক জন, যথা বড়োদার মহারাজ গায়কোয়াড়, একটু মাথা খাড়া করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মোটের উপর মহামান্য কার্জন লাটেরই জয়জয়কার হয়েছিল। যখন লাট সাহেব দিল্লী পৌছেন, আগে থেকেই রাজাদিকে (অন্ততঃ ছোটোখাটো রাজাদিকে) প্লাটফর্মের উপর সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। অনেক দেরি হওয়াতে কোমল-শরীর রাজবৃন্দ একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক বেচারা ক্ষুদ্র কাঠিয়াবাড়ি রাজা কাসি পাওয়াতে সারি ছেড়ে যেই পেছনে গেছেন, অমনি এক মহাকায় ইংরেজ সেনাপতি লাফিয়ে এসে তাঁর কাঁধ ধরে তাঁকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিলেন। রাজামহাশয়ের কাসিই পেয়েছিল, কাশীপ্রাপ্তির কোনোও ইচ্ছা ছিল না, তাই তিনি কোনো প্রতিবাদ করলেন না। সেই রাজ-শ্রেণীতে শিখ, মরাঠা, রাজপুত, পাঠান সবাই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভাবে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, যে এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটা তাঁদের নজরেই পড়ল না। তখন আমাদের মহারাজ ধীরে ধীরে গজেন্দ্র-গমনে সারি ছেড়ে দুই-একবার টহল দিলেন। দেওয়ার সময় খাপের ভেতর তলোয়ারটা একটু বোধ হয় ঝন্ ঝন্ করে থাকবে, কেননা ব্রিটিশ সেনানী সেবার চুপ করে গেলেন। গল্পটা ভালো হলেও সত্য।

এই গান্ধী-যুগের আগে আমাদের কেমন একটা অভ্যাস ছিল যে সাহেব দেখলেই মেরুদণ্ড অতি সহজে বেঁকে যেত, আর একটা অতি অমায়িক হাসি মুখখানাকে বিকৃত করে দিত। যাঁরা খুব বড়ো লোক, রাজা উজির মানুষ, তাঁদেরও এ লক্ষণ দেখেছি, আমাদের মতো সাধারণ লোকের তো কথাই নেই। আর একটা রোগ প্রবল ছিল, আমাদের খাওয়া পরা, ঘরদোর সম্বন্ধে আমরা সদাই জগতের কাছে বড়ো লজ্জিত থাকতাম। পরনের ধুতি, খাওয়ার অন্ন ব্যঞ্জন, অর্ধনগ্ন আত্মীয়স্বজন, এ সব অতি সঙ্গোপনে সাহেব-চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতাম। মহারাজের আর্যামি ছিল না, বরং ষোলো-আনা সাহেবি ছিল, কিন্তু যে রোগের কথা উপরে বলেছি তার কবলে তিনি কখনও পড়েন নেই। বৎসরান্তে যে দরবারী ভোজ হত,

তা সম্পূর্ণ বাঙালী রীতিতে। মহারাজ নিজে তো ধুতি পরতেনই, অনেক সময়ে তাঁর ইংরেজ কর্মচারীরাও ধুতি পরে আসন-পীঁড়ি হয়ে দিব্য দু হাতে খেতেন।

একবার ভাদ্র মাসে মহারাজ তাঁর ফুটবল খেলোয়াড়দের কলকাতায় খেলিয়ে কুচবেহার ফিরছিলেন। সবাই ধুতি পরা, চটি পায়ে। শিয়ালদহ স্টেশনে হঠাৎ ফ্রেজার লাটসাহেব এসে উপস্থিত। তিনিও সেই গাড়িরই যাত্রী। অর্ধনগ্ন হলেও রাজা তো বটে, কাজেই সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে দু দণ্ড সৌজন্য করে গেলেন। বোধ হয় সেই সৌজন্যের মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন Britannia rules the waves ভাব ছিল, হয়তো বা ছিল না। কিন্তু মহারাজ ঠিক করলেন সাহেবের সঙ্গে একটু বনেদী ধরণের সামাজিকতা করবেন। ট্রেন ছাড়ার পর বারাকপুরে একজন কর্মচারী (A.D.C.) পাঠিয়ে লাটবাহাদুরকে খানায় নিমন্ত্রণ হল। লাট নিমন্ত্রণ কবুল করলেন। ট্রেন রাজপ্রতিনিধি পিঠে করে সদর্পে এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে মহারাজের পার্শ্বচরেরা শশব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। স্বয়ং লাট খেতে আসবেন, অথচ মহারাজ কাপড় বদলানোর নামও করেন না! শেষে একজন প্রবীণ বয়স্য সাহস করে কথাটা পাড়লেন যে খানার পোশাক পরতে একটু সময় লাগবে, আর লাট এলেন বলে। মহারাজ হেসে বললেন, "লাট তো আর পোশাক খেতে আসছে না। তোর ইচ্ছা হয় এই গরমে জামা-জোড়া আঁট গে যা।" দুচার স্টেশন পরে লাট তলোয়ার বাঁধা কাপ্তান সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ অতিথিকে আদবকায়দা-মতো অভ্যর্থনা করে খাবার কামরায় নিয়ে গেলেন ও বললেন, "আমাদের আজ লুচি তরকারী খাওয়ার কথা, কিন্তু আপনার ইংরেজি খাদ্যও তৈরি আছে। যেমন আদেশ করবেন তেমনিই খাওয়া হবে।" জাতি-গৌরবে, সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে, একটু ধাক্কা লাগল বোধ হয়, তবু সাহেব অমায়িক হাসি-হেসে বললেন, "আজ আর স্কুয়া রোস্ট নয়, আসুন, আনন্দ করে সবাই লুচি খাওয়া যাক।" যোড়শোপচারে লুচি সেবা হল। পানীয় কোন্ দেশের প্রথামত চলল, সে সম্বন্ধে আমি খোঁজ করি নেই।

মহারাজের একটা নিন্দার কথা এখানে না বলেও থাকতে পারছি না। তিনি আমাদের বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর বড়লোকদের অনেক নোকসান করেছিলেন। এই ভদ্রলোকেরা প্রাণপণে কুচবেহারিয়ানা করতে যেতেন, কিন্তু ফল অনেক সময় বড়ো বিশ্রী হত। একটা উদাহরণ বলি। কুচবেহারের গাড়ির উপর, চাকরের উর্দির উপর, ও আসবাবপত্রে C. B. এই দুই অক্ষর ও একটা মুকুট আঁকা থাকত। সেই দেখাদেখি চারি দিকে B. B., P. P. ইত্যাদি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে

উঠল লোকে জানতে চাইলে না যে, বাগনান দুটো B কি করে হয়, পলাশীতেই বা দুটো P কোথা থেকে আসে! তার পর মুকুট, যে রাজার রাজ্য নেই, তার মুকুটই বা কোথায়? অথচ একটা কিছু তাজের মতো অক্ষরের সঙ্গে তো দেওয়া চাই! আরও গোল হল যাঁরা নামেও রাজা নন তাঁদের। তাঁরা নিজের নামের অক্ষরটা বেঁকিয়ে দুবার লিখে, উপরে একটা গোলাকার ফুলের মালা দিয়ে দিলেন। আভিজাত্যের যদি কোনোও দেবতা থাকেন তো তিনি এ-সব দেখে কি হাসিটাই না হেসেছেন! ক্রমশঃ বাংলার জমিদারেরা স্বয়ং বিদেশে গিয়ে মন্ত্রদীক্ষা সংগ্রহ করে আনতে আরম্ভ করলেন। তখন আরও অদ্ভুত কত জিনিস ঘটতে লাগল। তবে মহারাজকে আর দায়ী করবার কারণ রইল না।

আর পরনিন্দা করে কাজ নেই। একটা গল্প আছে, নৃপেন্দ্র-কর্জন-সংবাদ, সেটা পরে যথাস্থানে বলব। এখন অনেকটা পথ পিছিয়ে কুচবেহারে যেতে হবে। আমার ছেলেবেলার দেখা জিনিস দুই-একটা বলতে চাই। আমি তো একরকম বলেইছি যে আমার জন্ম, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে, রুপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে। শুধু তাই নয়, প্যারেড ময়দানে যে পেতলের তোপটা ছিল, সেটা সাতবার দাগা হয়েছিল। জ্যোতিষী-ঠাকুরের হুকুম ছিল যে তিন বৎসর বয়স হওয়া পর্যন্ত মাটিতে পা না পড়ে। তা পড়ে নেই, কোলে কোলেই ফিরতাম। অন্নপ্রাশনের দিন হাতি চড়ে মিছিল করে ঠাকুর প্রণাম করে এসেছিলাম। মহারাজ তাঁর অমাত্যকে সত্যি ভালোবাসতেন।

একটু বড় হয়ে নিজের শৈশবের সব গল্প শুনতাম। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের রূপকথাও কম শুনি নেই। এর ফলে আমার রূপকথার রাজ্যে জীবন কাটানোরই কথা। কিন্তু ক্রমশঃ ভারতের ভাগ্য-আকাশে এমন এক ধ্রুবতারা উঠল যে, গন্তব্য পথ সম্বন্ধে ভাবী ভারত-সন্তানের আর কোনোও গোলযোগ রইল না। আমার জন্মের বিশ বৎসরের আগে দেশে যে তুফান উঠেছিল, তার জের রয়েই গেল। জগদীশপুরের কুমারসিংহের অলৌকিক সাহস, গঙ্গামায়ীর তাঁর প্রতি অসাধারণ কৃপা, ইংরেজের মকরাক্ষনীতি, অর্থাৎ গোরুর পালের আড়াল থেকে তাঁর উপর অগ্নিবাণ বর্ষণ, এই-সব গল্প-কথা অহোরাত্র বাড়ির হিন্দুস্থানী সিপাহী-বরকন্দাজদের কাছে শুনতাম। আমাদের বৈঠকখানায় একটা চীনামাটির পুতুল থাকত, তার মাথায় একটা হাঁড়ির মতো ফুলদানী ছিল। আমার গল্প-শিক্ষকেরা বলে দিয়েছিল, যে, সেটা ঝাঁসীর রানীর মূর্তি, ঐ রকম হাঁড়িতে আগুন ভরে তাঁর মাথায় চাপিয়ে তাঁকে কোম্পানি প্রাণে মারেন। কখনও বা শুনতাম, যে অশ্বত্থামা হনুমান প্রভৃতি

পৌরাণিক বীরেরা এখনও বেঁচে আছেন; তাঁদিকে কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগে অনেকবার দেখা গেছে, একদিন-না-একদিন নিশ্চয় হিন্দুর দুঃখে তাঁদের মন গলবে। সব কথাই বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতাম। শৈশবের ইতিহাস শেখা এই রকমেই হয়েছিল। কুচবেহারে দু-চার ঘর সাহেব ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল, খুব ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ি খেলাধুলো করতে অনেক যেতাম, কিন্তু তাতে কোনোও ফল হয় নেই, কারণ চারি দিকে লোকে কেবলই মনে করিয়ে দিত যে এরা আমাদের রাজার মাইনে-খাওয়া সাহেব, এ রকম সাহেব সাবেক কালেও অনেক ছিল। বাংলা পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের আগেই 'আনন্দ মঠ', 'নীল দর্পণ' পড়ে চুকেছিলাম, বুঝি বা না বুঝি। আমাদের সচরাচর আবৃত্তির পদ্য ছিল, 'বাজ্‌রে শিঙ্গা, বাজ্‌ এই রবে', 'কত কাল পরে বল ভারত রে', 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়', এই সব। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই স্থরেনবাবুর জেল হল। আমরা সবাই কালো ফিতে পরলাম। সভা করে বক্তৃতা হল, সব বুঝলাম না, কিন্তু মনে একটা স্থির বিশ্বাস হল যে একটা-কিছুর সূত্রপাত হচ্ছে। ইস্কুলে আমাদের ইতিহাসের বই ছিল হণ্টার সাহেবের ভারতবর্ষ। তার এক জায়গায় এই উল্লেখ ছিল, "His adopted son, Nana Sahib was the infamous leader of the Sepoy Mutiny"। মাস্টার মহাশয় ক্লাসে এসেই শেষ কয়েকটা কথা কেটে দিয়ে লিখে নিতে বললেন, "The illustrious leader of the Great Sepoy war"। শিক্ষা এইভাবেই চলল। স্বপ্ন যা দেখতে শিখলাম, তাও এই শিক্ষারই অনুগামী।

দেশ হতে তখনও পুরানো ব্যায়ামের অভ্যাস যায় নেই। খুব ছেলেবেলাতেই পিতৃ-আদেশে ভোরে আখড়ায় মাটি মাখতে হত। হয়তো কসরতের চেয়ে মাটি মাখা ও ছোলা খাওয়াটারই বহর বেশি ছিল, কিন্তু ছাড়ান ছিল না। সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়াও নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যেই ছিল। কখনও কখনও ছুটির দিনে বাবা আমাদের দু-চারজনকে মফঃস্বলে তাঁবুতে নিয়ে যেতেন। কদিন খুব ঘোড়ায় চড়ে নদীতে সাঁতার দিয়ে আনন্দ করে আসতাম। বড়ো ছেলেরা বন্দুক ছুঁড়তেও পেতেন। যথা সময় সে বিদ্যাও আয়ত্ত হল। তবে শিকারের দৌড় তখন পাখি পর্যন্তই ছিল, যদিচ বনের পশুরাও অপরিচিত ছিল না। বাঘ প্রায়ই আমাদের গোয়াল থেকে গোরু নিতে আসত। ক্যাম্পে গেলে তো কথাই নেই, এক-একদিন তাঁবুর আশপাশেই ডাক শুনতে পেতাম। এই সব পাঁচ রকম কারণে wholesome fear-টা (ভয়ডর) শিক্ষার অঙ্গীভূত হল না। পর-জীবনে এর জন্য ভুগতে হল অনেক।

২

ছেলেপিলের ভয়ডর না থাকাটা সেকালে যে একটা গুণের মধ্যে গণ্য হত, তা নয়। বরঞ্চ আমার বাবার আমলের ইংরেজিনবিশদের আদর্শ ছিল বিলেতের ভিক্টোরীয় যুগের Upper Ten-এর (অভিজাত মণ্ডলীর) অতিভব্যতা। সেই আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে তাঁরা একমনে সাধনা করেছিলেন, আর কবুল করতে হয় যে তাঁদের ঐ আন্তরিক সাধনা অনেকাংশে সফল হয়েছিল। লাঠিবাজী দেশ থেকে লোপ পেয়ে গেল। চিরদিনের ডানপিটে জমিদারের ছেলেরাও ক্রমশঃ শান্তশিষ্টভাবে পড়া মুখস্থ করতে লাগল। মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি লাঠিয়ালের হাত থেকে অ্যাটর্নির হাতে গিয়ে পড়তে আরম্ভ হল। এতে সরকারের খুশি হওয়ারই কথা, কারণ শান্তিরক্ষার খরচ অনেক কমে গেল। কিন্তু ফলে তা হল না। সাহেবরাই আমাদের মোহ ভাঙলেন। তাঁরা এই সুসভ্য চোস্ত ভালোমানুষ নব্য বাঙালি বাবুর কদর বুঝলেন না। কথায় কথায় কাবুলি বেলুচি গুর্খার সঙ্গে এঁদের তুলনা করে টিট্‌কারী দিতে লাগলেন। বাবুগুলো কি মানুষ, যাদের কেবল চোখ রাঙিয়ে শাসন করা যায়— এ কি একটা দেশ, যেখানে সারা বছরে একটা বন্দুক ছুঁড়তে হয় না! টেবিলে খেতে গিয়ে এরা ছুরি দেখে টেবিলের নীচে গিয়ে ভয়ে লুকোয়! এই রকম কত কথাই শুনতে হত! আমাদের তরফে উন্নতির কাজ জোরে চলল, ইজের কোর্তা পরা হল, সমাজ সংস্কার আরম্ভ হল, ইংরেজি ধরণের রাজনীতি চর্চারও গোড়াপত্তন হল, কিন্তু ইংরেজের অবজ্ঞার হাসি থামল না। অশন-বসন, ধরণ-ধারণ, সবেতেই দেশের লোককে পিছনে ফেলে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু যার লাগি চুরি করি সেই বলে চোর, সাহেবের মন পেলাম না। তখন আস্তে আস্তে আবার হাওয়া ফিরল। নূতন slogan (মন্ত্র) এল, চুলোয় যাক উন্নতি, আগে ইজ্জৎ বাঁচাও। রাজনারায়ণবাবু, বঙ্কিমবাবু, এঁরা পাগলামির গতিরোধ করতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এখন নবীন যুগ-কবি সেই কাজে লেগে গেলেন। 'বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান, পোষমানা প্রাণ' যে কি হাস্যাস্পদ জিনিস তা কবি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। 'দিগন্তে বিলীন বিশাল মরুর' মাঝে ঘোড়সওয়ার আরব-বেদুইনের ছবি এঁকে সামনে ধরে সবাইকে বললেন, কি সুন্দর এই ছবি, কি সুন্দর এই আরব, যার 'বর্শা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ'। পৃথিবী জুড়ে বিষাণ বেজেছে, সবাই নিশান নিয়ে এসেছে, 'কই রে বাঙালি কই?' বঙ্গমাতাকে প্রার্থনা করলেন, তোমার ছেলেদের গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে দাও, এদের

বাঙালি করে রেখেছ, মানুষ করে দাও। কবির এই বজ্রকণ্ঠে ডাক, যার কাছে ব্যাকুল অনুযোগ, এই শুনতে শুনতে আমরা বড়ো হলাম। কিন্তু তখনও দেশের ঘুমঘোর সম্পূর্ণ কাটে নেই। আমাদের মধ্যে মনে মনে দেশপ্রেমিক অনেক তৈরি হলেন বটে, এমন ভাবুকও অনেক উঠলেন যাঁরা নিজেদের বীরত্বে আরব-বেদুইন মনে করতেন, কিন্তু তাঁরা, ঘোড়ায় দূরে থাক, গাধায় চড়তেও শিখলেন না। কাজেই একপুরুষ আমরা দেশেরও কোনো উপকার করলাম না, বিদেশী রাজারও কোনো ক্ষতি করলাম না। এখন দেখি হাওয়া একেবারে ঘুরে গেছে। কবির বাংলা দেশে 'শান্তিতে শয়ান' শেষ হয়ে আসছে। গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়ার দল বেড়েই চলেছে। বর্শা হাতে না থাকলেও ভরসা প্রাণে একরকম নিরুদ্দেশ হয়েছে। ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তা এই যুগের রাজনৈতিকরা ঠিক করবেন। আমরা নির্দোষ, কেননা নিষ্ক্রিয়। আমাদের দৌড় ছিল বড় জোর, 'কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্'। গীতা আমাদের জন্য একটা বিশেষ রকমের জাহান্নামের ব্যবস্থা করে থাকলেও, আইনের চোখে আমরা বেকসুর খালাস।

এইবার একটু পুরানো গল্প বলে বাঙালি ও সাহেবের মধ্যে সম্বন্ধটার আভাস দিতে চেষ্টা করি। ১৮৮৮ সালে বাবার সঙ্গে পূজার ছুটিতে দার্জিলিঙ গেছলাম। লোকসমাগম খুব হয়েছিল, তবে সাহেবই বেশি। বাঙালিদের অধিকাংশই নব-প্রতিষ্ঠিত সানিটেরিয়মে জমা হয়েছিলেন। জজ চন্দ্রমাধববাবু, বর্ধমানের উকিল নলিনাক্ষবাবু ও তারাপ্রসন্নবাবু, পাটনার গুরুপ্রসাদবাবু এই রকম অনেক গণ্যমান্য লোক সে-বছর এসেছিলেন। তা ছাড়া রাজদ্বারে প্রসাদপ্রার্থী বড়লোকের আনাগোনা তো ছিলই। কিন্তু এতগুলি বাঙালি, এঁদের আমোদ-প্রমোদের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। রবিবার দিন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকেরা তবু সমাজে গিয়ে দুদণ্ড কাটাতেন। দার্জিলিঙের পুরানো বাসিন্দা মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি আমাদের বৈঠক ছিল। যখন-তখন আমরা ছেলেরা সেখানে যেতাম, ও সে বাড়ির রান্না পরীক্ষা করে আসতাম। বড়রা চৌরাস্তায় বসে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে জটলা করে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতেন। সাহেবদের নাচ গান থিয়েটার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁদের ক্লাবও সদা সরগরম। কিন্তু এক কুচবেহারের মহারাজ ছাড়া আর কাউকে তাঁরা ডাকতেন না।

হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে বহুজনসমাগম হল। আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, তাই দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার এক দাদা উঁকি মেরে সন্ধান নিয়ে এলেন যে, কর্তারা মহা উত্তেজিত হয়েছেন, শুনেছেন যে, পরের দিন লাট বেলী

সাহেব টাউন হলে এক বক্তৃতা করে বাঙালিদের গালাগালি দেবেন। অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে রাখা এক কথা, আর প্রকাশ্যে গায়ে পড়ে গালাগাল আর-এক কথা। ঠিক হল যে, নীরবে সহ্য করা হবে না, বর্ধমানের তারাপ্রসন্নবাবু বাঙালিদের তরফে চোখা চোখা কথায় জবাব দেবেন। আর আমাদের শক্ত তাকীদ দেওয়া হল যে, আমরা ছেলেরা টাউন হলে কোনোও অসভ্যতা না করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো হল। বেলী সাহেব বক্তৃতা করলেন বটে, কিন্তু বাঙালিদের নিন্দাবাদ করলেন না। ভয়ে নয়, কারণ আমরা বালকবীরের দল সেখানে যাই নেই! যা হোক, সকলেই এটা মনে করে আশ্বস্ত হলেম যে, সাহেবেরা বাঙালিদের গায়ে পড়ে অপমান করতে চান না।

কিন্তু এ স্বস্তির ভাব বজায় রইল না। একদিন ম্যাল রাস্তার উপর গোরাদের ঘোড়া, বর্শা, তলোয়ার নিয়ে খেলার এক বিরাট আয়োজন হল। সার্বজনিক রাস্তাটাকে ঘেরে বন্ধ করে দিলে। আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে, সবাই খেলা দেখতে পাব। সাজ-গোজ করে কর্তারা গেলেন, আমরাও গেলাম সঙ্গে। কিন্তু লালমুখো দৌবারিকের দল সাহেব ছাড়া কাউকে ভেতরে ছাড়লে না, দুই-একটা ঠাট্টা টিটকারির কথাও বললে। বিরক্ত হয়ে কর্তারা ঘরে ফিরে গেলেন। আমার দাদা ও আমি কিন্তু কৌশলে প্রবেশলাভ করে একেবারে মেমসাহেবদের মধ্যস্থলে বসে, জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখলাম। এমন সময় এক কাণ্ড হল। জরীর বক্‌ পরা একজন পাহাড়ী জমিদার ঘোড়ায় চড়ে ফটক পর্যন্ত এসে, এক লাফে নেমে ভেতরে ঢুকতে গেলেন। যেই ঢুকতে গেছেন, চকিতের মতো দুটো জিনিস হয়ে গেল। লালমুখো প্রহরীটা জমিদারের ঘাড়ে হাত দিলে, আর অমনি জমিদারের কুক্রীটা খাপ থেকে ফোঁস করে গোখরো সাপের ফণার মতো বেরিয়ে পড়ল। ফণা দেখে প্রহরীর হাত কাঁধ থেকে খসে পড়ল। জমিদার গম্ভীর চালে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমাদের কাছে তিনি আসতেই আমরা সসম্ভ্রমে তাঁকে স্থান করে দিলাম। নিজে মার না খেয়ে বীরত্বের মর্যাদা বজায় রাখার এমন সুযোগ কি আমরা ছাড়তে পারি! মনে একটু অব্যক্ত আনন্দের ভাব নিয়ে খেলাটা খুব উপভোগ করলাম। বাড়ি গিয়ে খুব আহ্লাদ করে সব বর্ণনা করলাম। কিন্তু কর্তাদের রাগ গেল না। পরদিন ফের বৈঠক বসল আমাদের বাড়ি। ফলে কয়েকদিন পরে মহা ধুমধাম করে সানিটেরিয়মে বিজয়াসম্মিলনী হল। তিন ঘণ্টা ধরে নানা রকম আমোদ-প্রমোদ, দৌড়-ঝাঁপ ও খাওয়া-দাওয়া হল। সাহেব শেষ পর্যন্ত কাউকে নিমন্ত্রণ করা হল না, যদিও এ-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। মনের আবেগে আমার দাদা ও আমি ইংরেজি

বাংলা দুরকম জলখাবারই ভরপুর খেলাম। এই বিজয়াসম্মিলনী সেই থেকে প্রতিবৎসরই হয়, কিন্তু এখন আর সে রকম উৎসাহ নেই। কাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আর উৎসব! সাহেবেরা তো পাহাড় একরকম আমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁদের বড় সাধের ক্লাবটিও কালো সাদা দাবার ছকের মতো হয়ে গেছে। অনেক মনের দুঃখে সেদিন এক ইংরেজি কাগজে লিখেছিল যে, দার্জিলিঙ ক্রমশঃ নেটিব ও মশকের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, as bad as the plains (প্রায় নীচের মতনই)।

সাহেব তো চিরদিনই নানা রকমের হয়। বড় সাহেব, ছোট সাহেব, কটা সাহেব, মেটে সাহেব ও বাঙালি সাহেব। যে সময়ের কথা বলছি তখন এই শেষোক্ত সাহেবদেরও উৎপাত কম ছিল না। তবে জাত-সাহেবদের হাতে এ বেচারাদের দুর্গতিও যথেষ্ট হত। ভালোই হত, নহলে কংগ্রেসাদি ব্যাপারের বড় দেরি পড়ে যেত। একবার এক জজ সাহেব (ইনি ঠিক বাঙালি ছিলেন না) পাহাড়ে গিয়ে সাহেবদের খুব বড় হোটেলে উঠেছিলেন। সচরাচর সে হোটেলে বিশুদ্ধ শুভ্র ছাড়া অন্য বর্ণের সাহেব স্থান পেত না। এই রকম পাকা বিলেতি ব্যাপার বলে, সেখানে দু-চারজন মেমসাহেব ঝিও ছিল। আমাদের জজ বাহাদুরের শ্বশুরবাড়ি বিলেতে হওয়ার দরুন তিনি কয়েকটা বিশিষ্ট অধিকার লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে, এই রকম নির্মল শুভ্র হোটেলে তিনি ঢুকতে পেতেন। হোটেলের কর্মকর্তা তাই এঁকে এবারও না বলতে পারেন নেই, কিন্তু কয়েকজন ছোকরা চা-বাগানের সাহেব ভয়ানক চটে গিয়েছিল। তারা স্থির করলে যে নিগারকে তাড়াতেই হবে। খুব গোপনে তারা ষড়যন্ত্র করলে হোটেলের এক মেম ঝির সঙ্গে। তার পরদিন সকালে চা-পানি খাওয়ার পর সবাই বারান্দায় বসে আছেন। সস্ত্রীক জজ সাহেবও রয়েছেন। এমন সময় চাকরানীটা ময়লা জলে ভরা এক মুখ-ধোবার গামলা এনে ঠক্ করে সেখানে নামিয়ে রেখে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে ম্যানেজারকে বললে, "স্যার, স্যার, কাঁচা রং, উঠে আসছে!" সমবেত সাহেব-মেমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুচকে হাসতে লাগলেন। জজ বাহাদুরের মুখ লজ্জায় বেগুনে হয়ে উঠল। তিনি সেই দিনই অন্যত্র উঠে গেলেন। এ অনেক দিনের কথা। আজকাল তো শুনতে পাই যে, শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ি দুই ভারতবর্ষে এমন সাহেবও বড় বড় হোটেলে স্থান পান। কে বলে দেশের উন্নতি হয় নেই!

আগে কটা সাহেবে মেটে সাহেবেও ভয়ানক মন কষাকষি ছিল। এখন Loyalist সভা, Royalist সভা ইত্যাদি উপলক্ষে কংগ্রেসের মুণ্ডপাত করবার জন্য

কতকটা সদ্ভাব হয়েছে। রাজনৈতিক চাল চালাবার জন্য যে মৈত্রী, সেটা কত অদ্ভুত হতে পারে, তা তো আমাদের এই কলকাতার নগর-পঞ্চায়তেই দেখা যায়। প্রায় ৪৫ বৎসর আগেকার একটা গল্প বলি। তখন সাহেবদের মধ্যে জাতিভেদ প্রবল। আমার এক জ্যাঠামহাশয় সিমলা যাচ্ছিলেন। সহযাত্রী ছিলেন একজন মেটে সাহেব। প্রয়াগে লালমুখ প্রকাণ্ড দেহ এক পল্টনের সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে চাকর-বাকর, লোক-লস্কর, তলোয়ার-বন্দুক। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, যাকে বড় সাহেব বলে, এ সেই ব্যাপার। জ্যাঠামহাশয় ও মেটে সাহেব মহাশয় দুজনেই আগন্তুককে দেখে একটু সঙ্কুচিত হলেন। অর্থাৎ কেবল মনের সংকোচ নয়. শরীরকেও যথেষ্ট সঙ্কুচিত করে বড় সাহেবের আরামে বসার জায়গা করে দিলেন। বড় সাহেব কিন্তু মেটে মহাশয়ের দিকে একবার তাকিয়েই. আমার জ্যাঠার পাশে এসে বসলেন। খুব আদব-কায়দা করে 'Good Morning, Babu' বলে গল্প জুড়ে দিলেন। জ্যাঠামহাশয় ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আশ্চর্য হলেন যে, সাহেব সাহেবের কাছে না বসে তাঁর কাছে এসে বসলেন! খানিকক্ষণ আলাপের পর কথাটা জিজ্ঞাসা করে ফেললেন। তাতে জঙ্গী সাহেব খুব চেঁচিয়েই বলেন, 'ওদের সাহেব বোলো না, বাবু। ওরা অতি ছোট জাত। আগে জানতাম না। কি করে আমার শিক্ষা হল, বলি শোনো।' বলে এক গল্প বললেন। কয়েক বছর আগে তিনি একবার রেলে সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিলেন। মাঝখানে বসেছিল দুই মেটে সাহেব। অপর দিকে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ বাঙালি বাবু ও তাঁর এক অল্প বয়স্কা মেয়ে। বাবুটি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ সাহেবের সেদিকে নজর পড়াতে দেখলেন যে, মেয়েটির মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে, আর নিতান্ত জড়সড় হয়ে ক্রমাগত একবার এদিক একবার ওদিক সরে সরে যাচ্ছে। লক্ষ করে দেখলেন যে, ফিরিঙ্গি দুটো পা দিয়ে মেয়েটির পা ঠেলছে। তার অভিভাবক তখনও কাগজ পড়ছেন, আর, দেখতে পাচ্ছেন না নয়, দেখেও দেখছেন না। দুর্বলের উপর এই অত্যাচার দেখতে দেখতে রাগে সাহেবের রক্ত মাথায় চড়ে গেল। একলাফে উঠে, কোনোও কথা না বলে, সেই দুই ফিরিঙ্গি-নন্দনের ঘাড় ধরে তাদিকে নীচে ফেললেন, আর পরের স্টেশনে বার করে দিলেন। তারা নেমে যাওয়ার পর, বৃদ্ধ বাবুটি ছোটো-খাটো এক বক্তৃতা করে সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। গল্পটা বলে সাহেব জোর গলায় জ্যাঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ফিরিঙ্গি বন্ধুর সঙ্গে কেন বসলাম না, বুঝতে পারলে বাবু?' এ গল্প শুনেছি শৈশবে। তার পর অনেক ফিরিঙ্গির সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বন্ধু বলেও

মেনে নিয়েছে। সুতরাং এ জাতের নিন্দা করায় আমার কোনো আনন্দ নেই। এরা আমাদেরই আপনার লোক, সাহেবদের নয়। আর সত্যি বড় দুর্ভাগ্য জাত। আপনার বলতে কেউ নেই। বড়লোকে মিষ্টি কথা বলে গরিব আত্মীয়দের দিয়ে ঘরের ছোট কাজগুলো করিয়ে নেয়, তালুক-মুলুক কিনে দেয় না। এই সহজ সত্যটাও এরা বোঝে না, এমনই নির্বোধ। নির্বোধ আমরাও তো বড় কম নয়। আপনার লোককে পর করে দেওয়াতে আমরা সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছি।

সাহেব বাঙালির কথা বলতে বলতে অনেক দূর এসে পড়েছি। পাঠককে আবার কুচবেহারে ফিরে যেতে হবে। একটা কথা বোঝাতে চাই যে, আমাদের কুচবেহারের আবহাওয়া অন্য শহরের আবহাওয়ার থেকে একটু আলাদা রকমের ছিল। একে তো দেশি রাজ্য, তায় একেবারে সীমান্তের উপর। প্রথম থেকেই কতকগুলো জিনিস আমরা দেখতাম, যা অন্য জেলার বাঙালি ছেলেদের নজরে আসত না। রাজ্যটি এখন ছোট বটে, কিন্তু গৌরবে এ রাজবংশ কারও কাছে খাটো ছিল না। রাজপুতানার বাহিরে খুব কম রাজ্যই আছে, যাদের জন্ম কুচবেহারের আগে। আকবরের সময় এ রাজ্য যে বেশ বড় ছিল, আইন-ই-আকবরী দেখলেই জানা যায়। প্রথম রাজা বিশ্বনাথ হতে ধারাবাহিকভাবে এই নারায়ণী বংশের রাজারা হনুমান-দণ্ডের নীচে বসে উত্তরবঙ্গ শাসন করে আসছেন। ইতিহাসের চোখে কুচবেহার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যেরই রূপান্তর। আর কামরূপ যে কত পুরানো, তা ইতিহাস পড়েও বোঝবার জো নাই। কুচবেহারের কিংবদন্তীর দিক থেকে দেখতে গেলে, প্রথম মহারাজ স্বয়ং মহাদেবের বংশসম্ভূত, ভুটানের দেবরাজের আত্মীয়। পুরাকালে দেবাদিদেব একবার তরাইয়ের বনে বেড়াতে এসে, হীরা ও জীরা বলে দুই বোনের ঘরে অতিথি হয়েছিলেন। দুই বোনের গর্ভে যে দুই সন্তান হয়, তারাই ভুটান ও বেহারের আদিপুরুষ। দুই রাজবংশই এই পুরানো আত্মীয়তা মেনে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় কতবার দেখেছি ভুটানের দূত নানা উপহার নিয়ে এল। তারা উপহার পাঠাত কত রকমের পাহাড়ের তৈরী জিনিস ও ভুটীয়া ঘোড়া। আমাদের এ'দিক থেকে যেত ঘড়ী, কলের বাজনা, বিলেতী বনাত, Sheffield-এর ছোরা ছুরী, ইংরেজী ধরণের ঘোড়ার সাজ, ইত্যাদি। আগে আগে ভুটীয়ারা দল বেঁধে শীতকালে ব্যবসা করতেও আসত। তাদের পণ্য প্রধানতঃ ছিল ঘোড়া ও কম্বল। আশ-পাশের সরকারী জেলার লোকও এই উপলক্ষে অনেক এসে জমা হত। সেকালে কুচবেহার ছিল উত্তর-বঙ্গের একটা কেন্দ্রস্থান। এই রাজ্য এক সময় পদ্মানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রঙ্গপুর জলপাইগুড়ির

জমিদাররা কুচবেহারকে কর দিতেন। ভুটানের কথা তো বলেছি। নেপালের সঙ্গেও এঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কুচবেহারের এক রাজকুমারী নেপালের রানী হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়, মোগল সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরার আগে, সেনাপতি মীরজুমলা এই প্রদেশ জয় করতে আসেন। কুচবেহারকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে দক্ষিণ সীমান্তে ফৌজ রেখে তিনি আসামের দিকে দিগ্বিজয়ে চলে যান। যেই তিনি বেরিয়ে গেলেন, প্রজারা দল বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে বললে, এইবার মোগলদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া যাক। ভীরু-স্বভাব রাজা (বোধ হয় লক্ষ্মীনারায়ণ) রাজী হলেন না। তখন প্রজারা তাঁকে কয়েদ করে রেখে নিজেরা দিল্লীর ফৌজ তাড়িয়ে দিয়ে এল। এর পরিণাম কত ভয়ানক হতে পারত, তা এই মূর্খগুলো একবারও ভাবল না! কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াল না, কেননা মীরজুমলা সাহেব আসামেই মারা গেলেন, আর তাঁর যোদ্ধারা কালাজ্বর ইত্যাদির সঙ্গে যুঝতে না পেরে অন্য পথে বাড়ি ফিরলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস লাটের সময় কোম্পানির সঙ্গে কুচবেহারের সন্ধি হয়। তার পরেও অনেকদিন এ রাজ্যের কতকটা কদর ছিল, কারণ শেষ ভুটান যুদ্ধের সময় পর্যন্ত রীতিমত যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এঁরা রাখতে পেতেন। সেটা আমার সময়ের আগে। আমি যে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য দেখেছিলাম, সে নিতান্তই খেলাঘরের ফৌজের মতন। যে সব কথা ইতিহাসের ছলে আমি বলে যাচ্ছি, এগুলো কেউ যেন যথাযথ বলে না নেন। এ সব আমার মনের বিশ্বাস, আমার কাছে সত্য হলেও অন্যের পক্ষে গল্পমাত্র। মোট কথা, এখানে আমাদের রূপকথার মশলা জোগাবার জিনিস অনেক ছিল। যেখানে ভুটান নেপাল, পাহাড় জঙ্গল নিয়ে কারবার, সেখানে ইংরেজের সঙ্গে বন্ধনটা আমাদের চোখে খুব মুগুর-মারা গোছের সত্য বলে লাগত না। মহারাজ বিলেত গেলে মনে দুঃখও হত, আবার বিলেতের বাদশাহী বংশের কাছে তাঁর মান আদরের কথা শুনে গর্বও হত।

ভুটিয়াদের সম্বন্ধে একটা শোনা গল্প বলি। উত্তরে পাহাড়ের কোলে এক জায়গায় তিন সীমান্ত একত্র মিলেছিল. ভুটানের, ব্রিটিশ বক্সাদুয়ারের ও কুচবেহারের। একবার আমার বাবা ভুটানের রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন, সীমান্তে গিয়ে তাঁদের এক রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে। জাঁকজমক করে, চোপদার ঘোড়সওয়ার নিয়ে গেলেন। তখন রেল ছিল না। যেতে একটু কষ্টই হল। সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছেন, তখন ইংরেজদের কর্নেল সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। তিনিও দেবরাজের নিমন্ত্রণ পেয়ে আসছিলেন। দুজনেই মনে করলেন একটা খুব বড়ো রকমের উৎসবে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, উত্তর দিকে

পাহাড়ের উপর একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে। ঠিক সেই সময় একজন ভুটিয়া, এক ছোট্ট টাট্টু চড়ে এসে দুজনকে দুই চিঠি দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। চিঠিতে লেখা ছিল যে, "ইংরেজ সরকার আমাদের ভুটানের সীমার মধ্যে বিনা হুকুমে এক বাঙ্গলা বাঁধিয়াছেন, দেবরাজের হুকুমে তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছে, তোমরা সাক্ষী রহিলে।" দুজনকেই আতসবাজী দেখে ফিরে যেতে হল। দুজনেই জানতেন যে, এই সামান্য বিষয় নিয়ে ইংরেজ সরকার কিছু যুদ্ধ করবেন না!

আমাদের চাপরাসী বরকন্দাজদের মধ্যে কেউ কেউ ভুটান যুদ্ধে সেপাই ছিল। তাদের কাছে ছেলেবেলায় ভুটানের অসীম বলের কথা কত কি শুনতাম! দেশ দুর্গম, পাহাড়ীরা পাহাড়ের আড়াল থেকে কিরকম পা দিয়ে ধনুক ধরে একসঙ্গে দশ-দশটা তীর ছোঁড়ে, বড়ো বড়ো পাথর গড়িয়ে ফেলে দিয়ে সেপাইদের ব্যূহ নষ্ট করে দেয়, বেছে বেছে গোলন্দাজদের তীর মারে, এই সব নানা গল্প শুনতাম। হয়তো তার অর্ধেক গাঁজাখুরী, কিন্তু আমরা ঠিক সত্যি মনে করতাম। ভূগোল পড়তে যখন আরম্ভ করলাম, দেখলাম যে ভুটানের পেছনে তিব্বত আর তিব্বতের পেছনে চীন, সব বৌদ্ধ, কাজেই ধরে নিলাম যে, চীনকে না হারিয়ে সাহেবরা কোনো দিন ভুটান দখল করতে পারবে না। এই নিয়ে ছেলে বুড়ো, চাকর মনিব, সবাই একটু আনন্দ পেতাম। কিন্তু এ আনন্দ কেন তা বোঝা শক্ত, কারণ ভুটিয়াদের সঙ্গে আমাদের জাত ধর্ম ভাষা কিছুরই মিল ছিল না। বর্মার রাজ্য গেল যখন, তখন আমরা বালক হলেও এটুকু জানতাম যে, বর্মা ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ। তবু আমরা সত্যি বড়ো কষ্ট পেয়েছিলাম। সে বছর ভয়ানক উল্কাপাত হয়েছিল। লোকে সহজেই এই ব্যাপারের সঙ্গে থিবো রাজার পতনের যোগ দেখতে পেল। দেশে কি ধীরে ধীরে সমগ্র এসিয়ার একত্বজ্ঞান আসছিল! যাই হোক, সরকার সীমান্ত সম্বন্ধে চিরদিন অতি সাবধান ছিলেন। একবার কুচবেহারে ভুটিয়া দূতদের সামান্য কিছু বারুদ ও ছর্‌রা জোগাড় করে দেওয়ার অভিযোগে একজন প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক ছাড়া পেলেন, ও ওকালতী করবার অনুমতি পেয়ে উকিল হলেন বটে, কিন্তু তুচ্ছ কারণে তাঁকে কি জব্দই না হতে হয়েছিল।

প্রজারা অশিক্ষিত সরল প্রকৃতির লোক ছিল। তাদের একটা স্বতন্ত্র মত বা public opinion ছিল না। উকিল মোক্তার, হাকিম আমলা, বেশির ভাগই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমের রেষারেষি ভাব ছিল না, কারণ দু দলই বাইরের লোক, গরজ একই। খাস কুচবেহারী বলতে বোঝাত,

রাজবংশী ও ঐ দেশী মুসলমান। দেশের পুরানো বাসিন্দা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জমিদার যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও কুচবেহারী বলে গণ্য হতেন। বাইরের বাঙালিদের নাম ছিল ভাটিয়া। রাজগণেরা (কুমার সাহেবেরা) অধিকাংশই কিছু করতেন না। যে দু-চারজন হাকিমী করতেন তাঁরা যোগ্য সজ্জন ছিলেন। তাঁদের ভাটিয়া-বিদ্বেষ মোটে ছিল না। রাজগণেরা বরাবরই বাবাকে নিজেদের প্রতিনিধি মনে করতেন, আর নিজেদের সকল সুখদুঃখের সকল কথাই বলতে আসতেন। আমি বড়ো হওয়ার পর আমাকে কুচবেহারে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ তাঁদেরই বেশি ছিল। খাস কলিকাতার যে কয় ঘর ছিলেন, তাঁরা মহারাজের শ্বশুর বাড়ির দেশের লোক বলে একটু আলাদা আলাদা থাকতেন বটে, কিন্তু সেটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। মোটের উপর কুচবেহার শহরটা ছিল যেন একটা বৃহৎ পরিবার। সর্বত্র আমাদের অবাধ গতি ছিল। সব বাড়িতেই দৌরাত্ম্য আবদার চলত। কার্যতঃ জাতিভেদের বালাই বড়ো একটা ছিল না, তাই অনেক বয়স পর্যন্ত আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব আবছায়া রকমেরই ছিল। অথচ এমন নয় যে, আমরা সবাই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ছিলাম। তন্তুবায়, পরামাণিক, সুবর্ণবণিক, সাহা প্রভৃতি সকল বর্ণই আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে ছিল। কিছুদিন বুন্দেলা রাজপুত এক ভদ্রলোক চাকরী করতে এসেছিলেন, কখন কখন মুসলমান দুই-একজনও ছিলেন কিন্তু আমাদের খাওয়া-দাওয়াতে কোনো দিন পঙ্‌ক্তিভেদ দেখি নেই। গোঁড়া হিন্দু দুই-একটি যা হাকিম মহলে ছিলেন, তাঁরাও একটা বেখাপ্পা কিছু করতেন না, কোনো রকমে নিজের জাতটা বজায় রাখতেন। কারও কারও আবার জাতিভেদ সন্ধ্যার পর থাকত না। সেই সময় আমাদের বাড়িতে বৈঠক বসত, তাস-পাশা খেলা হত, জলযোগ নানা রকমের হত, তাতে বড়ো একটা কারও আপত্তি ছিল বলে মনে নেই। এ সব সন্ধ্যা-বৈঠক ছেড়ে দিলেও একটা বেশ সার্বজনীন ভাব দেখা যেত, যা অন্যত্র দুর্লভ। হয়তো এটা ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা। ছোটো-বড়ো অনেকেই ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। বাবা সাধারণ সমাজের সভাপতি বরাবরই ছিলেন, যদিও তিনি আচার-অনুষ্ঠানে পুরোপুরি ব্রাহ্ম কখনও হন নেই। খাগড়া-বাড়ির পণ্ডিত-মণ্ডলী বা অন্য গোঁড়া ধরণের লোকেরা কিন্তু তাই বলে কোনো দিন তাঁর বিরোধী ছিলেন না। মহারাজ সস্ত্রীক নববিধান সমাজভুক্ত ছিলেন। দুই সমাজের মধ্যে কুচবেহারে বা অন্যত্র সদ্ভাব ছিল বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু মহারাজ সকল রাজগুণের অধিকারী ছিলেন, ধর্মমতের জন্য বিরোধ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বহুকাল পরে, এক ক্লাব স্থাপনের চেষ্টায়

গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রবাবু ও আমি মহারাজের কাছে গেছলাম। মহারাজ সব রকমে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হলেন। বললেন যে নগদ টাকা দেবেন, সাজ-সরঞ্জাম দেবেন, শেখাবার জন্যে বিলেত থেকে খেলোয়াড় আনিয়ে দেবেন, কিন্তু বেশ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে ক্লাবে কোনো রকম জাত কি সম্প্রদায়-ভেদ থাকলে আমাদের সঙ্গে কোনোও সম্পর্ক রাখবেন না। রাজধানীতে গির্জা, মসজিদ, ব্রাহ্ম মন্দির, হিন্দু মন্দির, সবই ছিল। সবাই রাজভাণ্ডার থেকে সাহায্য পেত।

রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন। আগে ঠাকুরবাড়ি ছিল রাজবাড়ির সামনেই। মহারাজ যখন নাবালক, তখন ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হটন সাহেব ঠাকুরকে দূরে সরাবার মতলব করেন, কিন্তু হঠাৎ রাত্রে সাহেবের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠায় তাঁকে সে মতলব ত্যাগ করতে হয়, এই রকম জনশ্রুতি। তবে, সাহেবের ভয় হওয়ার কথাটা বিশ্বাস করা রীতিবিরুদ্ধ। মহারাজ গদীনশীন হওয়ার পর, অনেক খরচ-পত্র করে সম্পূর্ণ ফরাসী ধরণের নূতন রাজবাড়ি উঠল। রাজবাড়ির হাতাটা বিলেতের জমিদার বাড়ির পার্কের মতো তৈরি করা হল, অর্থাৎ আঁকা-বাঁকা ঝিল আর চারি দিকে উঁচু নিচু ঢেউ-খেলানো ঘাসের জমি। পুরানো ঠাকুরবাড়ি আর সেখানটায় মোটেই খাপ খেত না। তাই দূরে শহরের মাঝখানে এক পুকুরের পাড় জুড়ে মদনমোহনদেবের নূতন আবাস বাঁধা হল। নূতন মন্দিরটি সুন্দর হলেও কেমন কেমন লাগত, কেননা বাংলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন দেউল না করে, ফার্গুসনের কেতাব দেখে পশ্চিমের পুরানো হিন্দু মন্দিরের নকল করা হয়েছিল। কেন যে এ রকম করা হল, আমি জানি না। কেন যে এই গরিব বাংলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন মন্দিরের শোভা আমাদের চোখে পড়ে না, কেন যে বাঙালির ও বাংলার কোনো গুণই আমরা দেখতে পাই না, কী বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে আজ আমরা মাথায় সাদা টুপি পরে, হিন্দী বলতে বলতে, দেশ উদ্ধার করতে সকলের পেছনে চলেছি, তা বোঝা ভারী শক্ত। আমাদের কুচবেহারের মহারাজ গৌরব করে বলতেন, "আমি কোচ, আমি অনার্য, আমার আর্য বলে গণ্য হবার কোনো সাধই নাই।" আমিও সেই রকম বলছি, 'ভাই বাঙালি, তুমি আর্য নও, তুমি অনার্য, তোমার দেশে এলে আর্যদের জাত যেত। তুমি কুরু-পাণ্ডবদের বংশধর বলে নিজেকে জাহির করে লোক হাসিও না। তোমার পূর্বপুরুষ নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, যারা সমুদ্রগর্ভ হতে দক্ষিণবঙ্গ উদ্ধার করে তোমার দেশের শস্যশ্যামলা নাম সার্থক করেছে। তোমার পূর্বজ গারো, কোচ, মেচ, যারা গভীর জঙ্গল কেটে উত্তরবঙ্গ মানুষের বাসের উপযোগী করেছে। তোমার ডিঙ্গা, তোমার ময়ূরপঙ্খী নাও, নিয়ে যে সব মাল্লারা সাত সমুদ্রে পাড়ি দিত তারা

তোমার পূর্বপুরুষ, ভীম অর্জুন নয়। সত্যি বলতে কি, তোমার অতীতের দিকে চাওয়া বিড়ম্বনা, তোমার ইতিহাস বর্তমানে ও সম্মুখে। রাজা রামমোহনের শতাব্দীতে তুমি দেখিয়েছ তোমার কদর। এই শতাব্দী আরও তোমার কত কীর্তি দেখবে। ভয় নেই। পাঁজীপুঁথিগুলো ছিঁড়ে ফেলে কেবল এগিয়ে চলো।'

এক মন্দিরের কথা নিয়ে কি বক্তৃতাই না করলাম! পাঠকের কাছে মাপ চাইছি। নূতন মন্দির তৈরি হলে, এক শুভ দিনে, হাতি, ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত, রসনচৌকী, ইংরেজি ব্যাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে প্রকাণ্ড মিছিল করে, মদনমোহন গৃহপ্রবেশ করলেন। সঙ্গে রাজ্যের সব কর্মচারী, সাহেব পর্যন্ত। মহারাজ পাটহাতিতে চড়ে মিছিলের আগে আগে গেলেন, যদিও তিনি ব্রাহ্ম আচার্যের জামাতা। রাজা তিনি, রাজধর্ম যে সাম্প্রদায়িক ধর্মের চেয়ে অনেক বড়ো, তা তিনি বুঝতেন। নূতন মন্দিরের জন্য কাশী থেকে অনেক খরচপত্র করে নহবৎ এল, দেবতুষ্টির জন্য আরও কত রকম ব্যবস্থা হল! মোটের উপর, মদনমোহন বোধ হয় খুশি হয়েই বাড়ি বদল করলেন, কারণ এবার আর কারও মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না। ক্ষুদ্র বৈরাগিদিঘির শোভা বৃদ্ধি হল।

কুচবেহার শহরটি ছোটো হলেও ভারী সুন্দর। একেবারে নূতন। রাস্তাগুলি সব শহরের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সোজা চলে গেছে। লাল লাল রাস্তা, দুধারে সবুজ ঘাস। মাটি এত রসাল যে ঘাস কখনও শুকোয় না। সব জিনিসটা যেন রুলার গজকাটি দিয়ে মেপে তৈরি। আমাদের বাড়ি ছিল সাগরদিঘির পশ্চিম পাড়ে এক টিলার উপর। উত্তর দিকে তাকালেই হিমালয়ের নীলরেখা দেখা যেত। ভোরের আলোয় সেই নীলরেখার উপর কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া পর্বতরাজের মাথায় শুভ্র কিরীটের মতো দেখাত। ছেলেবেলা থেকে এই ছবির মতন পাহাড়ের দৃশ্য দেখা অভ্যাস, কাজেই যখন বারো বছর বয়সে প্রথম পাহাড়ে গিয়ে তার এবড়ো-খেবড়ো গড়ন ও এলোমেলো রং দেখলাম, তখন নিতান্তই নিরাশ হলাম। তার পর তো কত পাহাড়ই দেখেছি, কিন্তু কাছের পাহাড় আজও ভালো লাগল না। অনেক দূরের ঘন নীল পাহাড়ের চূড়ার শোভাই সব চেয়ে চমৎকার মনে হয়। তার পরেই লাগে ভালো অন্ধকার অস্পষ্ট গভীর খদের তলা। অর্থাৎ দুটোই দূরের জিনিস, আর দূরের বলেই idealised। এই যে সাবেক কালের কথাগুলো বলতে নিজেরই এত আনন্দ হচ্ছে, এ কেবল সে কালটা এত দূরে বলে। বিংশ শতাব্দীর হিন্দু আমরা, কত পালিশ করা আমাদের ভাবভঙ্গী, অথচ আমাদের কেন এত ভালো লাগে বৈদিক যুগের আদিম অপরিণত সভ্যতার কথা! সুদূর বলেই তো! উপরে বলেছি যে কুচবেহার শহরটি খুব আধুনিক ও ভারী সুন্দর। ছেলেবেলায় কিন্তু তার চেয়ে

আমাদের অনেক ভালো লাগত সাবেক রাজধানী কমতাপুরের ধ্বংসাবশেষ। বাড়িগুলো ছিল সব পাথরের, শহরের চারি দিকে কেল্লা ও গড়, দেখলে মনে হত— হাঁ, কুচবেহার পুরানো রাজ্য বটে! নূতন মদনমোহনবাড়ির চেয়ে অনেক ভালো লাগত কমতাপুরের নিকটস্থ প্রাচীন দেবীমন্দির। এই মন্দিরের নাম গোসানীমারীর মন্দির। জাগ্রত দেবতা। এখানকার কচি পাঁঠার মাংসের প্রসাদ লোভনীয় জিনিস ছিল। একটা কথা জানানো দরকার, যে, আমাদের সেকালের ভাষায় মায়ের প্রসাদের নাম ছিল চরু। আমাদের বাড়ি যে প্রসাদ কালীবাড়ি থেকে নিত্য বরাদ্দ ছিল সেটা একটা পাঁঠার পা (leg)। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যখন পড়লাম যে দশরথের নিঃসন্তান রানীদের চরুভক্ষণ করানো হল, তখন ভাবলাম যে তাঁদিকে পাঁঠার চরণ খাওয়ানো হল। বড়ো হয়ে অমরকোষ ইত্যাদি পড়ে তবে ভুল ভাঙল। গোসানীমারীর যে মন্দিরের কথা বলছিলাম সেটা একটা পীঠস্থান, নাম রত্নপীঠ, প্রমাণ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। ঐ মন্দিরে কুচবেহারের রাজারা কখনও যান না। দেবীর অভিশাপ আছে। এ সম্বন্ধে গল্পটা এই যে, বৎসরের কোনো এক অমাবস্যার রাত্রে এই মন্দিরের মধ্যে দেবী দিগম্বরীবেশে নৃত্য করেন। নৃত্যকালে মন্দিরের সমস্ত দরওয়াজা জানালা বন্ধ থাকে। আগেকার এক মহারাজ পুরোহিতদের উপর জোর জুলুম করে সেই নাচের সময় ভেতরে উঁকি মারেন, আর ফলে দেবীর শাপে তৎক্ষণাৎ মরে যান। সেই থেকে কোনো রাজা গোসানীমারীর মন্দিরে যান না।

রাজধানীর উত্তরে আর এক পুরানো মন্দির আছে, বাণেশ্বরদেবের। এ মন্দির যে পুরানো তাতে কোনোও সন্দেহ নাই, কারণ দেবতাদের খাদ্যাখাদ্য বিধি স্থির হওয়ার পূর্বে এর প্রতিষ্ঠান। আমিও আগে এতটা জানতাম না। বড়ো হওয়ার পরে, অর্থাৎ বন্দুক চালাবার অনুমতি পাওয়ার পরে, একবার শিবরাত্রির দিন আমরা শিকার করে সেই পথে ফিরছিলাম। প্রায় জনা-ছয়েক ছিলাম, আর সকলের কাঁধে কাঠিতে বাঁধা মরা হাঁস। বেলা বারোটা। এমন সময় দেখি যে মন্দিরের একজন ছোকরা পুরোহিত সেই দিকে দৌড়তে দৌড়তে আসছেন। আমার ভয় হল, যে, আমরা একটা কিছু অব্রহ্মণ্য কাজ করে ফেলেছি। এ সব ঋষিকুমারদের শিকারী-নিগ্রহের বিষয়ে উৎসাহ তো সেই মহাভারতের যুগ থেকে! ব্রাহ্মণকুমারকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই ঠাকুর? আর একটু হলেই জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম আর কি, "আশ্রমের সর্বাঙ্গীন কুশল তো? রাক্ষসাদির কোনো উপদ্রব নাই তো? নীবার ধান্যের অবস্থা ভালো তো?" হঠাৎ স্মরণ হল, এ কলি যুগ, মৃগয়ারত হলেও আমরা ক্ষত্রিয় নই, যবনবেশী শূদ্রমাত্র, আর ঋষিকুমারটি একজন

শাস্ত্রবিষয়ে একান্ত বিগতস্পৃহ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। পুরোহিত আশীর্বাদ করে বললেন, "জয়োঽস্তু! আপনাদের আজ মন্দিরে প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে। বাবা বিশেষ করে বলেছেন।" একে শিব মন্দির, তায় শিবরাত্রি, প্রসাদ পেয়ে প্রসন্ন হওয়ার কোনোও সম্ভাবনা নেই মনে করে বললাম, যে, আমাদের রক্তমাখা কাপড় চোপড়, গায়ে বারুদের গন্ধ, এ অবস্থায় মন্দিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ব্রাহ্মণকুমার ছাড়লেন না, টেনে হিঁচড়েই একরকম আমাদিকে নিয়ে গেলেন। ভাগ্যিস্ জিদ করে বাড়ি চলে যাই নেই! সেখানে গিয়ে দেখি, প্রসাদ মানে খাসির মাংসের কালিয়া ও কবুতরের চচ্চড়ি। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর, গাছপান ও সুপারি খাওয়ার সময় একটু প্রত্নতত্ত্ব চর্চা নিয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কৈলাসপতির কাছে বলিদান কি করে হল। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, বলিদান মোটেই হয় নেই, খাসিটা ঠেঙিয়ে মারা হয়েছিল, আর পায়রাগুলোর গলা টেপা হয়েছিল, এক ফোঁটাও রক্ত পড়ে নেই।

সমস্যার সমাধান হল। যাক্, এখানে তো রক্তপাত হল না, কিন্তু দার্জিলিঙে মহাকালবাবার সামনে বলির জীব ঠেঙিয়ে মারার কোনো ব্যবস্থাই নাই, সেখানে তো সনাতন নিয়মে গলা কাটা হয়! এরা সবাই হিন্দু, পণ্ডিতজী স্বীকার করুন, আর নাই করুন। বাঙলাদেশে দশভূজার সামনে অনেক বাড়িতে পাঠা বলি দেওয়া হয় না, কুমড়ো খাঁড়া দিয়ে কেটে তাইতে সিঁদুর দিয়ে খানিকটা নকল রক্ত তৈরি করে নিয়ে পূজা সর্বাঙ্গসুন্দর করা হয়। এ সিঁদুর যেন আমাদের একেলে নিরামিষ ভোজের মোচার চপ ও ইঁচড়ের কাটলেট। আমার কেমন মনে হয়, যে, এই সব ব্যাপারগুলো খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে বাঙালির সভ্যতা বা অ-সভ্যতা নানা স্থান থেকে কুড়ানো, শুধু প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়। ধর্মপূজা ও শূন্যপুরাণের কথাও বলতে পারতাম, যদি সে বিষয়ে বিদ্যার একান্ত অভাব না হত। গম্ভীরা নাচ, মনসার ভাসান, কুচবেহারের বিষহরির গান ও মদনকামের পূজা, এ সব শ্রুতিজাত মনে করার কারণ আছে কি?

আর একটা ছোটো গল্প এই সম্পর্কে বলি। কুচবেহারের মদনমোহনদেব সোনার বংশীধারী মূর্তি, তাঁর মন্দিরের দু ধারে কালী ও তারাদেবীর মন্দির। তিন মন্দিরই এক ইমারতের মধ্যে। দেবীদের সামনে রোজ পাঁঠা বলি হয়। পরোক্ষে এই বলির মাংস খাওয়ার অপরাধে বছরে এক বার করে মদনমোহন ঠাকুরের বিচার হত। বাণেশ্বর পাল্কী চেপে এসে বিচার করে একটাকা জরিমানা নিয়ে যেতেন। এ ব্যাপারের সঙ্গে শ্রুতিস্মৃতির সম্বন্ধ আমি তো ঠিক করতে পারি নেই। পাঠক চেষ্টা

করবেন, নয়তো আজকালকার হিন্দুসভাকে জিজ্ঞাসা করবেন!

ঠাকুরমন্দিরের কথা একটু বেশি হয়ে গেল। তবু আর একটা ছোট্ট গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। গল্পটা হাল্কা রকমের, তবু ভাবুক পাঠক এর ভেতরেও তত্ত্বকথা পাবেন। তা ছাড়া, রচয়িতা একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হওয়ায় গল্পটা অশাস্ত্রীয় বলা যেতে পারে না। গল্পের স্থান, এক নির্জন প্রান্তরে ভাঙা শিবালয়। সময়, শ্রাবণ মাস, সন্ধ্যাবেলা। আকাশজোড়া মেঘ, আর ঝুপঝুপ বৃষ্টি, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পথশ্রান্ত এক ফকির সেই পথে যাচ্ছিলেন। ঝড়বৃষ্টিতে হায়রান হয়ে তিনি মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। ফকির বিধর্মী, হিন্দুদের ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁর, বোধ হয়, কিছু জানা ছিল না। শুকনো জায়গা পেয়ে শিবলিঙ্গের মাথার উপরেই বসে পড়লেন। বেশ করে বসে, তাঁর ঢিলে জামার ভেতর থেকে কাঠি-কাবাব বের করে তিনি জঠরাগ্নির পূজা আরম্ভ করলেন। ঘন ঘন বিদ্যুতের আলোয়, শিবলিঙ্গে অধিরূঢ় সাদাদাড়ি ফকিরবাবাকে নিশ্চয়ই অপরূপ দেখাচ্ছিল! ঝড় উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এমন সময়, এক হিন্দু চাষা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তার পা-ময় কাদা, সর্বাঙ্গে জল ঝরছে। মন্দিরে নূতন দেবতা অধিষ্ঠিত দেখে বেচারা ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কোনোমতে নিজেকে ঝড়ের ঝাপটা হতে বাঁচাতে লাগল। ফকির কিছু বললেন না বটে, কিন্তু দেবতার দয়া হল না। মূর্তির ভেতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ এল, "মোল্লাবাবা, একবার পা-টা সরাও তো, হিন্দু ব্যাটার ঘাড়টা মটকে দিই। ব্যাটা ছোটোলোক! তুমি কাদা পায়ে, নোংরা কাপড়ে, মন্দিরে ঢোক!" তার পর কি হল, শুনি নেই।

৩

গল্পগুলো শুনে পাঠক বুঝতেই পারছেন যে ছেলেবেলায় আমাদের ধর্মশিক্ষা একটু বিশেষ গোলমেলে রকমের হয়েছিল। প্রথম ইংরেজি শিখে একেবারে রাতারাতি সুসভ্য হওয়ার যে উৎসাহ দেশে জেগে উঠেছিল, সেটা আমাদের সময়ে অনেকটা মন্দা পড়ে গিয়েছিল। আগে যেটা হয়েছিল, সেটা বান ডাকার মতো। আমাদের সময় যেটুকু ছিল, সেটা যেন নিত্যকার জোয়ার ভাঁটা। তার থেকে একটা উদ্দীপনা, মাদকতা সঞ্চয় করা বড়ো শক্ত কাজ। অথচ বাঙালির প্রাণ উদ্দাম-আবেগের জন্য অপেক্ষা করেই আছে। যাক্, নিজের কি হয়েছিল বলি,

তা হলেই অবস্থাটা সবাই বুঝতে পারবেন। বাড়িতে ঘটা করে কোনো ধর্মানুষ্ঠান হত না। বাবা একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু ভগবানকে কখন ডাকতেন, তা আমরা জানতেও পারতাম না। মা পূজা আহ্নিক করতেন, কিন্তু আমাদের অগোচরে। ঠাকুরঘর বলে পদার্থটা তো বাড়িতে ছিলই না। আমাদিকে কেউ নিত্য উপাসনা করতে উপদেশ দেন নেই, বরং এ কথা বারবার শুনতাম যে নিয়মিত লেখাপড়া ও শরীর চর্চা করাটাই বিদ্যার্থীর যথার্থ উপাসনা। এ অবস্থায় আমাদের একের নম্বর কালাপাহাড় হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা ঠিক হল না। বিখ্যাত ব্রাহ্ম আচার্যেরা কুচবেহারে এলে বাড়িতে উপাসনা হত, আর আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকার স্পষ্ট আদেশ ছিল। খুব ছেলেবেলায় দুই-একবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও উপাসনা করেছিলেন। এতদিনের কথা, কিন্তু তাঁর সেই সৌম্য সুন্দর চেহারা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে তন্ময় ভাব, এখনও যেন চোখের সামনে রয়েছে। বড়ো বড়ো উৎসবের সময় বাবা সমাজে নিয়ে যেতেন। ভালোই লাগত, যদিও কতকটা spectacular (ধূমধাম) হিসেবে। ভক্তি চর্চার দিক থেকে যাত্রার ধ্রুব প্রহ্লাদ ঢের বেশি মনে লাগত। যাত্রা যত ইচ্ছা শুনতে পেতাম, কিন্তু কীর্তন শোনার বিষয়ে কোনোও উৎসাহ কেউ দিতেন না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার কথা তো একরকম taboo (নিষিদ্ধ) ছিল! একদিনকার কথা মনে আছে, কলকাতা থেকে এক সুগায়ক এসেছিলেন, মজলিশ করে সবাই গান শুনতে বসেছিলেন, বড়ো ভালো লাগছিল। হঠাৎ তিনি গান ধরলেন, 'এল কৃষ্ণ এল ঐ, বাজায়ে বাঁশরী।' আমি তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে গেলাম। সংস্কার এই রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আরও দশ বছর আগে হলে হয়তো সুরুচি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতাও করে ফেলতাম, কিন্তু আমাদের মনে অত জোর আগুন ছিল না। এই সব শিক্ষা সংস্কার সত্ত্বেও অকালে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কবলে কি করে পড়ে গেলাম, সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু আমাদের দোষ যে খুব বেশি ছিল, তা বলতে পারি না।

আগে জানিয়েছি যে, একটা অব্যক্ত রকমের জাতীয় গৌরব শিশুকাল থেকেই মনে জেগে উঠেছিল। সেটার জোর ছিল মুক্তি-পিপাসার চেয়ে অনেক বেশি। সেই সামান্য অস্পষ্ট আগুনের ফিনকি যে একদিন ভীষণ দাবানল হয়ে কৈলাসে বুড়ো শিবের জটা গলিয়ে দেশের সপ্তসিন্ধুকে বানে ভাসাবে, তা তখন কে জানত! একটা বিষয়ে আমাদের মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছিল। এই ঋষিতুল্য কেশবচন্দ্র, যিনি একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে দেন, তাঁর সমাজ-মন্দির খৃস্টানি গির্জের

মতো কেন গড়া হল, ভিতরের পূজা-পদ্ধতি বা মোটামুটি খৃস্টানি চালের কেন করা হল? মহর্ষির "খৃস্ট বিভীষিকার" কথা তখন জানতাম না, কিন্তু জিনিসটা ঠিক হজম হত না। কেশববাবুর Band of Hope (মদ্যপান নিবারণী সভা) নিয়ে কিছুদিন খুব খেটেছিলাম। আমাদের খাটা তো হুজুগ বিশেষ, তার কিছু মূল্য হয়তো ছিল না। তবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা টাকা ও প্রতিজ্ঞাপত্রে সই জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু শেষে দেখলাম সব মিছে, সব ভুয়ো। আমাদের সভার যিনি অধ্যক্ষ, যাঁরা আমাদের সহায়, তাঁদেরই অভ্যাসদোষ সব চেয়ে বেশি। এ অবস্থায় আমাদের ছেলে-ছোকরার উৎসাহই বা থাকে কি করে! ব্রাহ্মসমাজের আচার্যদের কেউ কেউ আমাদের বড়ো ভালোবাসতেন। তার মধ্যে নববিধানের মহাজ্ঞানী গৌরগোবিন্দবাবু ও সাধারণ সমাজের ভক্ত নবদ্বীপ দাস মহাশয় দুজনের নাম করব। এঁদের দুজনের কাছে শিখেছিলামও অনেক। কিন্তু কই, এঁরা তো এঁদের সমাজের অনাচারী সাহেবদের কিছু বলতেন না! এই সব পাঁচ রকমে মন বড়ো বিগড়ে গিয়েছিল। একজন ভক্ত কর্মীর কথা কিন্তু মনে আছে, যিনি তখন আমাদের মন একেবারে কিনে নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত রামকুমার। কুচবেহারে এসেছিলেন গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীর বেশে। আসামের চা-বাগানে তখনকার দিনে কুলিদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হত। পণ্ডিতমহাশয় বাগানে বাগানে ঘুরে সব খবর জেনে কুলিকাহিনী বলে এক গল্পের বই লিখেছিলেন। সেই বই থেকেই বাংলা দেশের জনসাধারণ এই অত্যাচারের কথা ভালো করে জানতে পারলে। পূজনীয় পণ্ডিত যত দিন কুচবেহারে ছিলেন, আমরা দল বেঁধে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খুব ঘুরতাম, আর কত গল্পই তাঁর কাছে শুনতাম! শুনে মনে ইংরেজ জাতের উপর শ্রদ্ধা ভালোবাসা বাড়ে নেই, সেটা নিশ্চিত।

কয়েক বছর পরে যখন বিলেত যাই, তখন আমার ক্যাবিন-সঙ্গীদের মধ্যে Adam বলে একজন চা-বাগানের সাহেব ছিল। আমি একে নেটিব তায় বালক, এক কামরায় থাকা সত্ত্বেও সে আমার দিকে চেয়ে দেখত না। কিন্তু একদিন লোকটা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এল। আমি ছিলাম নিতান্ত ভালোমানুষ, খুব রাগ না হলে গায়ের muscleগুলো শক্তও হত না। সকালবেলা চা খাচ্ছি, আমাকে দড়াম করে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তুমি নাকি সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ? কি দরকার এত কষ্ট করার, তোমরা তো মাসিক দুশো টাকা হলেই রাজার হালে থাকত পার।' আমি ছেলেমানুষ, কি বা জবাব দেব, কিন্তু মা সরস্বতী জিবের ডগায় এসে উত্তর দিলেন, 'দেখি চেষ্টা করে, যদি ইংরেজ একটারও ভারতে আসা বন্ধ করতে

পারি তো কষ্ট সার্থক হবে।' সাহেবটা একবার দুবার "ঘোঁক্" করে উঠে গেল। তার পর আর সারা পথ আমাকে জ্বালায় নেই। কিন্তু এই ঘটনার এক মজার ফল হল। আমার আর এক ক্যাবিন-সঙ্গী ছিল, তার নাম Stewart, সে সওয়ার পল্টনের কাপ্তান। পয়সার অভাব, তাই স্ত্রী ছেলেকে উপর কেলাসে দিয়ে নিজে সেকেণ্ড কেলাসে যাচ্ছিল। সেও কোনোদিন আমার দিকে ফিরে চায় নেই, কিন্তু যখন Adam ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে উঠে গেল, তখন সে হেসে আমার কাছে এসে বসল, আর "গুড মর্নিং" বলে গল্প জুড়ে দিলে। শেষে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড়ো খুশি হয়েছি, you are a boy of the right sort (তুমি ছেলের মতো ছেলে)।' আমি একটু কাঁচুমাচু হয়ে তাকে বললাম, 'আমি নিরীহ ছেলে, সাত চড়ে রা বেরোয় না, কিন্তু চা-বাগানের সাহেব আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আসামের কোলের কাছে মানুষ হয়েছি, সেখানকার জুলুম অত্যাচারের কথা কোনো দিন ভুলতে পারি নেই।' কুলিকাহিনীর এক-আধটা গল্পও বললাম, কিন্তু কাপ্তান বিশ্বাস করলে না, বললে 'না না, এ হতেই পারে না, তোমায় কেউ বোকা বুঝিয়েছে!' বাকী যে কদিন জাহাজে ছিলাম, এই সাহেব আমায় অনেক যত্ন করেছিল, তার স্ত্রী বিলেতে তাঁদের বাড়িতে যেতে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। আমি সে নিমন্ত্রণ নানা কারণে রক্ষা করতে পারি নেই। কিন্তু এই ব্যাপারে মোটামুটি বুঝে নিলাম যে ইংরেজ জাতের কাছে সোজা কথার খুব কদর। পরে ইংরেজের সঙ্গে অনেক কারবার করেছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার প্রথম ধারণাই কায়েম আছে।

চা-বাগানের সম্বন্ধে আমায় কেউ যে বোকা বোঝায় নেই সেটা পরে ভালো করেই জানতে পেরেছিলাম। বিলেতে আমি অধিকাংশ সময় ঘর ভাড়া করে থাকতাম। আর আমার অভ্যাসদোষে আমার ঘরে আড্ডাও জমত খুব। এই ধরণের আড্ডাতে সচরাচর যে-রকম তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে আমার ঘরেও সেই-রকম হত। শুধু একটা কথা উল্লেখযোগ্য। আমার তর্কের বিষয় ছিল সব সময়েই এক, রাষ্ট্রনীতি ও ভারতের ভবিষ্যৎ। কাজেই আমরা খুব গরম হয়ে উঠতাম। একদিন জোর গলায় এই গবেষণা চলেছে, এমন সময় বাড়ির ঝিটা এক চিঠি নিয়ে এল, তাতে লেখা আছে, 'আমার স্ত্রীর বড়ো কঠিন অসুখ, মরণাপন্ন অবস্থা, আপনারা যদি একটু আস্তে কথাবার্তা চালান তো বড়ো উপকৃত হই।' নীচে একটা ইংরেজের সই। সই দেখে আমাদের বীররক্ত ধমনীতে নেচে উঠল, একজন প্রস্তাব করলেন, 'লিখে দে, আমাদের বয়ে গেল।' শেষ পর্যন্ত কতদূর বাঁদরামি করে তুলতাম জানি না, কিন্তু এক সাহেব সশরীরে এসে ঘরে উপস্থিত হল। কথায় বোঝা গেল, ও-ই চিঠি

দিয়েছিল। সাহেব বললে, 'আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমার স্ত্রীকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে। আপনাদের কথাবার্তার ব্যাঘাত করলাম, কিছু মনে করবেন না।' আমাদের রাগ পড়ে গেল। ভদ্রলোক বসে একটু গল্পসল্প করে বেরিয়ে গেল। তার দু-চার কথাতেই মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। আমরা ভারতবাসী, এ কথা জেনে সে বললে, 'আমি ভারতবর্ষে পনেরো বছর ছিলাম। যে অত্যাচার অনাচার করেছি, আজ তার ফল পাচ্ছি। আমাদের রাজত্ব এই পাপে ধ্বংস না হলে হয়!' লোকটি উপর-তলার ভাড়াটে ছিল। এই আলাপের পর, তার স্ত্রী ফিরে আসা পর্যন্ত কদিন প্রায়ই আমার ঘরে এসে গল্প করত। একটা কথা আমায় বিঁধে বিঁধে বার বার বলত, 'তোমাদের দেশের লোক সহায় না হলে এত পাপ চলতে পারত না।' কথাটা একশোবার ঠিক। পাপ আমাদের, ভোগ আমাদের, অন্যলোক নিমিত্ত মাত্র।

ভদ্রলোক আসামে চা-বাগানের সাহেব ছিল। পনেরো বছর অশেষ অনাচার করে, হায়রান হয়ে, দেশে পালিয়ে এসে বিয়ে-থা করে সবে বছরখানেক বাস করেছে। সদাই তার ভয় যে, তার পূর্বজীবনের সঞ্চিত ভোগ কবে তার ঘাড়ে এসে চাপে, আর তার নূতন সংসার চুরমার করে দেয়। ভারতবর্ষে তার পরে পরে তিনটি স্ত্রী (?) ছিল। প্রথম দুটিকে চা-বাগানেই বিনা আয়াসে সঞ্চয় করেছিল, আর তেমনি নির্বিবাদে তালাক দিয়েছিল, দু-চার মাস বাদে। শেষেরটি পাহাড়ের এক কনভেণ্ট ইস্কুল থেকে রপ্তানি। কিছু লেখা-পড়া আগেই জানত, সাহেব তাকে গড়ে-পিটে, শিখিয়ে বুঝিয়ে, সহধর্মিণী না হোক, সহকর্মিণী করে নিয়েছিলেন। মেয়েটি আমাদের বাঙালি, পাঁচ বছর সে তাঁর বাটিতে গৃহিণীপনা করেছিল। তাকে সাহেব ভালোবাসতেন বলে দেশে ফেরবার সময় মাঠে ছেড়ে না দিয়ে নিজের খানসামার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শেষ প্রশ্নের এক-রকম সমাধান করে এসেছিলেন। এই মেয়েটি একবার সাহেবের প্রাণ কি করে বাঁচিয়েছিল সে গল্পও শুনলাম। বাগানে দুটি কুলি-মেয়ে ছিল, তারা বাঁকুড়া জেলার চাষী-কন্যা। বড়োটি দিন-কয়েক সাহেবের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল, কিন্তু ছোটোটিকে সাহেব কোনোমতেই দখল করতে পারেন নেই। তার দিদি তাকে সর্বদা বাঘিনীর মতো আগলে থাকত। দূত দূতী কেউ তার কুঁড়ের কাছে এগোতে সাহস পেত না। সাহেব বললে যে, হয়তো এই ছোটো বোনটিকে বাঁচাবার জন্যই দিদি অত সহজে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল। এ কথা যদি সত্য হয় তো, মেয়েটি শিবি দধীচি দলের লোক। পাঠক তাকে মনে করে একটি অতি ছোটো নমস্কারও করবেন। সাহেবের তখন জোয়ান বয়স, উদ্দাম প্রবৃত্তি, বাধা পেয়ে দুই বোনের সর্বনাশ করবেন স্থির করলেন। কিন্তু জিনিসটা আপাততঃ

চাপা পড়ল, কারণ অল্প দিন পরেই সাহেব দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়ে সেখানকার ইস্কুল থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষ সংসার সংগ্রহ করে আনলেন। কিছুদিন পুরানো প্রেম, প্রতিহিংসা, সবই ভুলে রইলেন নূতনের নেশায়। তার পর একদিন তাঁর বাড়িতে এক ক্ষুদে হাকিম সাহেব এসে অতিথি হলেন। হাকিমরা তখনকার দিনে চা-কর সাহেবদের কুঠিতেই ডেরা নিতেন। চা-বাগানে অতিথিসৎকারের একটা নিয়ম ছিল। অন্যত্র যে একেবারে ছিল না, তাও আমি বলতে প্রস্তুত নই। সেই নিয়মমত অতিথি এলে তাঁর সে রাত্রের জন্য একটা গান্ধর্ব কি আসুর বিবাহ দিতে হত। সাহেবের প্রতিহিংসার সুযোগ মিলল। বাগানের ডাক্তারবাবুকে ডেকে বললেন, 'ডাক্তার, জমাদারকে নিয়ে যাও, যেমন করে হোক আজ খানার পর সেই কুলি-মেয়েটাকে আনাই চাই।' সাহেবের হুকুম তামিল হল। সকালবেলা সর্বদেবময় অতিথিকে বিদায় দিয়ে ম্যানেজারসাহেব বাগান তদারক করতে বের হলেন। দেখলেন যে, হাওয়ায় কেমন একটা থমথমে ভাব। কুলিরা যে যার কাজ করছে, কিন্তু কারও মুখে হাসিঠাট্টা, কথাবার্তা, কিছু নেই। সেই বোন দুটি এক জায়গায় কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেরই চোখ লাল, যেন গাঁজা খেয়েছে। সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় বড়োটিকে রসিকতা করে বললেন, 'কি রে, বোন কি বলে?' মেয়েটির পা কোদালের ফালের উপরই ছিল। এক টানে হাতলটা বের করে দিয়ে মারলে সাহেবের রগের উপর এক ঘা। সাহেব অজ্ঞান হয়ে ভুঁইয়ে পড়ে গেলেন। যখন জ্ঞান হল, দেখলেন যে কুঠির বারান্দায় পড়ে আছেন, আর চারি দিকে দু-তিনশো কুলি গর্জন করছে আর ইট ছুড়ছে। বাগানের জমাদারসাহেব বারান্দার এক কোণে জড়সড় হয়ে পড়ে রয়েছে। ডাক্তারবাবু চেঁচিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছেন। আর তাঁর স্ত্রী তাঁর দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে আগলে, একটা দোনলা বন্দুক মেরে মেরে কুলিদের তফাতে রাখছে। ডাক্তারের কাছে শুনলেন, যে এই-সব বেয়াড়া হারামজাদাদের এসে সাজা দেবার জন্য পাশের বাগানের সাহেবকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিকেল নাগাদ অন্য বাগানের সাহেবটি তার তিনশো কুলি নিয়ে এসে সব ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেলেন। আমার সাহেব গল্প বলতে বলতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ঘটনার moral (নীতি) কি, বুঝতে পারছ তো?' যাক, শান্তি স্থাপন হল, বড়ো মেয়েটিকে পুলিস ও হাকিম মারফৎ জেলে দাখিল করা হল, আর আমাদের ডাক্তারবাবু বকশিশ-স্বরূপ ছোটো মেয়েটিকে পেলেন। আর বেশি গল্প বলার দরকার, বোধ হয়, নেই। সেকালের চা-বাগানের অবস্থা পাঠক নিশ্চয়ই কতকটা বুঝতে পেরেছেন।

আজ কি অবস্থা, ঠিক জানি না। তবে কটন সাহেবের আন্তরিক চেষ্টার ফল না হয়ে যায় নেই। পণ্ডিত রামকুমারের কথা হতে এত কথা এসে পড়ল। আর একটু বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল, কুচবেহারে আমাদের বাড়িতে থাকত। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, কিন্তু অধ্যবসায়ের একান্ত অভাব। ছেলেবেলায় সাঁওতালদের কাছে মানুষ হয়েছিল। লাঠি খেলতে বেশ ভালো জানত, আর ধনুকে তীর দিয়ে কি বাঁটুল দিয়ে অব্যর্থ নিশানা ছিল। মহারাজের চাবুক-সওয়ারদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে ঘোড়াশালের যত দুর্দান্ত ঘোড়া চুরি করে চড়ে বেড়াত। আমার একটি মোটা ভুটিয়া টাট্টু ছিল, সেটা নিয়ে একবার ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতে এল। একদিন এক খোড়ো বাড়িতে আগুন লেগেছিল, হাতের কাছে মই না থাকায় নেবাবার কোনো চেষ্টা হচ্ছিল না। অগ্নিকাণ্ড বেড়েই চলেছিল, এমন সময় আমার বন্ধুটি গিয়ে উপস্থিত হল, আর চট্ করে চালের উপর একটা চেরা বাঁশ ঠেকিয়ে তাই দিয়ে চড়ে গিয়ে জল তুলে ঢালতে লেগে গেল। এ-রকম ছেলের কি আর ভালো মানুষটির মতো পড়ে-শুনে কেরানীগিরি করা পোষায়! অনুকূল হাওয়ায় পড়লে এরা অনেকদূর গিয়ে পৌঁছায়। নইলে বানচাল। বন্ধুর অদৃষ্টে শেষটাই হল। কিন্তু যে জন্যে এর উল্লেখ করলাম, সেটা হচ্ছে এই। চা-বাগানের কুলিদের দুর্দশায় যখন আমরা হা-হুতাশ করছি, এ একদিন কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বাবার নামে চিঠি রেখে গেল, 'অপরাধ নেবেন না, অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। লেখাপড়া করে আপনাকে খুশি করতে পারলাম না, ইত্যাদি।' আমায় কিন্তু বলে গিয়েছিল যে, চা-বাগানে কুলি হতে যাচ্ছে, একবার সাহেবগুলোকে দেখে নেবে। পারলে না কিছু করতে, কারণ বয়স বড়ো কম ছিল। বছরখানেক কি বছর-দুই পরে ফিরে এল, তার পর কয়েক বছর ধরে নানা জিনিস চেষ্টা করে, শেষ বহু দূরে অজানার সন্ধানে চলে গেল। তখন আমি বিদেশে।

এর কথা বলতে বলতে আর একজনের কথা মনে হচ্ছে। একদিন আমরা তিন বন্ধু প্যারিসে বেড়াতে বেড়াতে সেন নদীর একটা পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছি। পুলেতে মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য পাথরের বেঞ্চ। যেতে যেতে দেখি এক বেঞ্চে বসে একটি কৃষ্ণকায় যুবক আপেল খাচ্ছে। সে কোন্ দেশের লোক এই বিষয় জল্পনা করতে করতে আমরা চলে যাচ্ছি, এমন সময় সে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা আমায় কিছু কি বলছিলেন?' আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাঁর পরণে ময়লা আধছেঁড়া লম্বা কোর্তা, মাথায় খড়ের টুপি, হাতে

আধ-খাওয়া আপেল। খানিকক্ষণ সকলে একসঙ্গে বসে গল্পগুজব হল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু পরিচয় তিনি দিলেন না। কেবল এইটুকু জানালেন, যে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য এদেশে এসেছেন, কিছুতেই কোথাও আমল পাচ্ছেন না। অর্থসঙ্গতির কথায় বললেন, 'চলে যাচ্ছে।' আমি বললাম, 'দাদা, চলুন একসঙ্গে কোথাও চারটি খাওয়া যাক।' জবাব দিলেন, 'সে হয় না, ভাই, আমার তো নিজের কিছু সঙ্গতি নেই, আর ভিক্ষাও করি না।' শেষ বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে, কথা কয়ে বড়ো আনন্দ হল। যদি কিছু করে উঠতে পারি, তো আবার একদিন দেখা হবে।' আর দেখা হয় নেই। ব্রেজিলের সুরেশ বিশ্বাস মহাশয়ের জাতের লোক। ভারতের যদি দিন ফেরে তো এ-রকম কত দেখা যাবে!

আর ডানপিটে ছেলেদের গল্প এখন থাক। নিজের একঘেয়ে জীবনের কথা বলি। ছেলেবেলায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মশিক্ষার প্রভাবের কথা বলেছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব একরকম ছিল না বললেই হয়। বাবার সঙ্গে উৎসবাদিতে যেমন সমাজে যেতাম, মার সঙ্গে তেমনি পূজা-পার্বণে মন্দিরে যেতাম। মন্দির সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ ছিল না, আর মা-ও কোনোদিন কোনো পূজায় আমাদের বিশেষ ভাবে যোগ দিতে বলেন নেই। আজকাল যেমন হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটা hysteria বা বায়ুর প্রকোপ হিন্দুর ঘরে ঘরে ঢুকেছে, তখন তা ছিল না। মায়ের সব রকমে হিন্দুধর্মে আস্থা ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে একটা fuss বা হৈচৈ কখনও দেখি নেই। মা ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে কালে ভদ্রে দেখা হলে শেকহ্যাণ্ডও করতেন, আবার তারা চলে গেলে কখন নিঃশব্দে স্নান করে কাপড় ছেড়ে আসতেন কেউ জানতেও পারত না। বাবা খুব চেষ্টা করতেন যে আমাদের ধর্ম-সম্বন্ধে কোনো রকমের গোঁড়ামি না হয়। তাই যেমন রামায়ণ মহাভারত পড়তে হয়েছিল, তেমনি মাস্টারমহাশয়ের কাছে বাইবেলও খানিক খানিক পড়েছিলাম। মুসলমান বাল্যবন্ধুও অনেক ছিল। তাদের কাছে পয়গম্বরের জীবন, মেহদীর কথা, শয়তান ও ফেরেস্তাদের গল্প অনেক শুনে শিখেছিলাম। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও ইস্কুল-জীবনের শেষের দিকে মূর্তিপূজা, জাত-বিচার, টিকি, টিকটিকি, হাঁচি ইত্যাদি অনেক জিনিসে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম। অন্ততঃ বিশ্বাস করি এই কথা জোরে জাহির করতে লাগলাম। কি করে এ রকম হল, তা ভাববার বিষয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব খুব স্পষ্ট আর প্রবল হয়ে এল।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক আমাদের এইসময়কার

নেতা। আর বঙ্গবাসী ছিল আমাদের এই সময়ের Oracle (দৈববাণী)। এই অবস্থায় কলকাতায় পড়তে গেলাম। কপাল মন্দ যে সেই বছরেই Consent Bill (যাকে তখন সম্মতি আইন বলা হত) পেশ হল। নব হিন্দু ভাবের সঙ্গে এসে মিশল সরকার-বিদ্বেষ। রাস্তায় মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘোরা অভ্যাস হয়ে গেল। মুখে বুলি, 'ধর্ম গেল', 'আইন চাই না'। যাঁরা সে আইনের পক্ষপাতী, সবাই হলেন আমাদের শত্রুপক্ষ। কোথায় গেল ভেসে ছেলেবেলাকার কাগজ-পত্র, সঞ্জীবনী ও নব্যভারত, Liberal ও Indian Messenger, সমস্ত মনটা জুড়ে বসল বঙ্গবাসী ও জন্মভূমি। যে যবনান্নে চিরকাল এত লোভ ছিল, তা দেশের কল্যাণের জন্য ছেড়ে দিতে হল। এমন-কি বিলেতী নুন চিনি পর্যন্ত গেল। ঘরে ঘরে ছেলেদের সাবান দেশলাই তৈরি হতে লাগল। কুচবেহারে থাকতে চুলের পাট করা আমাদের একটা অবশ্যকর্তব্য ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসীর দলভুক্ত হয়ে সেদিকে সময় নষ্ট করা ছেড়ে দিলাম। রুক্ষ কেশ, পরণে মোটা ধুতি চাদর, হাতে বাঁশের লাঠি, তখন লোকে দেখে কি মনে করত জানি না, এখন কিন্তু মনে পড়লেই হাসি পায়। টিকির বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সত্যি টিকিটা রেখে উঠতে পারি নেই। ফোঁটা মাঝে মাঝে কাটতাম, কিন্তু সে অবস্থায় রাস্তায় বের হতে সাহস কুলোয় নেই। মন্দিরে যাওয়া-আসা করার খুব ইচ্ছে হত, কিন্তু হয়ে উঠত না। তাই বুড়ো বয়স পর্যন্ত তারকেশ্বর কালীঘাট দর্শন হয় নেই। ব্রাহ্ম আবেষ্টনে জন্ম, তাই গোঁড়ামি যখন এল খুব জোরেই এল। কথায় বলে, 'হিঁদুর ছেলে যবন হলে, গোরু খাওয়ার যম', কিন্তু পেটে সয় না যে! আমার তো আর্যামি করতে গিয়ে অজীর্ণ রোগ হয়ে পড়েছিল। তবে সেটা স্বীকার করতাম না, দাপটে চালিয়ে নিতাম। সনাতন ধর্মে আস্থা দু-তিন বছরেই কেটে গেল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অন্ধ দীক্ষাটা রয়ে গেল। সনাতনী কীর্তি অনেক করেছিলাম, তার দুই-একটা গল্প বলে এ পর্ব শেষ করব।

যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন কলকাতায় খুব জোরে ৺শীতলার কৃপা হয়। ছেলেবেলায় কতবারই টিকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বঙ্গবাসীর অনুমত নয় বলে এবার নিলাম না। উপরন্তু, কয়েকটি প্রবাসী ছাত্রের বসন্ত হয়েছিল, আমরা তাঁদের সেবার ভার নিলাম। আমার ভার নেওয়া মানে কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের মতো, কিন্তু রোগীর কাছে বসে থাকতাম। মা নিরুপায় হয়ে ৺শীতলার ফুল সঙ্গে দিতেন, সেটা কোমরে গোঁজা থাকত। এইখানে উল্লেখ করা উচিত যে, সে সময় বিপদে আপদে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর প্রধান সহায় ছিলেন নীলরতনবাবু। তাঁর ডাক্তারী ও আমার সিনিয়র (বয়োজ্যেষ্ঠ)-দের সেবায় আমাদের সব-কটি রোগী বেঁচে গেল।

কিন্তু আমার সনাতনী চালের জন্য বাবার কাছে ভয়ানক বকুনি খেলাম, বিশেষ যখন দেখা গেল যে মাকে বসন্তের ছোঁয়াচ এনে দিয়েছি।

খাদ্যাখাদ্য বিচার হিন্দুর প্রধান কীর্তি বলেই জানতাম। কিন্তু যত দিন পারি, আমার অখাদ্যবর্জন বাবার ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। শেষে ধরা পড়ল। গরমির ছুটিতে আমরা তিন ভাই কুচবেহারে যাচ্ছিলাম। যেখানে রেলপথের শেষ সেইখানে বাবা আমাদের নিতে এসেছিলেন। চিরপ্রথামত ডাকবাংলায় ষোড়শোপচারে ভোজন ঠিক করে রেখেছিলেন। সেখানকার খানসামা তেরো-চৌদ্দবার বিলেত ঘুরে এসেছিল, খুব লায়েক আদমী বলেই নিজেকে জানত, আর কাজেও সেটা দেখাতে চেষ্টা করত। আমাদের খিদের ধার বাড়াবার জন্যেই, বোধ হয়, বাবা menu-টা কি তাই বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় আমার ছোট্ট ভাইটি রসভঙ্গ করলে, বলে উঠল, "বাবা, বড়দা তো ও-সব খাবে না। সকালবেলা তিস্তায় মোছলমানে ছোঁয়া বলে চা টোস্টও খেলে না।" বাবা গম্ভীরভাবে তাঁর চোপদার মিশির ঠাকুরকে ডেকে বললেন, "মিশির, বড়বাবু তোমাদের কাছে খাবেন, নিয়ে যাও।" আমি এত সহজে martyr (শহীদ) হতে পারব আশা করি নেই। মাথা উঁচু করে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলাম। আশা করি খুব সঙের মতো দেখায় নেই। কলকাতায় ফিরে শুনলাম যে, বাবা আমাদের অভিভাবক কাকাকে চিঠি লিখেছেন, "আমার ছেলে যে এত বড়ো গাধা হতে পারে, ধারণা ছিল না।"

এ তো হল ঘরের কথা। একবার খুব বড়ো আসরে হিন্দুত্ব জাহির করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় মারা গেলেন। তিনি আমাদের বড়ো স্নেহ করতেন। দশ দিন আমরা অশৌচ পালন করেছিলাম। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম আমি। যাওয়া মাত্র নারায়ণবাবু ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সেখানে আট-দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসে ছিলেন। একটু কথাবার্তার পর জলখাবার এল। দেখলাম খাবার সব এত পরিষ্কার যে, নিশ্চয় বিলেতি নুন-চিনির তৈরি। আমি বিনয় করে বুঝিয়ে বললাম যে, আমি এ-সব খাই না। পণ্ডিত মহাশয়েরা হেসে উঠলেন, ও বললেন, "এই কথা! এতে আর কি হয়েছে! ওরে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জলখাবার একখানা নিয়ে আয় তো।" তখন অপেক্ষাকৃত মলিন জলখাবার এল। আমার বুকটা দশ হাত হয়ে উঠল। পণ্ডিতদের দেখালাম যে Young Bengal (নব্যবঙ্গ) সবাই অনাচারী নয়!

এবার আমার ইচ্ছা, একটু শিকার সম্বন্ধে পুরানো কথা বলব। আমার প্রধান ভয় সত্যিকার শিকারীদিকে, তাঁরা এই হাতুড়ের অনধিকার চর্চা কৃপা-চক্ষে দেখবেন কি না। মোটের উপর মনে হয় তাঁরা এটা না পড়লেই ভালো। সাহিত্যামোদীদের কাছেও অভয় চাইছি, কারণ কিরাতের প্রলাপ তাঁদের কানে হয়তো নিতান্ত বেসুরো বাজবে। প্রলাপ বললাম বটে, কিন্তু বোধ হয় বিলাপই বলা উচিত, কারণ আমার নিজের মৃগয়ার ধারা "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" তবে এক দিকে যেমন আমার নিষ্কাম কর্মের কথা আছে, তেমনি অন্য দিকে বন্ধুবান্ধবের সকাম সাধনার কথাও তো আছে! সেগুলো বলতে আমার বরং বেশি গৌরব বোধ হয়। আর পাঠকের কি এসে যায়, আমার কথা কি আমার বন্ধুর কথা?

শিকার বলতে অনেক জিনিস বোঝায়, ধাঙড়দের ইঁদুর মারা থেকে পাঠানদের দুশমন মারা পর্যন্ত। এমন কি রসিকজনের সুন্দরী সন্ধানও এই ব্যাপারের অন্তর্গত। তবে আমার অধিকার জীবজন্তু অনুধাবন পর্যন্ত। সেই কথাই বলব। মৃগয়া ব্যসনবিশেষ। কথাটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা থাকলেও আপ্তবাক্য বলে আমার আত্মীয়-স্বজন গ্রহণ করেন নেই। কারণ বাড়িতে যে দোনলা গাদা বন্দুকটা ছিল, সেটা অল্প বয়সেই ছুঁড়তে শিখি। প্রথমবার আওয়াজ করার সময় চোখ দুটো বুজে এসেছিল, আর বন্দুকের ধাক্কায় উল্টে পড়ে গিয়েছিলাম। হয়তো সকলেরই এই হয়। অর্থাৎ সাধারণ লোকের। একজনের হয় নেই, জানি। বহুকালের কথা, অরবিন্দ একদিন আমার ঠাণার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। আমরা একটা ছোটো রাইফেল নিয়ে বারান্দায় আমোদ করছিলাম। অরবিন্দকে কেউ বললেন, "আসুন ঘোষ সাহেব, আপনিও মারুন।" তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, কখনও বন্দুক হাতে করি নেই ইত্যাদি নানা ওজর দেখাচ্ছিলেন। আমরাও নাছোড়বান্দা। শেষে বন্দুক ধরলেন। সামান্য একটু দেখিয়ে দিতে হল কি করে নিশানা করতে হয়। তার পরে বারবার লক্ষ্যভেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্য কি পাঠককে বলে দিই, দেশলাই কাঠির ছোট্ট মাথাটা। ও রকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে!

আমার প্রথম শিকার এক প্রকাণ্ড কুঁদো শেয়াল। যখন পড়ল তখন কি আনন্দ! আত্মহারা হয়ে মাংসটা রেঁধে খাই নেই, এই আশ্চর্য। একটা সাফাই গেয়ে রাখি।

এ শেয়ালটা মেরেছিলাম মায়ের হুকুমে, অন্দর বাড়িতে বড়ো উপদ্রব করত। লাটিনে এক কথা আছে, নরকে নেমে যাওয়ার পথ বড়ো সুগম। এই শেয়াল থেকেই আমার অধঃপতন শুরু। পরে ঝাঁকে ঝাঁকে যখন নিরীহ পাখি মেরেছি, সে তো আর কর্তৃপক্ষের হুকুমে নয়! তবে একটু কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কেন এ দুষ্কর্মে লোক প্রবৃত্ত হয়। বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহে, বন্দুক মারার আনন্দে, রক্তপাতের নেশায়, আর কতকটা খাদ্য-লোভে। আমি কিন্তু পাখির মাংস যা খেয়েছি, তার চেয়ে গালাগাল খেয়েছি ঢের বেশি। আর সে গালাগাল খুব জোরে দিয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা সে মাংস আমার চেয়েও তৃপ্তিপূর্বক খেয়েছেন। কিন্তু গাল খেয়েও আমি স্বধর্ম ছাড়ি নেই। শুধু তাই নয়। যখন যেখানে সুবিধা পেয়েছি ছেলেপিলেদের বন্দুক ধরতে শিখিয়ে আমার গুরুঋণ পরিশোধ করেছি। শাস্ত্র শিখলেই শেখাতে হয়, এই সনাতন বিধি, তা সে যজুর্বেদই হোক বা ধনুর্বেদই হোক। বিরুদ্ধপক্ষ হয়তো ধনুর্বেদকে চৌর্যশাস্ত্রের দলে ফেলবেন। তা ফেললেই বা, চুরি যদি করতেই হয় তো আনাড়ীর মতো করা কিছু নয়! মানুষের শত্রু বাঘ ভাল্লুক মারতে যে দোষ নেই, সেপাই হতেও যে দোষ নেই, এ কথা যোগী ঋষি ছাড়া সবাই কবুল করেন। কিন্তু এই দুই কাজেই সিদ্ধির জন্য রীতিমত সাধনার দরকার। কেবল চাঁদমারিতে নিশানা করতে শিখে বাঘ-শত্রু কি মানুষ-শত্রুর সামনে গেলে আত্মঘাতেরই বেশি সম্ভাবনা। আত্মঘাত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তো দুপয়সার সেঁকো খেলে সস্তাও পড়ে, কষ্টও কম। কিন্তু শত্রুনাশ করতে হলে অব্যর্থ লক্ষ্য থাকা চাই, আর শরীরটাও রীতিমত রোদ-জল-সহা হওয়া চাই। বনে পাহাড়ে নদীর চরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করাই এর সোজা উপায়। এই আমার গীতোক্ত অভ্যাসযোগ। এই ঈশোপনিষদের অবিদ্যার উপাসনা, যা নইলে অমৃতাশনের কোনোও আশা নেই। ছেলে বখানোর কৈফিয়ৎ যথাসাধ্য দিলাম। একটা কথা বলি, আমার দু-চার জন কাক-শালিক-মারা শিষ্য এখন রীতিমত শের-আফগান হয়েছেন।

শিকার করলে শুধু শরীর শক্ত হয় তা নয়, নানারকমের শিক্ষাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। রক্ত দেখলে গা ছমছম করা বন্ধ হয়ে যায়। দেশের গরিব চাষী, কাঠুরে প্রভৃতির সঙ্গে ভালো করে চেনাশুনো হয়। এই-সমস্ত লোক, যারা আমলামাত্রকেই ভয় করে, ভদ্রলোককে দূরে ঠেলে রাখে, তারা শিকারীদের সঙ্গে এত অসংকোচে মেশে, যে আশ্চর্য! আনাড়ীর মতন নিশানা চুকলে সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দেয়, বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে না। এই সম্বন্ধে দুই-একটি মজার গল্প বলি। একবার গোবরডাঙার জ্ঞানদাবাবু দুই হাকিমসাহেবকে নিয়ে স্নাইপ (কাদাখোঁচা) মারতে

গেছলেন। স্নাইপ খুব জোরে ওড়ে, মারা ভয়ানক কঠিন কাজ। সাহেব-দুটি নিতান্ত green, অর্থাৎ কাঁচা শিকারী ছিলেন। তবু সাহেব তো, খুব কেতা করে দড়াম দড়াম করে টোটা ওড়াতে লাগলেন। চিন্তা নেই, টাকা গৌরী সেনের! প্রায় পনেরো মিনিট পরে যখন পাখি একটাও পড়ল না, জ্ঞানদাবাবুর বুড়ো শিকারী ভয়ানক চটে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবু, এগুলাকে ঘুঘু মারতি নিয়া যান।" সাহেবদের অর্থ-বোধ হল, কারণ বাঙলায় Higher standard পরীক্ষা পাস করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে এ-রকম বলা এক গান্ধীজি বলতে পারেন, আমাদের কর্ম নয়। আমার অদৃষ্টে একবার এই-রকম স্তুতিবাদ মিলেছিল। এক প্রকাণ্ড বিলে হাঁস মারতে গেছি। গাদা গাদা শর কেটে এক সঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরি হয়েছিল। তাইতে শিকারী-সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে বসেছি, আর গ্রামের লোক চারি দিকে ডিঙ্গিতে ঘুরে ফিরে হাঁস ওড়াচ্ছে। তার আগের হপ্তায় এক দল সাহেব এসে অজস্র পাখি মেরে নিয়ে গেছলেন, তাই আমার পাখিগুলো খুব উঁচুতে আর ভীষণ বেগে উড়ছিল। আমি আন্দাজ পাচ্ছিলাম না। এক-এক বার গুলি যেই ফসকে যায়, শিকারীগুলো কোরাস গেয়ে ওঠে, "রাম রাম বলে চলে-এ-এ গেল।" একে নিজেরই যথেষ্ট বিরক্তি, তার উপর এই কোরাস গান, মনের অবস্থা কি হচ্ছিল বুঝতেই পারছেন। হঠাৎ দৈব সদয় হলেন। আন্দাজ পেয়ে গেলাম। পরে পরে গোটা কয়েক হাঁস ফেলার পরে শিকারীদের কৃপা হল, সর্দার বলে উঠল, "হ্যাঁ, আজ পাখিগুলো বড়ো বেয়াড়া রকম উড়ছে বটে।" এই আশ্বাস পেয়ে আরও কয়েকটা পাখি ফেলে সে যাত্রা মান বাঁচালাম। আমি তখন ম্যাজিস্ট্রেট, শিকার আমার এলাকার মধ্যেই হচ্ছিল, তবু এই ব্যাপার!

আর-এক বার এর চেয়েও বিভ্রাট ঘটেছিল। কারণ, নায়ক স্বয়ং পুলিস সাহেব। সেটা ছিল এক পাহাড়ে দেশ, কিন্তু জঙ্গল পাতলা, কাজেই জানোয়ারও খুব কম। কোনো কোনো জায়গায় দু-চারটে হরিণ মাত্র। নানারকম তোড়জোড় করে শিকার করতে হত। হয়তো একটা সমস্ত পাহাড় হাঁকা করে একটি হরিণ বের হবে। সেটি ফসকালে সারা সকাল রৌদ্রে হাঁটাই সার। আমি দুই-একবার কপালজোরে একটু কারদানী দেখাতে পেরেছিলাম, তাই আমাকে গাঁয়ের লোকে খাতির করত। একদিন এই পুলিস সাহেবটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, আর পাটিলকে বিশেষ করে বলে দিলাম যে এঁকে একটা হরিণ দেওয়াই চাই। সুতরাং জঙ্গল ভাঙবার সময় সব চেয়ে ভালো জায়গাটায় তাকে বসালে। কিন্তু বেচারার সেদিন নসীব খারাপ। দু-দুবার হরিণ এল একেবারে কাছে, সে আওয়াজও করলে, কিন্তু

গুলি লাগল না। এতে সত্যি লজ্জার কিছু নেই! আর-একটা হরিণ বের হলে হয়তো ঠিকই পেত। কিন্তু বেলা বারোটা পর্যন্ত মানুষে কুকুরে সারা বনটা তোলপাড় করলে, আর কিছুই দেখা গেল না। শ্রান্ত হয়ে এক গাছতলায় সবাই বসে আছি, এমন সময় পাটিল বোধ হয় আশ্বাস দেবার অভিপ্রায়ে বললে, "আসছে বার, সাহেব, তোমার কাছে হরিণ বেঁধে এনে দেব।" সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পাটিল আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি, বাবা, অত দূরে কেন বসলে? আমাদের আজ মাংস একটু জুটল না।" সাহেবটি বিমর্ষভাবে বললে, "I didn't know I was such a rotten shot." (এত বড়ো আনাড়ী আমি, তা জানতাম না।) হয়তো এই পাটিলই গ্রামে কি শহরে হলে পাঁচ মিনিট অন্তর সাহেবের পায়ের ধুলো নিত। কিন্তু এ যে বন, এখানে সবাই সমান! বনের এই শিক্ষাটা আমাদের সকলের হওয়া ভালো নয় কি!

অকারণ নিষ্ঠুরতা সত্যি শিকারীর চোখেও নিন্দার জিনিস! যে শিকারী পাখি কি জানোয়ার জখম করে করে ছেড়ে দেয়, তার বড়ো দুর্নাম হয়। বাঘ জখম করে ছেড়ে আসা তো একটা গুরুতর অপরাধ! কারণ চোট-খাওয়া বাঘ দু-একদিনের ভেতর বনে এক-আধটা কাঠুরে মারবেই। যে বাঘ কখনও মানুষের সংস্রবে আসে নেই তার প্রথম চেষ্টা পলায়নের, কিন্তু যিনি গুলি খেয়েছেন কি মানুষের রক্ত আস্বাদন করেছেন, তিনি সদাই মানুষের পিছু ঘুরছেন। বাগ পেলেই ঘাড় মটকে দেবেন। শিকারের তাই একটা কড়া নিয়ম আছে যে, বাঘের উপর একবার গুলি ছুঁড়লে তাকে নিকেশ করে আসতেই হবে। আমার এক বাল্যবন্ধুর প্রথম বাঘ মারার গল্প বলি। তিনি উত্তরবঙ্গে কোনোও মহকুমায় চাকরি করতেন। তাঁর শিকার প্রধানতঃ পদব্রজেই চলত। তবে কালেভদ্রে হাকিম মহাশয়ের সওয়ারীর হাতিটা পেতেন। দু-চারটে বনবরা' ও চিতাবাঘ মারার পর বন্ধুবরের সাধ হল এইবার একটা সত্যি গো-বাঘা মারবেন। একদিন খবর এল, এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড বাঘ কাদের মহিষ মেরে এক হোগলা বনে নিয়ে ফেলেছে। আশে পাশে কোনো বাঘমারা সাহেবলোক ছিলেন না, কাজেই বন্ধুর সুযোগ মিলল। হাকিমবাবুর হাতি চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে এক মেচ-জাতীয় শিকারী। খুব ভোরে বনের বাইরে উপস্থিত হলেন। শিকারী নেমে দেখিয়ে দিলে কোনখান দিয়ে বাঘ মহিষটাকে টেনে নিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে হাতি সেই পথে বনে ঢুকল। এ রকম ক্ষেত্রে হাতির পায়ের শব্দে বাঘ সচরাচর পালায় না। বড়ো জোর একটু এদিক ওদিক সরে গিয়ে দেখে যে আগন্তুক কে। এবার কিন্তু তাও করলে না।

হাতি একেবারে Kill-এর (মরা মহিষটার) সামনে বন্ধুবরকে উপস্থিত করলে। তিনি দেখলেন যে বাঘটা আধ-শোওয়া অবস্থায় মহিষের ওপর দুই থাবা রেখে দিব্যি একমনে ছোটো-হাজরী করছে। হাতির পায়ের শব্দে তার প্রকাণ্ড চাকাপানা মুখখানা তুললে। বন্ধুবরের সঙ্গে চোখোচোখি হল। এ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুবই শক্ত। তবে বন্ধু আজন্ম বনচারী. সহজে ঘেবড়ে যাবার পাত্র ছিলেন না। নিমেষের মধ্যে বাঘের দুই জলন্ত চোখের মাঝে তাক করে লাগালেন গুলি। যেই-না গুলি মারা, বাঘ ভীষণ গর্জন করে দিলে এক লাফ। হাতিটা শিকারী হাতি ছিল না। গৌড়জনসুলভ প্রকৃতি। চক্ষের পলকে মুখ ফিরিয়ে ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে দৌড় দিলে। বন্ধু সতর্ক ছিলেন না, মাথায় একটা গাছের ডাল লেগে গড়িয়ে ভুঁইয়ে পড়ে গেলেন। চোট লেগে বেহোঁস হয়ে পড়লেন। অনেক ক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হল, দেখলেন যে হাত পা কিছু ভাঙে নেই, কিন্তু বন্দুকটা দুখণ্ড হয়ে গেছে! সন্তর্পণে সরীসৃপগতিতে বন থেকে বার হলেন। মহাসংকট। জখম বাঘটাকে বনে ছেড়ে যেতেও পারেন না, অথচ ভাঙা বন্দুক নিয়ে করেনই বা কি! সর্বাঙ্গে ব্যথা, আস্তে আস্তে সদরের পানে হেঁটে চললেন নূতন বন্দুক সংগ্রহ করে ফিরবেন বলে। তখন বেশ বেলা হয়েছে। হঠাৎ দেখলেন দূরে কে হাতি চড়ে যাচ্ছে। জোরে হাঁক ছাড়লেন। হাতি কাছে এলে দেখলেন এক পরিচিত গারো জমিদার। তাঁকে সব ঘটনা বলতেই তিনি তাঁর হাতি ও বন্দুক দিলেন। বন্ধু আবার বনে ঢুকলেন. এবার কিন্তু প্রাণ হাতে করে। জানতেন বাঘ সহজে ছাড়বে না। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে হাতি যখন ভেতরে গেল, দেখলেন যে বাঘ মহিষের উপর শুয়ে আছে। একেবারে কাছে গেলেন, তবুও ওঠে না। তখন হাতি শুঁড় দিয়ে বাঘকে নাড়া দিলে। দেখা গেল, বাঘ মধ্যললাটে বিধিলিপি নিয়ে ব্যাঘ্রের প্রেতলোকে চলে গেছে। হাতির উপর শব তুলে নিয়ে বন্ধু সেই গারো রাজার সঙ্গে মহাধূম করে নগর প্রবেশ করলেন। পকেটে যে রুটি ও গুড় ছিল, সেটা খাবার ফুরসৎ এতক্ষণে হল!

একটা ভালুক শিকারের গল্প বলি। Bad shot, অর্থাৎ বে-আন্দাজি গুলি মারা, কতটা লজ্জার কথা, পাঠক তা বুঝবেন। আমার পরিচিত এক সাহেব তাঁর দুই বন্ধু নিয়ে পশ্চিমে সুলেমান পর্বতে ভালুক মারতে গেছলেন। তিনজনেই পাকা শিকারী, কিন্তু সারা সকাল পাহাড়ে পাহাড়ে মহুয়া ও বাদাম গাছের তলায় ঘুরে একটাও ভালুক দেখতে পেলেন না। তখন কতকটা শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে টিফিন বাক্স নিয়ে বসে পড়লেন পাহাড়ের গায়ে এক সরু তাকের উপর। সাহেবদের একটু

ক্ষিদে বেশি, রসদের গোলযোগ হলে কাজ পণ্ড হয়ে যায়, এ কথা সবাই জানেন। আমার সাহেবরা যখন রুটি মাখন, নানারকম পশুপক্ষীর মাংস ও পানীয়ের বোতল নিয়ে বেশ জমে বসেছেন, খুব গল্প চলেছে, তখন হঠাৎ পাহাড়ের ফাটল থেকে এক বিশাল কালো ভালুক বেরিয়ে এল। যেই বেরোনো, কি তিন সাহেবই চক্ষের নিমেষে বন্দুক তুলে দুম দাম দুম করে তার উপর তিন আওয়াজ! ঋক্ষরাজ তাক থেকে গড়িয়ে একেবারে খদে পড়ে গেলেন। তখন তিনজনে মহা তর্ক লেগে গেল। এ বলে আমার গুলি লেগেছে, ও বলে আমার গুলি। তিনজনের বন্দুকের ফাঁদল তিন মাপের, সুতরাং জানোয়ার দেখলেই তো বোঝা যাবে, কার গুলি লেগেছে। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনজনেই খদে নেমে গেলেন। গিয়ে দেখলেন ভালুকটা মরে পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার গায়ে কোথাও গুলির দাগ নেই, পুচ্ছাগ্রে মাত্র একটা জখম। তখন তিনজনের আবার তর্ক। এ বলে ও তোমার গুলির দাগ, ও বলে ও তোমার। কেউই সে চমৎকার লক্ষ্যবেধের জন্যে দায়ী হতে চায় না। শেষে মিটমাট হল। স্থির হল তিনজনেই নিশানা চুকেছেন, পড়বার সময়ে কোন কাঁটাগাছে লেগে ভালুকের ল্যাজের ডগা ছিঁড়ে গেছে।

আমি একবার বাঘের নাকে গুলি লাগিয়ে কি রকম লজ্জা পেয়েছিলাম, সে গল্পটাও করি। বাঘ শিকার অনেক রকমের হয়। এক রকম তো বলেছি, একটা হাতি নিয়ে, কি পায়ে হেঁটে, ধীরে ধীরে জঙ্গলে ঢুকে kill-এর উপর বাঘকে মারা। আর এক রকম হচ্ছে বড়োলোকের শিকার, অনেক হাতি নিয়ে। অধিকাংশ হাতি অর্ধচন্দ্রাকৃতি সারবন্দী হয়ে জঙ্গল ভাঙতে থাকে, আর যে দিকটায় বাঘ বেরিয়ে পালাবার সম্ভাবনা, সেই দিকে হাওদা-বাঁধা হাতির উপর শিকারীরা ঘাঁটি আগলে বসেন। এই রকম শিকারে বাঘকে খুবই কাছে পাওয়া যায়। পেছনে তাড়া খেয়ে বাঘ বনের কিনারায় এসে মুখ তুলে একবার দেখে নেয়, সামনে কি আছে। সেই সময়ে মারবার খুব সুবিধা, যদি নিজের মাথা ঠিক থাকে। এই অবস্থায় আমি একদিন বাঘের অপেক্ষায় রয়েছি। আমার দুদিকে দুজন পাকা শিকারী। সামনের কেশেবনের উপরটা যে রকম ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে বাঘ সোজা আমার কাছে আসছে। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে একটু বেঁকে গিয়ে আমার ডানদিকের শিকারীর সামনে মাথা বাড়ালো। তিনি আমাকে একটা সুযোগ দেবার ইচ্ছাতে চেঁচিয়ে বললেন, আপনি মারুন। আমার হাতিতে হাওদা ছিল না, pad-এর (গদীর) উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম, ঝট্‌ করে ঘুরে বসতে সাহস হল না। যদি হাতিটা হঠাৎ দৌড় মারে তো মুশকিল! ডান দিকে নিশানা করতে

বাধ বাধ ঠেকল। ফলে গুলি লাগল না। বাঘ ফিরে জঙ্গলে ঢুকল, কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলে না, কেননা হাতির লাইন অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। ভয় পেয়ে বাঘ তিন লাফে আমার বাঁদিকের শিকারীর পাশ দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বেরোল। তিনি মারলেন এক গুলি। বাঘ কিন্তু পড়ল না। আমরা তিনজনেই হাতি ফিরিয়ে তার পিছু নিলাম। খানিক দূরে দেখি এক কুল ঝোপের ভিতর বসে বাঘটা ভীষণ গর্জাচ্ছে। আমি এক ঘা মারতেই উল্টে পড়ল। আমি আনাড়ী শিকারী, মনে মহা আনন্দ হল, বাঘ মেরেছি। কিন্তু হাতিগুলো যখন তাকে টেনে বের করলে, দেখা গেল যে আমি গুলি না মারলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না, কারণ আমার বাঁদিকের বন্ধু গোটা চারেক Buck shot ছররা তার বুকের ভিতর চালিয়ে দিয়েছিলেন। শিকারের নিয়ম অনুসারে বাঘ তাঁর, আমার নয়। হঠাৎ এক মাহুত বাঘের নাকের উপর এক জখম দেখিয়ে বললে, "হুজুরই প্রথম গুলি লাগিয়েছিলেন।" আমি সবেগে ঘাড় নেড়ে জানালাম যে, আমার গুলি মোটে লাগে নেই, ওটা ছররার দাগ।

আমার মৃগয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে এলেই হাস্যরসের অবতারণা হবে, সুতরাং সে আর কাজ নেই। এইবার একটা বড়ো দুঃখের গল্প বলি। পাঠক বুঝবেন, শিকার-কাহিনীতে করুণ রসের অভাব নেই। একদিন এক ডাক্তারবাবু আমাদের বাড়ি এসেছিলেন বক্সা দুয়ারের এক চা-বাগান থেকে। মস্ত বড়ো শিকারী বলে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল, তাই আমি তাঁকে বললাম, "আমায় নিয়ে একদিন বাঘ মারতে চলুন না।" তিনি বললেন "মশায়! আমি নাকে কানে খৎ দিয়ে বন্দুক ধরা ছেড়ে দিয়েছি।" কি হয়েছিল, বারবার জিজ্ঞেস করায় নিতান্ত অনিচ্ছায় এই গল্প বললেন। তাঁদের চা-বাগান প্রায় ৯০০ একার জমি। তার তিন ভাগের এক ভাগ পরিষ্কার করে বাগান হয়েছে, বাকী ৬০০ একার এখনও ভীষণ জঙ্গল, তার মধ্যে থাকে না হেন বুনো জানোয়ার নেই। সেই বনে পনেরো বছর ঘুরে ঘুরে আমাদের ডাক্তারবাবু অব্যর্থ লক্ষ্য ও অগাধ সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। এ তো আসামের বাগান নয় যে ডাক্তারকে নানা কাজে অকাজে ব্যস্ত থাকতে হয়! আর এখানকার কুলিরা পাহাড়ী, তাদের অত বেশি ঔষধপত্রও দরকার হয় না। তাই ডাক্তারের সময়ের অপ্রতুল ছিল না। তিন বছর আগের কথা। বিলেত হতে এক তাজা ছোটো সাহেব এসেছেন। বড়ো সাহেব কাজে বড়ো ব্যস্ত, তাই ডাক্তারবাবুকে ডেকে বললেন, "ডাক্তার, ছোটো সাহেবকে একটু শিকার করিয়ে নিয়ে এস।" এক পুরানো ওস্তাদ শিকারী হাতি ও মাহুত দিলেন। ছোটো সাহেবের কিন্তু এ

বন্দোবস্ত ভালো লাগল না! ডাক্তার একটা বাবু মাত্র, আর তার হাতে কিনা বড়ো সাহেব ছেড়ে দিলেন শিকার শিখতে! বেচারার অদৃষ্ট, প্রথম থেকেই ডাক্তারের সঙ্গে খিটিমিটি আরম্ভ করলে, ডাক্তারকে জানিয়ে দিলে যে সে আপন দেশে অনেক শিকার করেছে, তার নূতন শেখবার কিছু নেই। হাতি ক্রমে গভীর বনে এসে উপস্থিত হল। সন্তর্পণে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। শিকারের কানুন অনুসারে মানুষ তিনটিই নিস্তব্ধ, নির্বাক। এমন সময়ে দূরে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড বারশিঙ্গা হরিণ চরছে। সাহেবকে ডাক্তার বললেন, বেশ করে তাক করে একটা গুলি লাগাও। ছোকরাটি বন্দুক তুললে বটে, কিন্তু হাতির শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যতটা গা নড়ে তাতেই তার হাত কাঁপতে লাগল। সে নীচে নেমে মারতে চাইলে। ডাক্তার অনেক বারণ করলেন, প্রবীণ মাহুত জোড়হাত করলে, কিন্তু সেখানে বেশি কথা তো কওয়ার জো নেই, তাকে বন্ধ করা গেল না। হাতির ল্যাজ বেয়ে নেমে পড়ল, আর হরিণের উপর আওয়াজ করলে। হরিণ পালালো, কিন্তু এদিকে চক্ষের পলকে এক ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেল। কাছের বেত ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক প্রকাণ্ড বাঘ এক লাফে ছোকরার ঘাড়ে এসে পড়ল। দেখতে না দেখতে বাঘে মানুষে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। ডাক্তার ইতিমধ্যে নেমে পড়েছেন, কিন্তু প্রায় মিনিটখানেক ভরসা করে গুলি মারতে পারলেন না, যদি ছোকরাটির গায়ে লাগে। যখন সুবিধে পেলেন, মারলেন বটে, বাঘও গুলি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ল, কিন্তু সাহেবটির মাথা তার আগেই দু থাবার মাঝে পিশে গুঁড়ো করে দিয়েছিল। শব দুটো নিয়ে ডাক্তার বড়ো সাহেবের বাংলায় ফিরলেন। তিনি দেখামাত্র সব বুঝলেন, গম্ভীর স্বরে বললেন, "তুমি চলে যাও ডাক্তার, আর আমাকে কখনও মুখ দেখিও না।" ডাক্তার নীরবে মাথা হেঁট করে চলে গেলেন। পরের দিন খুব ভোরে সাহেব ডাক্তারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। আসবাবপত্র প্যাক করা দেখে কাতরভাবে বললেন, "ডাক্তারবাবু, তুমি আমি পনেরো বছরের বন্ধু। কুঠির বন্ধু নয়, আপিসের বন্ধু নয়, বনজঙ্গলের বন্ধু, আমার একটা কথায় রাগ করে চলে যেও না। কিন্তু ছোকরা মায়ের এক ছেলে ছিল, বিশ্বাস করে তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আমরা রক্ষা করতে পারলাম না, ডাক্তার!" ডাক্তার উঠে গিয়ে তাঁর সাধের বন্দুকটি নিয়ে এলেন, নলটা ধরে ভুঁয়ে আছাড় মেরে তিন টুকরো করে ফেললেন। সাহেব নিঃশব্দে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই থেকে ডাক্তার আর বন্দুক ধরেন নেই।

ইংরেজিতে যাকে sport বলে, তাতে নীচতা বা বীরধর্মের অবমাননা কিছু নেই।

সাহেবরা বসা পাখি মারেন না। কেউ মারলে তাকে pot shot (হাঁড়ি ভরাবার জন্য শিকার) বলেন। হাতির উপর থেকে বা মাচানের উপর থেকে বাঘ মারাতে শিকারীর বিপদের অন্ত নেই, তাই সেটাও sport বলেই গণ্য! কিন্তু কোথাও কোথাও রাজোয়াড়াতে কোঠাবাড়ির মধ্যে বসে যে বাঘ মারা হয়, সেটা খুন-খারাবির সামিল। সেই রকম, মোটারে বসে ভীষণ ঝকঝকে আলো ফেলে জানোয়ারের চোখ অন্ধ করে দিয়ে তাকে গুলি মারা, সেও আমার মতে কসাইয়ের কাজ। সত্যি, স্বীকার না করে উপায় নেই যে যথার্থ মরদের মতো বাঘ মারা পায়ে হেঁটেই হয়ে থাকে। ইতিহাসের শের আফগান সম্মুখযুদ্ধেই শের মেরেছিলেন। আমাদের এ কালে যতীন মুখুজ্যেও মল্লযুদ্ধে বাঘ মেরে 'বাঘমারা যতীন' নাম পেয়েছিলেন। অবশ্য বাঘকে ভগবান যেমন নখদন্ত দিয়েছেন তাতে শিকারীর হাতে অস্ত্র থাকায় পরাক্রমের লাঘব হয় না। একবার এক মস্ত জাঁদরেল ইন্দোরের শিবাজীরাও হোলকারের দরবারে উপস্থিত হয়ে শের মারা সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব করছিলেন। হোলকার জিজ্ঞেস করলেন, "সাহেব, তুমি কি রকম করে শের মার?" বেচারা সেনানী জবাব দিলেন যে মাচানই তাঁর মতে প্রশস্ত উপায়। রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তুমি না জাঁদরেল, গাছের উপর থেকে লুকিয়ে বাঘ শিকার কর!" সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, আপনি তবে কি করে মারেন?" রাজা উত্তর করলেন, "শের কে সাথ শের কী লড়াই! চলিয়ে সুবোকো মেরে সাথ, বাতায়ঙ্গে।" সাহেব গেছলেন কি না, আমি শুনি নেই। এই হোলকার নাকি পাগল ছিলেন। সিংহাসন ছাড়ার পর কিছুদিন মাথেরান পাহাড়ে থাকতেন। একদিন এক পারসী ছোকরা খুব জোর সাহেবী কাপড় পরে মহা কায়দায় তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা কিন্তু তার খোঁড়াচ্ছিল! হোলকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে ডাক দিলেন, "পারসী, এই পারসী! ইধার আও।" সে বেচারা প্রাণপণ চেষ্টায় তার সোলাটুপীর মর্যাদা রক্ষা করছিল, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। রাজাও ছাড়বার পাত্র নয়, সেপাই পাঠিয়ে তাকে ঘোড়া-সুদ্ধ ধরিয়ে আনালেন। হিন্দীতে হুকুম করলেন, "উতর যাও, ঘোড়ে কা পায়ের দেখো।" দেখা গেল এক পায়ে ঘা, তাই ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছিল। রাজা চটে আগুন হয়ে গেলেন। চার জন লোক সঙ্গে দিয়ে পারসীটিকে বললেন, "ঘোড়ার মুখ ধরে আস্তে আস্তে আস্তাবলে নিয়ে যাও। পথে যদি ঘোড়ায় চড়তে চেষ্টা কর তো আমার সেপাইরা তোমায় খদে ফেলে দেবে। আর ফের যদি কোনো ঘোড়াকে কষ্ট দাও তো তোমার ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।" পাগল বই কি, নইলে বাঘের জন্য, ঘোড়ার জন্য, এত দরদ!

হরিণ শিকারে বড়ো আনন্দ পাওয়া যায়, যদিও তাতে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। পাঠক আমাকে হঠাৎ কাপুরুষ বলে বসবেন না যেন। হরিণগুলো যে রকম নির্মমভাবে ক্ষেতের শস্য ধ্বংস করে, তা দেখলে বুঝবেন যে তাদের মেরে ফেলা অস্ত্রধারীর একটা কর্তব্যের মধ্যে। বরাহ আর হরিণ কৃষকের এত বড়ো শত্রু বলেই মৃগ-মাংস ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত খাদ্য বলে নির্ধারিত হয়েছিল। Sport-এর জন্য হরিণ শিকার পায়ে হেঁটেই হয়। দূর থেকে হরিণ নজর করে নিয়ে. আস্তে আস্তে কখনও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে, কখনও বুকে হেঁটে, সন্তর্পণে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পৌঁছানো যে কত আনন্দ তা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। তার পরে ঠিক জায়গাটিতে গুলি না লাগাতে পারলে হরিণ হস্তগত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ, সে এক ছুটে ক্রোশখানেক বেরিয়ে যাবে। ক্ষেতের শস্য নষ্ট করাতে কিন্তু সেরা হচ্ছে গণ্ডার। একা একটা গণ্ডার এক রাত্তিরের ভেতর বেশ আট-দশখানা ক্ষেত বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। তাই উত্তরবঙ্গের হিন্দুরা গণ্ডারমাংসকে অতি পবিত্র মনে করে। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় এই মাংস পেলে শ্রাদ্ধ নাকি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়! আগে ঐ দেশে অজস্র গণ্ডার ছিল। ক্রমশঃ খুব কমে গেছে। শুনলাম সম্প্রতি বাঙলা সরকার নাকি গণ্ডার বাঁচাবার জন্য আইন করেছেন। এই দরদটা সময়ে হলে, আজ অতিকায় megalosaurus ও dinosaurus পথে পথে ঘুরে বেড়াত। বাড়ি বাড়ি টিয়া পাখির বদলে লোকে pterodactyl পুষত। তারা তো সব গেল, এখন গণ্ডারটা বাঁচলেই পৃথিবীর সৌন্দর্য কায়েম থাকবে। কি দয়ার শরীর মানুষের! পাথমারাদের কিন্তু দয়ামায়া নেই. তাদের মন্ত্র, "মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার!" কিন্তু সকলের অদৃষ্টে তো গণ্ডারের দেখা মেলে না। আমার কপালক্রমে একবার মিলেছিল, পাঠককে সেই গল্পটা শোনাব। একদিন কুচবেহারে দুই খবরিয়া আমার কাছে এসে বললে যে, এগারো মাইল দূরে এক গণ্ডার এসেছে, আর গাঁয়ের লোকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাকে কোনোরকমে আটকে রেখেছে এক বাবলা বনে। তাদের ইচ্ছা, আমি গিয়ে মারি। সে সময় সারা রাজ্যে গোটা পাঁচ-সাত গণ্ডার বই ছিল না। তাদের সযতনে সরকারী জঙ্গলে পুরে রাখা হত, বংশ বৃদ্ধি হবে এই আশায়। আমি স্থির বুঝলাম যে, এ তারি একটা আর একে আমি মারলে রাজদণ্ড, অন্ততঃ রাজরোষ, অবশ্যম্ভাবী। মেজো রাজকুমার তখন কুচবেহারে ছিলেন। তিনি স্থির করলেন যে, গণ্ডারের বিরুদ্ধে অভিযান অবশ্য কর্তব্য। তবে শিখিয়ে-পড়িয়ে এই গল্প রচনা করা গেল যে, জানোয়ারটা এ রাজ্যের নয়, রঙপুর জেলা থেকে এসেছে। গাড়ি চেপে আমরা কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত

হলাম। তিনটি হাতি সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছিল। এক দল কলেজের ছাত্র গেঁড়া মারা দেখার জন্য জিদ করে সঙ্গে চলল। পৌঁছে দেখা গেল আট-দশ বিঘে এক বাবলা বন, তাই ঘেরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অস্ত্র, কেরাসিনের টিন, ঢোলক ইত্যাদি। রাজকুমার একটা হাতি চড়ে দূরে বনের উল্টো পিঠে চলে গেলেন। স্থ—দ্বিতীয় হাতি নিয়ে ডাইনের দিকে গেলেন। বনের সামনে যে একটু খোলা ময়দান ছিল, তার এক দিকে কচুয়া সাহেব তৃতীয় হাতির উপর রইলেন, অন্য দিকে আমি ছেলেদের নিয়ে ভুঁইয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজকুমার আমার হাতে একটা খুব জোরালো Cordite বন্দুক দিয়েছিলেন কিন্তু আমার মতলব ছিল যে পারতপক্ষে বন্দুক ছুঁড়ব না। ছেলেদিকে আমার পিছনে স্থচীব্যূহ করে দাঁড় করিয়েছিলাম। তাদের তালিম দিয়ে রেখেছিলাম যে, গেঁড়া যদি আমাদের পানে তাড়া করে, তো সকলে দিকবিদিকে দৌড় দেবে, সোজা নয়, এঁকে বেঁকে। তাদের বাঁচাবার জন্যে দরকার হয় তো আমি বন্দুক ছুঁড়ব, নইলে নয়। সকলে আপন আপন ঘাঁটি নিলে পর একটা বাঁশি বাজল, আর চাষারা চারি দিকে মহা উৎসাহে ঢাক ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে দিলে। দেখা গেল যে, বনের ভেতর একটা বাচ্চা হাতির মতো জন্তু দৌড়াদৌড়ি করছে, একবার এ দিক একবার ও দিক, যেন ভয় পেয়েছে। হঠাৎ দড়াম করে এক মোটা আওয়াজ হল, বোঝা গেল স্থ— তার প্রকাণ্ড সেকেলে ten bore রাইফেলটা ছুঁড়েছে। গেঁড়া বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। স্থ—চেঁচিয়ে বললে, "সাবধান জিৎ, লেগেছে", আবার বন্দুকের আওয়াজ হল, এবার পিং গোছের শব্দ, বুঝলাম রাজকুমার মারলেন। সোঁ করে একটা গুলি ছেলেদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল! ভীষণ দুর্ঘটনা হতে হতে বেঁচে গেল। কিন্তু বিধাতাপুরুষকে ডাকবার আমার সময় ছিল না, কারণ তখনই সেই প্রকাণ্ড গণ্ড-মৃগ জঙ্গল ভেঙে ময়দানে উপস্থিত হল। কোন দিকে যায়! দেখতে দেখতে কচুয়া সাহেবের হাতির দিকে মাথা নীচু করে তেড়ে গেল। ভাগলো হাতি ল্যাজ তুলে। সাহেব দুবার বন্দুক চালালেন, লাগল না। গণ্ডারটা যে কি ভয়ানক দেখাচ্ছিল, কি বলব? স্থ—র গুলিটা গলার কাছে লেগে অনেকখানা মাংস বেরিয়ে পড়েছে, ঝর ঝর করে রক্ত বইছে, রাগে পাগল হয়ে প্রথমে হাতিটাকে তাড়া করলে, তার পর এক টাট্টু ঘোড়া চরছিল সেটাকে প্রায় খতম করলে। আমরা কৃষ্ণনাম জপছিলাম, কিম্বা ওইরকম একটা-কিছু করছিলাম। যাক্, ছেলেদের দিকে ফিরল না। বিশ-পঁচিশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কি বিকট শব্দ হচ্ছিল, কি রকম খক্ খক্ খক্ করে কাসছিল, আর গায়ের ঢালগুলো খসখস আওয়াজ

করছিল। আমার বেয়ারাটা তো ভয়ে আত্মহারা হয়ে কুকরি হাতে সেই জখম গেঁড়ার পিছু পিছু ছুটল। গেঁড়া পালালো, পিছু পিছু উড়ে বেয়ারা। কচুয়া সাহেবকে নিয়ে তাঁর হাতি অন্তর্ধান। দুই-এক মিনিটে রাজকুমার ও স্থ—"কোথা গেল, কোথা গেল," করতে করতে এসে পড়লেন। আমি বলে দিলাম আমার বেয়ারার পাগড়ী লক্ষ্য করে সোজা চলে যাও, কিন্তু ও বেচারাকে মেরো না যেন! হাতি দুটো ছুটল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। একটু গিয়েই দেখি, অনেক দূরে গেঁড়াটা কুকুরের মতন ল্যাজের কুণ্ডলীর উপর বসে রয়েছে। বোধ হল আর দৌড়বার দম নেই। প্রায় তিনশো কদম দূর থেকে রাজকুমার গুলি লাগাতেই উলটে পড়ল। তার পর দুদিন ধরে সেই পবিত্র মাংস বিতরণ হল। সেদিন বন্দুক না মেরে আমি বড়ো বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম। রাজকুমার নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিলেন, তাই মহারাজের রাগ হতে স্থ—বেঁচে গেল।

যদি পাঠকের মনে এ রকম কোনোও কুসংস্কার থাকে যে জাতিবিশেষের শিকার বিষয়ে একটা জন্মগত অধিকার আছে, তা হলে আমি মিনতি করি যে সেটা বর্জন করুন। কি লক্ষ্যভেদে কি সাহস-পরাক্রমে অমুক দেশের লোকের প্রাক্তন সংস্কার আছে, তা বলা যায় না। সবটাই আবেষ্টনের কথা। মৃগয়া অর্থ-সাপেক্ষ আমোদ। অজস্র টোটা না ওড়ালে সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে সিদ্ধি নানা রকমের। রাজা-রাজড়াদের শিকারক্যাম্প কতকটা political (মতলবী) ব্যাপার। তাই অতিথি এলে তাঁকে তুষ্ট করার রীতিমত বন্দোবস্ত রাজাবাহাদুরদের থাকে। খুব মহামান্য অতিথির খাতিরে মাংসে আফিম মিশিয়ে বনে রেখে দেওয়া হয় এ রকম নিন্দাবাদও শুনেছি। এটা বাড়াবাড়ি, হয়তো সত্যি কথা নয়। কিন্তু আর-এক রকম ব্যবস্থার কথা অনেকেই জানেন। রাজা খুব হুঁসিয়ার দেখে বেছে একজন A. D. C.-কে অতিথির হাওদায় বসিয়ে দেন, আর খুব শক্ত তাকীদ দিয়ে রাখেন, "এঁকে আজকের বাঘটা দেওয়াই চাই, বুঝলি? ওঁর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আওয়াজ করবি, আর বলবি যে তোর গুলি লাগে নেই।" ফলে অতিথির ব্যাঘ্র হনন নির্বিবাদে সমাধা হয়। আরও যে কত রকম ফন্দী আছে বলা শক্ত। পাঠক হয়তো জানেন আমাদের দেশে দাড়ীওয়ালা সিংহ এখন আর নেই। কাঠিয়াবাড়ে গীর জঙ্গলে এক রকম নেড়া সিংহ আছে মাত্র। একবার এক রাজা কোনো মহাপুরুষকে খুসি করবার জন্য লুকিয়ে বারোটা দাড়ীওয়ালা সিংহ আফ্রিকা থেকে আনিয়ে বনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হয়তো সে সময় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল, কিন্তু পরে সব কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। হলেই বা কি! জানেন তো, দুকানকাটা গাঁয়ের

মাঝখান দিয়ে যায়! এ সব কিন্তু sport নয়, sport-এর নামে ধাপ্পাবাজী। তবু জানা ভালো। কুচবেহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কর্জন লাটের একবার বড়ো মনকষাকষি হয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দেশময় ঢি ঢি পড়ে গেছল! মহারাজ লাট সাহেবকে এক রকম তুড়ি দিয়েই বাদশাহের হুকুম নিয়ে অভিষেক উৎসবে বিলেত চলে গেলেন। মেজাজী লাটসাহেব এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। শেষে, ঝগড়াটা যে মিটল, সে শিকারের সাহায্যে। এমন একটা সময় এল যখন ভুটান সংক্রান্ত কিছু কাজে কর্জন সাহেবের মহারাজকে দরকার পড়ল। অন্য কেউ হলে দুচারটে সেলামীর তোপ বাড়িয়ে দিলেই কার্যোদ্ধার হত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লাটসাহেব শিকারের চার ফেললেন। আসামে ধুম করে শিকার-ক্যাম্প ফেললেন, আর মহারাজকে অনুরোধ করলেন তার সম্পূর্ণ ভার নিতে। বহুদিনের মনোমালিন্য দূর হল। আসল কাজের কি হল তা আমার জানা নেই। তবে শিকারের পর আমাদের মহারাজ ভুটানের রাজপ্রতিনিধি থাম্পু জাম্পেনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে গেছলেন, মনে আছে। এটাও মনে আছে যে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বিনা আয়াসে কিছু টাকা ধার পাওয়া গেছল ঐ সময়ে। কর্জন সাহেব রাজকার্যও সম্পন্ন করলেন, বাঘও মারলেন। শিকারের political aspect (রাজনৈতিক উপযোগ) দেখিয়ে এ পর্ব শেষ করলাম।

৫

ইস্কুলের বিদ্যা শেষ করে ১৮৯০ সালে বাগ্দেবীর মন্দির তোরণে ধরনা দিতে কলকাতায় এলাম। পাঠককে গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে বিদ্যা বেশি সঞ্চয় হল না শেষ পর্যন্ত, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল অনেক। যা হোক, আমার সুবুদ্ধি-দুর্বুদ্ধির জন্য বাণীমন্দিরকে দায়ী করলে অন্যায় হবে। মানুষের যে বিষয়সম্পত্তি থাকে, তার কতক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, আর কতক স্বোপার্জিত। আমার কলকাতার কীর্তি সম্পূর্ণ স্বোপার্জিত। একটা কথা হয়তো আগে বলি নেই যে জন্মের সময় সনাতন প্রথামত এক জন্মপত্রিকা তৈয়ার হয়েছিল। তার ফলাফল সম্বন্ধে কখনও কুতূহল হয় নেই, কিন্তু শুনেছি যে মোটামুটি তার ডিক্রী এই রকম যে, বুধ আর বৃহস্পতি আমাকে নিয়ে সারা জীবন টানা-হেঁচড়া করবে। কলকাতায় যে এলাম তার কারণ বুধের চাঞ্চল্য না বৃহস্পতির জ্ঞানপিপাসা, তা আজও ঠিক করতে পারি নেই। যা হোক, ১৮৯০ সালে বাড়ি ছেড়ে এই আমার প্রথম পাড়ি।

কলকাতার ছ বছরের জীবনকে ওয়েসিসের সঙ্গে তুলনা করতে পারলাম না, কারণ আমার বাকী জীবনটা মোটেই মরুভূমি নয়। জীবনটাকে মোটামুটি রসময় বলেই পেয়েছি। রসময় বলতে তো নানা রস বোঝায়, আমার কলকাতার জীবন তারই একটা রকমারী!

খুব সঙ্গোপনে একটা কথা পাঠকের কাছে জানাচ্ছি যে, আমার এই সময়টা সম্বন্ধে নানা মিথ্যা কথা বলতে হবে। তার প্রথম কারণ যে বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই সাংসারিক হিসেবে এত উঁচু জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন যে তাঁদের বাল্যজীবনের কতকটা অলৌকিকত্ব না দেখাতে পারলে সাজন্ত হবে না; কাজেই দরকার হলে দু-চারটে ঘটনা ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বের করব। দ্বিতীয় কারণ, ব্রহ্মচর্য শুরু করতে না করতেই আমার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ঘটল, অর্থাৎ কলেজে পড়তে পড়তেই কলকাতা আমার শ্বশুরবাড়ি হল। এখন আমি যদি বলি কলকাতায় বারো মাস কোকিল ডাকে না, গঙ্গার জল উজান বয় না, ষ্টিমারের বাঁশি ছাড়া কোনো বাঁশি বাজে না, তা হলে কি সেটা ভালো দেখাবে? এই সব পাঁচরকম কারণে আমার জীবনের এই অংশটায় একটু বেশি করে কল্পনার রঙ চড়াতে আমি বাধ্য।

কলেজ খোলবার আগে লম্বা ছুটিটা এবার দেশে কাটিয়েছিলাম। আগে জানিয়েছি যে তখন মনে একটা বেশ বড়ো রকম টিকি গজিয়েছিল। সেই টিকির জন্যই এবার দেশে এই আড়াই মাস কাল এত ভালো লেগেছিল। সব ভালো লেগেছিল, এমন কি গ্রামের দলাদলি পর্যন্ত। গাঁয়ে এক ওলাইচণ্ডীতলা ছিল। সেখানে নানা রকম কাণ্ড হত, যার আজ কোনো অর্থই বুঝতে পারি না। তখন কিন্তু তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্যন্ত জানতাম, আর তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতাম! পূর্বপুরুষদের বসানো ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলোর ক্রিয়াকর্ম খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। ভালোও লাগত। কিন্তু এত সাত্বিকভাব সত্বেও বন্দুকের ঝোঁক ছাড়তে পারি নেই। এক দিন আমরা দু-তিন জন গোটাকয়েক কাঁদাখোঁচা মেরে কাছের এক গ্রামের ভেতর দিয়ে আসছি। দুই বৃদ্ধা জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন, আর-এক জনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা লো?" তিনি চুপি চুপি কি জবাব দিলেন। তখন প্রথম বৃদ্ধা বেশ চেঁচিয়ে বার-দুই বললেন, "দেখ-সে লো দেখ-সে, কালী রায়ের ছেলেগুনো পাখমারা হয়েছে!" আমরা পাখিগুলো সেইখানেই ফেলে দিয়ে মানে মানে চম্পট দিলাম। তামসিক আহারের হাত থেকে সেদিনের মতো নিষ্কৃতি পেলাম। এই এক বার মাত্র ধরা পড়েছিলাম, তা নইলে রায়মহাশয়ের ছেলেদের বিত্তাবুদ্ধির সঙ্গে দেবদ্বিজে ভক্তির অপূর্ব সংযোগ দেখে গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী চমৎকৃত

হয়েছিলেন। ছেলেরা এখন বললে বিশ্বাস করবে না যে পুরো আড়াই মাস সনাতন ধর্মানুমোদিত খাদ্য খেয়েই কাটিয়েছিলাম। কিন্তু বৃথা প্রয়াস! দেশের অবনতি বন্ধ হল না। কয়েক বছর পরে আমার ভ্রাতা যখনই গ্রামে যেতেন তাঁর পাঁউরুটি কেক বাবদ অনেক খরচ হত। হপ্তায় একদিন করে আমাদের গ্রামে হাট বসত। মহা উৎসাহে আমরা দরোয়ানের সঙ্গে তোলা আদায় করতে যেতাম। যতদূর মনে আছে আদায় বেশ জোরেই করতাম। আদায় ব্যাপারটা সনাতন ধর্মসঙ্গত কিনা, তাই আগ্রহের অভাব ছিল না।

একদিন রাজেন্দ্রবাবু নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি আমাদের দূর কুটুম্ব। পরে ফকীর রাজেন্দ্রনাথ ও ধর্মানন্দ মহাভারতী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপে তিনি এক বক্তৃতা দিলেন। দশভুজা মূর্তি আর সন্ধিপূজার বলি সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য ব্যাখ্যা করলেন যে গাঁয়ের লোক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমাদের কিন্তু খুব ভালো লেগেছিল। সনাতন ধর্মের আর বর্তমান বিজ্ঞানের অদ্ভুত সমন্বয়—জগাখিচুড়ী—বলে। তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা আগেই শোনা অভ্যাস ছিল তো!

আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তে ভীষণ বৃষ্টি নামল। দামোদরে বান এল। দেখতে দেখতে চারি দিক জলে জলময় হয়ে গেল। জল মরবার আগেই ছুটি শেষ হল। কিন্তু নিরুপায়, ভেলায় চড়ে তো আর সাগর পার হওয়া যায় না। সে জন্য মনে কিন্তু ক্ষোভ রইল না। আমার কোষ্ঠীর বৃহস্পতির ফলাফল দিনকয়েক মুলতুবী রইল মাত্র। ইতিমধ্যে বুধকে সহায় করে ডিঙিতে আর ভেলাতে চেপে চতুর্দিক তোলপাড় করতে লাগলাম। পাড়াগাঁয়ে ছেলে হলেও দিনে দশবার ঘোলা বেনো জলে ডুব দেওয়া তো অভ্যাস ছিল না! বরদাস্ত হল না। কলকাতায় এসে দশদিন ডাক্তারবাবু কুইনিন হস্তে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করে কোনো রকমে খাড়া করলেন। কুইনিনের প্রভাবে মেঠো রঙটা গেল। একটা কাঞ্চনবর্ণ আভা মুখে দেখা দিলে। তখন সাহস করে শহুরে কলেজে ঢুকতে পারলাম।

যে কেলাসে ঢুকলাম সেটার একমাত্র বর্ণনা হতে পারে—হরিঘোষের গোয়াল। লেকচার হত, কিন্তু শোনা যেত না। দু-একদিনেই বুঝতে পারলাম যে যদি কিছু বিদ্যা শিক্ষা করতে পারি তো সে ওখানে হবে না, অন্যত্র। কিছুদিন পরে কেলাসটি দুভাগ হয়ে গেল। মোটামুটি একটা ভাগে হেয়ার ইস্কুল হিন্দু ইস্কুলের মার্জিতরুচি ছেলেরা গেল, আর অন্যটায় আমরা শ' খানেক জংলি অর্থাৎ বাঙাল, রেঢ়ো ও মুসলমান গেলাম। কিন্তু এই সেক্‌শান্‌ ভাগ হওয়ার আগের একটা ঘটনা বলি।

তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙালি মাস্টার খুব কমই ছিলেন। তাঁদেরই একজনের কেলাসে কার্তিকপূজার দিন টেবিলের উপর ঠাকুর এনে রাখা স্থির হল। আমার অত্যন্ত লজ্জা হওয়া উচিত এ কথা স্বীকার করতে যে আমি ঐ ব্যাপারে সামিল ছিলাম, তবে চুনোপুঁটিস্বরূপ। ধুরন্ধর যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজন আজ নেই, আর-একজন এখন যোগাভ্যাস করেন। মাস্টারমশায় টেবিলাধিষ্ঠিত দেবসেনানীকে দেখে প্রথমটা রেগে কথা কইতে পারলেন না। দুই-এক মিনিট চুপ করে থেকে তার পর বজ্রগম্ভীরস্বরে হাঁকলেন, 'তোমাদের বলে দিচ্ছি যে আমি অপরাধীকে খুঁজে বের করবই, আর রাস্টিকেট করাব।' এই না বলে, তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'তুমি কিছু জান?' আমাদের দিকের প্রায় সত্তর-আশীজন নির্ভীক বীরের মতো বললাম, 'না স্যার, আমরা কিছুই জানি না।' তখন মাস্টারমশাই আমাদের দিকে পেছন করে অন্য দিকের ছেলেদের জিজ্ঞেস-পড়া করতে লাগলেন। তাদেরও কয়েকজন 'না' বলার পরে যার কাছে মাস্টারমশায় পৌঁছলেন তিনি অপেক্ষাকৃত বয়স্থ, মুখে ছোট্ট ছাগল-দাড়ি, ঢাকা জেলায় বাড়ি, ধর্মে ব্রাহ্ম। আমাদের সেকালের ব্রাহ্মরা মিথ্যা কথা কইতেন না। অতএব এই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে, একটু বুক ফুলিয়ে বললেন, 'আমি জানি, স্যার।' বলে, বোধ হয়, নাম প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটল। আমাদের ষড়যন্ত্রের নেতা তাঁর কলমকাটা ছুরির ফলাটা খুলে একটু নাটুকে ভাবে সেটা ছোরার মতো ভাঁজতে লাগলেন। দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি ছুরি দেখবামাত্র মুখব্যাদন করে ধপ্ করে বসে পড়লেন। আর মুখে কথা সরল না। জগতে আবার সত্যের নিগ্রহ, মিথ্যার জয় হল! জলখাবার ঘরের উড়িয়া বেয়ারাটার এক টাকা জরিমানা হল। আমরা সেটা গোপনে দিয়ে দিলাম।

এ-সব গল্পগুলো বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই দেখানো যে ছেলেমানুষ চিরদিনই ছেলেমানুষ। একটা বেপরোয়া ভাব, একটা চাঞ্চল্য, তার নিজস্ব। অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনি যে সেকালে আমরা গোপালের মতন সুবোধ বালক ছিলাম, আর আজকালকার ছোকরারা হয়েছে কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বর্বর। এটা নিছক রূপকথা। গোপালের দল আজও বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমান। তবে তাদের হাতে বঙ্গমাতার দুঃখ কি ঘুচবে? আমার তাতে ঘোর সন্দেহ। মা পথ চেয়ে রয়েছেন লর্ড ক্লাইবের মতন সোনার চাঁদদের জন্য।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকি, তখন আমাদের বড়ো সাহেব ছিলেন খ্যাতনামা মিস্টার টনি। তাঁর ছাত্রেরা শিক্ষক হিসাবে তাঁর খুব তারিফ করতেন।

আমার নিজের তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয় নেই। তবে বড়ো সাহেব বলে সংস্রবে আসতে হয়েছিল বই কি! তিনি আর-পাঁচজন বড়ো সাহেবের মতোই দুরধিগম্য ছিলেন। মোটের উপর কলেজটা বড়ো সাহেব, মেজো সাহেব, ছোটো সাহেব, বড়ো বাবু, মেজোবাবু, ছোটো বাবু—অধিষ্ঠিত একটা প্রকাণ্ড সরকারী আপিসের মতো ছিল। এঁদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক কিছুই ছিল না। টনি মহাশয়কে বার-দুই দেখেছিলাম বলে মনে আছে। একবার যখন আমাদের কেলাসসুদ্ধ বিনা দোষে জরিমানা করতে আসেন, আর-একবার যখন সেই জরিমানা প্রত্যাহার করাবার জন্য তাঁর খাস কামরায় যেতে হয়েছিল। এই সাহেবের শেষ বয়সের কীর্তি যে, তিনি বিলেতে প্রকাশ্য সভায় সমস্ত বাঙালী জাতটাকে মিথ্যাবাদী—monumental liars—বলেছিলেন। কীর্তির্যস্য স জীবতি!

ঢাকার ছেলেদের কাছে ঢাকা কলেজে শিক্ষক-ছাত্রের একসঙ্গে খেলাধুলোর গল্প শুনে আমাদের বিশ্বাস করা শক্ত হত। কারণ, আমাদের খেলার ক্লাবে সাহেব বা বাঙালি অধ্যাপক একদিনও কেউ খেলতে আসেন নেই। কলেজের বাঙালি মাস্টাররা সর্বরকমে ইংরেজদের নকল করতেন। আমাদের সঙ্গে যদি কখনও বারান্দায় লাইব্রেরিতে কথা কইতে হত, তা ইংরেজিতেই কইতেন। ধুতি পরে কোনো অধ্যাপকই আসতেন না—পণ্ডিতমশায়রাও নয়!

এই সূত্রে বেশভূষার কথা একটু বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ধুতির তখন বড়ো দুর্দিন। সাহেবদের অবজ্ঞা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তো ছিলই—তা ছাড়া শহরের নানাস্থানে ধুতি পরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। দুটো-একটা জায়গার নাম করি। ইডেন গার্ডেনের গঙ্গার দিকটায় অনেকখানা জায়গা পাতলুনওয়ালাদের জন্য দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকত। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়ো খেলতে গেলেও ধুতি পরিহিত লোকের অনেক বাধা-বিপত্তি ছিল। আপিস সভা সমিতির তো কথাই নেই! এই-সবে আমাদের নিজেদের মনেও ধারণা জন্মে গেছল যে, কোনোও সভ্যভব্য স্থানে যেতে হলে একটা ইজার চড়ানোই চাই। বিদ্যাসাগরমশায় অবশ্য কখনও ইজার পরেন নেই। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, যিনি সর্বত্র ধুতি পরে ঘুরতেন, তিনিও টাউন হলের সভায় যেতে হলে একটা চাপকান চোগা চড়িয়ে নিতেন। কলেজের ছেলেদের বেশভূষার কথাও একটু বলি। নানা ঢপের পিরান, পাঞ্জাবি ও মের্জাই তখনও সৃষ্টি হয় নেই। আমরা গৃহস্থঘরের ছেলেরা ধুতির সঙ্গে হয় কামিজ পরতাম, নয় খাটো গলাবন্ধ কোর্তা। তবে গায়ে একটা চাদর সর্বদাই থাকত। পায়ে অধিকাংশ ছেলেই ফিতে বাঁধা কালো জুতো পরত। নাগরা হিন্দুস্থানীদের একচেটে ছিল।

আর মাদ্রাজী চটী মাদ্রাজীদের। বড়লোকের মধ্যে বিদ্যাসাগরমশায় পরতেন ঠনঠনের চটি, মহেন্দ্রবাবু পরতেন তালতলা। আমাদের চটি পরে নগর পরিভ্রমণ রেওয়াজ ছিল না। এই তো হল সাধারণ পোশাক। তবে ধনীলোকের ছেলেদের, কি সাহেববাড়ির ছেলেদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। তখন জাতিভেদ প্রবল, আজই না সব একাকার হয়ে গেছে!

কলেজে উঠে প্রথম বছরে বাবার হুকুমে জিনের ইজার ও গলাবন্ধ কোর্তা পরে যেতে হত। অনেকেরই এই সাজ ছিল। তাই বিশেষ খারাপ লাগত না। কিন্তু একদিন এক বিভ্রাট হল। শিয়ালদহ স্টেশনে গেছি ঐ বেশে। গাড়ির অপেক্ষায় প্লাটফর্মে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক সাহেব আমাকে টিকিটবাবু মনে করে ট্রেন সম্বন্ধে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সাহেবকে তো কোনোরকমে ভাগালাম, কিন্তু মনে বড়ো দুঃখ হল! দূর হোক্‌গে, আর ইজার কোর্তা পরব না। তার পরদিন থেকে ধুতি পরে কলেজে যেতে লাগলাম। মা এতে খুশি হলেন বলেই মনে হল। বাবার অনুমতি তিনিই আনিয়ে দিলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল, কিন্তু যখন বি. এ. পাস করলাম তখন দু'তিন জোড়া কোট-প্যাণ্টুলুন সংগ্রহ করতে হল। বড়ো হয়েছি, পাঁচ রকম সভাসমিতি জলসায় যেতে হবে তো। সে কোট-প্যাণ্টুলুন সাজও ছিল অপরূপ! মাথায় গোল টুপি, গায়ে গলাবন্ধ পার্সীকলার খাটো কোর্তা ও ফতুই। ভেতরে বিলেতি কামিজ, তার ছাতি তক্তার মতন শক্ত! ইজারটা পুরোপুরি ইংরেজি ফেশানের। আমার কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ। এত সাধের সভ্য কাপড় পরেও একদিন এমন বিপদে পড়লাম যে, বিলেত রওনা হওয়া পর্যন্ত বাকি কটা দিন ধুতি পরেই কাটিয়ে দিতে হল। ব্যাপারটা বলি। মিসেস বেসাণ্টের তখন খুব নাম-ডাক। তিনি কলকাতায় এলেন বক্তৃতা করতে। টাউন হলে প্রকাণ্ড সভা জমল। আমি আমার 'মিটিংকা কাপড়া' পরে গিয়ে একেবারে সামনের সারে জাঁকিয়ে বসলাম। বক্তৃতা চলল। বক্তা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। টাউন হল্ ভরা জনতা একেবারে নিস্তব্ধ। এমন সময়, হঠাৎ মনে হল, বক্তা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে খুব জোরে বলছেন, 'And you there in your English costume let me tell you, that behind your starched shirt front there beats a Hindu heart!' 'আর, তুমি বিলেতি সাজে সজ্জিত বাবু, তোমাকে আমি বলি যে, তোমার ঐ বর্মের মতো কঠিন কামিজের বুকের ভেতর যে হৃদয় লুকানো আছে, সেটা হিন্দুর হৃদয়!'

আশেপাশে সকলের নজর আমার উপর পড়ল। আমার Hindu heart (হিন্দু-

হৃদয়) এমন হুড় হুড় করে উঠল, যে আমি চুপি চুপি হল্ থেকে বেরিয়ে একেবারে বাড়ি পালালাম। ইজার কোর্তা পরা ঘুচল কিছুদিনের মতো।

আবার কলেজের কথা বলি। আমাদের রসায়নের থিয়েটার ছিল একটা আলাদা একতলা বাড়িতে। ঘণ্টা পড়লেই, সেই দিকে শ খানেক ছেলে ঠেলাঠেলি করে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানো আমাদের একটা নিত্যকর্ম ছিল। ফার্স্ট ইয়ারে একদিন এই ঘোড়দৌড়ে আমি ফার্স্ট হয়ে কি গোল বাধিয়েছিলাম, শুনুন। থিয়েটারে উঠতে হত পেছনে সরু এক কাঠের গোল সিঁড়ি দিয়ে। আমি সেই সিঁড়ি বেয়ে দুড় দুড় করে যেই উপরে উঠেছি, দেখি যে তখনও সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস চলছে। ডাক্তার রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেলাস নিচ্ছেন। আমায় দেখেই সেকেণ্ড ইয়ারের একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে খুব থিয়েটারি ঢঙে হাত নেড়ে বলে উঠলেন 'ভগ্নদূত! কহ শুনি লঙ্কার সমাচার।' চারি দিকে হাসির রোল উঠল। আমি হুড়মুড় করে আমার পিছনের ছেলেদের ঘাড়ে পড়লাম। এই ভদ্রলোক পরে একজন পেশাদার অভিনেতা হয়ে খুব নাম কিনেছিলেন। অনেক বছর বাদে একবার 'চোখের বালি' নাটক দেখতে গিয়ে তাঁকে হঠাৎ 'বিহারী'র ভূমিকায় দেখে এই পুরোনো গল্প মনে পড়ে গেছল। ফলে প্রায় দশ মিনিট হাসি থামাতে পারি নেই। সঙ্গীদের অনেক করে বোঝাতে হয়েছিল যে রবিবাবুর 'বিহারী' চরিত্রে হাস্যাস্পদ কিছু নেই।

ডাক্তার রায়ের কথা বলতে বলতে মনে পড়ছে যে propagandist zeal (প্রচারকার্যে উৎসাহ) সেকালেও তাঁর বড়ো কম ছিল না। তবে তখনও তিনি দেশসুদ্ধ লোককে বৈশ্যধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা আরম্ভ করেন নেই। উৎসাহ বেশি ছিল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে। রসায়নের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে সংস্কার-রস আবিষ্কার করতেন, আর আমাদের সেই রস বিতরণ করতেন। দুয়েকটা নমুনা দেব। অঙ্গার (carbon)সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় আমাদের শেখালেন 'অঙ্গার পরমাণুর চার হাত, তোমাদের বিষ্ণুর মতো।' সাবান তৈরি করা দেখিয়ে আমাদের গ্যালারির দিকে ফিরে হাসি-মুখে বললেন, 'এরই নাম সাবান, সেই মহামূল্য জিনিস যা মেথরকে ব্রাহ্মণ করতে পারে।' আশ্চর্য রূপক! তবে হিন্দু ছাত্রের কেলাসে ব্রাহ্ম অধ্যাপকের এমনতর কথা না বলাই বোধ হয় সুশোভন হত আমাদের কেউ কেউ এ কথা তাঁর কাছে নিবেদনও করেছিলেন। আচার্যদেব পরম পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে এ গল্প করা হয়তো অমার্জনীয়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এই দেখানো যে হিন্দু আজও যেমন, তখনও তেমন 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'। নইলে,

আচার্যদেব সেই অল্প বয়সেও দানশীল ও উন্নতমনা ছিলেন। কলেজের বাহিরে ছাত্র-সমাজের উপর তাঁর অসীম দয়া ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথা ছিল ছাত্রদের তৃণজ্ঞান করা। তিনিও কলেজের চৌহদ্দির ভেতর তা ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নেই।

কিছুদিনের জন্য বুথ সাহেব বলে আমাদের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এসেছিলেন। তিনি বিশালকায় জোয়ান ছিলেন ও খুব ভালো ক্রিকেট খেলতেন। তবে আমাদের সঙ্গে কখনো খেলেনও নেই, আমাদের কোনোদিন খেলতে শেখানোও নেই। তাঁর একটা গল্প মনে হচ্ছে, গল্পটার সঙ্গে টনি সাহেবের বাক্য— 'monumental liars'এর কিছু যোগ আছে। একদিন আমাদের কোনো সহপাঠী গ্রন্থাগারে এক আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের বই দেখছিলেন। হঠাৎ বুথ সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বন্ধু তাঁকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু সরলেন না। সাহেব তাঁর পেছনে পা ফাঁক করে কলোসাসের মতন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর পর রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ডাফ্‌টারী, ডাফ্‌টারী, নিকাল দেও।" দপ্তরী আমাদের নিয়মিত বখশিশ-ভুক্ প্রাণী, সে শ্যাম রাখি কুল রাখি ভাবে বন্ধুকে সরে যেতে মিনতি করলে। বন্ধু সরে গেলেন, কিন্তু বাহিরে এসে তাঁর ভেতরকার সুপ্ত সিংহ জেগে উঠল। বড়ো সাহেবের কাছে দরখাস্ত করলেন যে তাঁর ইজ্জতে বিষম ঘা লেগেছে। তখন বড়ো সাহেব ছিলেন সর্বজনপ্রিয় গ্রিফিথস সাহেব। তিনি বুথ সাহেবের কৈফিয়ৎ চাইলেন। সাহেব বললেন, তিনি বাবুকে কিছুই বলেন নেই, নিকলের (Nicoll) একখানা বই দপ্তরীর কাছে চেয়েছিলেন মাত্র। এ কৈফিয়তের টীকা অনাবশ্যক।

কিছুদিন টনি সাহেবের কথাগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরত। একদিন রো সাহেবের কেলাসে কয়েকজন ছাত্র একসঙ্গে দুমদাম করে বই বন্ধ করাতে সাহেব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে করেছে?' কেউ যখন কবুল করলে না, তখন তিনি এক গাল হেসে বললেন 'Oh! You monumental liars!' এমন মধুর হেসে কথাটা বললেন যে, কেউ রাগ করলে না। আর ভেবে দেখলে, এ কথা বলতে মেকলে থেকে কর্জন পর্যন্ত কোন্ সাহেবই বা কসুর করেছেন! এই রো সাহেব ব্যবহারে বড়ো অমায়িক ছিলেন। মাঝে মাঝে কেলাসে বাংলা কথারও বুকনি দিতেন। প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি হলে সাক্ষীগোপাল, বিধুমুখী ইত্যাদি নানা নাম ধরে ডাকতেন। কেলাসে যে-সব হাসি-তামাশা করতেন, তা কখনো কখনো আদিরসাশ্রিত হয়ে পড়ত। এক-আধটা উদাহরণ না দিলে হয়তো কেউ বিশ্বাস করবেন না। একদিন কেলাসে জিজ্ঞেস করলেন যে গ্রীক পুরাণের Graces কজন? উত্তর হল, চার জন। সাহেব হেসে বললেন, 'চতুর্থাটিকে হাজির করতে

পারো হে? তাঁরা বেশ সাজ-গোজ করেন।" ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই গ্রীক দেবীরা তিন জন, এবং তাঁদের মূর্তি দিগম্বরী। আর একদিন নানারকম Knight-দের কথা বলতে বলতে হঠাৎ মেয়েদের Garter সম্বন্ধে যে রসালো টিপ্পনি কাটলেন, তা আমার পাঠিকাদের ভয়ে এখানে ব্যক্ত করতে পারলাম না। একদিন এই সাহেব হাসিঠাট্টার মাত্রা একটু বেশি চড়িয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু অন্য রকমে। ফলে মুসলমানরা (আমরাও পিছনে ছিলাম) তাঁকে মাপ চাইয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু তিনি মাপ চেয়েছিলেন যে ভাষায়, সে অতি অপরূপ। 'আমার কোনো পোষা জন্তুকে আমি যা-কিছু নাম দিতে পারি। তোমরা মূর্খ, ইংরেজি বোঝ না।'

রো সাহেবের নাম করলেই ওয়েব সাহেবের নাম মনে পড়ে। এই দুই সাহিত্যরথী, শুধু কলেজ কেন, সমগ্র বাংলাদেশকে ইংরেজি শেখাবার ভার মাথায় করে নিয়েছিলেন। গালাগালও খেয়েছিলেন অনেক। তাঁদের সে বই আজ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছে, অন্যত্র আর বড়ো দেখা যায় না। এ ছাড়া ওয়েব সাহেব নেটিবদিকে ইংরেজি আদব-কায়দা শেখাবার মতলবে আর-এক বই লিখেছিলেন। একসময় সরকারের সকল বাঙালি কর্মচারীর টেবিলেই সে বই দেখা যেত। আমি ওয়েব সাহেবের কাছে কখনও পড়ি নেই কিন্তু তাঁর আদব-কায়দা সম্বন্ধে জ্ঞান কি রকম ছিল, তার নমুনা পাঠককে একটা দেব। আমি বছর-দুই Dr. Atkinson বলে এক সাহেবের কাছে পড়তে যেতাম। সাহেব এক বড়ো ইংরেজি কলেজের কর্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে তিনি এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যেন এটা ভারত নয়, যেন আমি বিলেতের ছাত্র। একদিন পড়ার সময় তিনি বললেন, 'আজ আমাদের চা খাওয়া এখানে নয়, ওয়েব সাহেবের বাড়িতে। তাঁকে চেন তো?' আমি জানালাম, 'চিনি, যে রকম প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক-ছাত্রের পরিচয় হয়ে থাকে।' যথাসময় ওয়েব সাহেবের ওখানে দুজনে চা খেতে গেলাম। সাহেব আমাকে সমস্ত সময়টা Baboo, Baboo, করে কথা কইতে লাগলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার ভাত ও নেটিব তরকারির অভাবে চা খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না তো! আমার তখন সব কথা বোঝবার হয়তো ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু Dr. Atkinson নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, কেননা তিনি বেরিয়ে যাবার সময় আমায় বললেন, 'I am sorry I brought you here, lad' (তোমাকে এখানে না আনলেই ভালো হত)। নিজের কলেজের নিন্দা আর কত করব! এম. এ. কেলাসে অবস্থার অনেক উন্নতি হল। হতে পারে আমরা বড়ো হয়েছি বলে, হতে পারে আবহাওয়া বদলাচ্ছিল বলে। নিন্দা তো অনেক করলাম, কিন্তু

দুজন অধ্যাপক, যাঁরা অন্ততঃ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাঁদেরও নাম করব, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও অধ্যাপক পেডলার। যত দূর মনে আছে, এই দুজনকে সকলেই ভালোবাসত। প্রেসিডেন্সি কলেজের দমবন্ধ করা হাওয়াতে না থাকতে হলে এঁদের গুণ আরও ফুটে বেরোত।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সভা সমিতি ও খেলার ক্লাবের কথা পরে বলব। আমাদের সময়েই এখনকার Institute, Higher Training Society নাম নিয়ে আরম্ভ হল। তার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন আমাদের অধ্যাপক উইলসন। আমার নিজের ঘটনাচক্রে higher training (উচ্চশিক্ষা) হল না। সোসাইটির ঘরে তাস খেলা সঙ্গত কি না এই নিয়ে সাহেবের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে আমাদিকে সোসাইটি ত্যাগ করে অন্যত্র তাসের আড্ডা জমাতে হল। এই তাসের আড্ডার মেম্বার কেউ কেউ এখন ভারতের ভাগ্যবিধাতার মধ্যে গণ্য। তাঁদের নাম করলে রসভঙ্গ হবে।

এই সময়েই কলেজের Speech Day (বাৎসরিক উৎসব) শুরু হল। প্রথম উৎসবে Julius Cæsar-এর হত্যাকাণ্ড ও Merchant of Venice-এর আদালতের দৃশ্য অভিনয় হল অধ্যাপক উইলসন সাহেব ও Oxford Mission-এর ডগলাস সাহেব আমাদের শিক্ষক ছিলেন। অভিনয় ভালোই হল, অন্ততঃ লাট সাহেব এলিয়ট তাই বলে গেলেন। একটা মজার কথা কেবল মনে হয় যে, সেদিন Cæsar-কে যাঁরা খুন করলেন, তাঁরা অনেকেই আজ নিজেরা উচ্চ মসনদে অধিষ্ঠিত। আর যিনি Portia হয়েছিলেন তিনি আদালতকে বহুদূরে ঠেলে রেখে আজ সরকারের আবকারী মালের হেপাজৎ করছেন। একমাত্র Antony তাঁর থিয়েটারের পার্ট কায়েম রেখেছেন। প্রিয়দর্শন Brutus-কে খুনে আসামী সেজে যা দেখিয়েছিল, জজ সেজে তার চেয়ে অনেক ভালো দেখায়।

এলিয়ট সাহেবের নাম করতে মনে পড়ে গেল যে তিনি একসময় বাঙলাদেশে ধুম ধড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রদেশে জুরীর বিচার তুলে দেওয়ার জন্য হঠাৎ কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। কিন্তু এমন বিষম হৈ চৈ বাধল, যে কিছু করে উঠতে পারলেন না। এই সিভিলিয়ান লাটসাহেব শুধু যে দেশী লোকদের উত্যক্ত করেছিলেন তা নয়, ইংরেজ বড়ো হাকিমদেরও প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। এক গল্প আছে যে, একবার তিনি ষ্টিমারে সফরে বেরিয়ে ষ্টিমার খুব দূরে নোঙর করে ডিঙি বেয়ে পাবনার সদরে উপস্থিত হলেন, আর সোজা স্থানীয় হাকিমদের কাছারীতে চলে গেলেন। বড়ো হাকিম তখনও আসেন নেই, যদিও ১১টা বেজে গেছল।

লাটসাহেব তাঁকে ডাকিয়ে এনে খুব ধমকে দিলেন, মাস্টার যেমন ইস্কুলের ছেলেকে ধমকায়। কখন কাকে অপদস্থ হতে হবে এই ভয়ে কিছুদিন হাকিমবর্গ সন্ত্রস্ত থাকতেন।

একবার এলিয়ট সাহেব কুচবেহারে এসেছিলেন। দেশী রাজ্যে লাটেরা যান প্রধানতঃ শিকার ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারের জন্য। কিন্তু এই সময়ে মহারাজের নিজের ও রাজ্যের অনেক খরচ বেড়ে গিয়েছিল বলে কিঞ্চিৎ ধমকে দেওয়াও বোধ হয় এলিয়ট সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। এই সাহেবের বাঁধা বুলি ছিল, 'আমি জাঁকজমক আড়ম্বর দেখতে পারি না, আমি চাই কাজ।' এঁর গুণাগুণ সম্বন্ধে বাবা সবই শুনেছিলেন আগে, প্রধানতঃ সেক্রেটারি মহল থেকেই। তাই তিনি মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে রেখেছিলেন যে দেখাবেন, কুচবেহারেও তাঁরা efficiencyর উপাসক— কাজের লোক। স্থির হল মহারাজ স্টেট-কর্মচারীদের নিয়ে রাজবাড়িতেই লাটসাহেবকে স্বাগত করবেন। আর বাবা তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন ১২ কোশ দূরে, যেখানে সীমান্তে রেল থামে। যথা সময় ট্রেন এল। স্টেশনে বাবা একজন মাত্র চাপরাসী নিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং খাকি চাপকান পরে বগলে এক সাদা ছাতা নিয়ে, আর চাপরাসী এক আধময়লা পট্টুর কোট পরে ধুতির উপর পট্টি বেঁধে। লাটসাহেব অযথা জাঁকজমকের জন্য কাউকে না ধমকাতে পেয়ে বোধ হয় একটু নিরাশ হলেন। তখন প্রায় দশটা। বাহিরে দুই হাতি তৈয়ার ছিল। বাবা সাহেবকে অভিবাদনাদি করে বললেন যে, তিনি যদি শ্রান্ত না হয়ে গিয়ে থাকেন তো ধরলা নদীর চর ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন, যেখানে যেখানে দুই রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলছে। সাহেব তাঁর অদম্য উৎসাহ নিয়ে সব চরগুলো দেখে বারোটার সময় ওপারে ডাকবাংলায় পৌছলেন। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন হল। আড়ম্বর কিছু ছিল না। একজন মাত্র খানসামা খাবার পরিবেশন করলে। তার পর বাবা একটুক্ষণ মধ্যাহ্ন বিশ্রামের কথা তোলাতে সাহেব বললেন, 'না, ও সব কুঁড়েমি আমার নেই। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।' বাবা বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে তো পথে আপনাকে চওড়াহাট বন্দর দেখিয়ে নিয়ে যাব, যেখানে রেলী, আপকার, এদের বড়ো বড়ো পাটের আড়ত আছে।' লাটসাহেব তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন।

চওড়াহাট ইত্যাদি দেখে যখন রাজধানীর প্রান্তে পৌছলেন তখন চারটে বেজে গেছে। সেখানে তোরসা নদীর পারঘাটে জজী ও পুলিস কর্তারা সাহেব বাহাদুরকে সেলামি দিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন বালক রাজকুমার ও একজন A. D. C.

(মহারাজের পার্শ্বচর)। আবার দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর, সোজা রাজবাড়ি যাবেন, না পথে সেপাইদের ও সওয়ারদের লাইন (Lines) দেখে যাবেন? সাহেবের কর্মপিপাসা তখনও নিবৃত্ত হয় নেই। বললেন যে পথে যা দ্রষ্টব্য আছে, সব দেখে যাবেন। কাজ শেষ করে পাঁচটায় রাজবাড়ি পৌছলেন। নেমেই মহারাজকে বললেন, 'আপনার রাজ্যের চমৎকার বন্দোবস্ত। সর্বত্র নিয়মিত কাজকর্মের হাওয়া।' মহারাজ জানতেন, একটু হাসলেন। যে দু তিন দিন এলিয়ট সাহেব কুচবেহারে রইলেন, এই একইভাবে এঁরা তাঁকে ঘোরালেন। ধুমধামও নিতান্ত মামুলী রকমের বেশি হল না। সাহেব এত আনন্দে সময় কাটালেন যে খরচপত্রের জন্য টীকা টিপ্পনী কিছু আর করলেন না। ফেরবার আগে সাহেবের একজন কর্মচারী মহারাজকে বলে এল, 'আপনার দেওয়ানের এলিয়টের চেয়েও বেশি এলিয়টি চাল।' সেবার দার্জিলিঙে একাধিক সিবিলিয়ান মহারাজকে খুব তারিফ করেছিলেন এই বলে যে, 'তোমরা দেশী রাজ্যে জান, কাকে কি রকমে জব্দ করতে হয়।' এলিয়ট সাহেব নিজে দার্জিলিঙে বাবাকে ডেকে বললেন যে নূতন বছরে তাঁকে রাজা খেতাব দেবেন। বাবা নিজের দারিদ্র্য উল্লেখ করে কোনো রকমে পার পেলেন, বটে! কিন্তু বর্তমান লেখকের কুমারবাহাদুর হওয়াটা মিছেমিছি ফসকে গেল।

৬

এই এলিয়ট সাহেব গৌণভাবে আমার অদৃষ্টচক্র ফিরিয়েছিলেন, তাই তাঁকে আমার এত ভালো করে মনে আছে। গল্পটা উল্লেখযোগ্য শুধু এই দেখাবার জন্য যে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা আতঙ্ক ছিল যে আমাকে একদিন ভারত-শাসনের ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা হবে। উঠতে বসতে এই কথা আমায় শুনতে হত। কিন্তু কলেজে ঢোকার পর পাঁচরকম কারণে আশা হচ্ছিল যে হয়তো শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি পাব। ইতিমধ্যে লাট-বাহাদুরের কুচবেহারে শুভাগমন হল, রাজ্যের কর্তাদের কারদানির জন্য সাহেব তুষ্টও হলেন। পিতাঠাকুর পাকা রাজনীতিবিৎ ছিলেন। রাজ্য চালনার প্রধান নীতি হচ্ছে এই যে লেন-দেনের হিসাব ঠিক থাকবে, অর্থাৎ অপর পক্ষ ফাঁকি দিয়ে কিছু মেরে না নেয়, সেইটে দেখতে হবে। কুচবেহার কর্তৃপক্ষের সেবার চেষ্টা হল যে এত কষ্ট ও খরচ যখন করা গেছে, তখন কিছু সুবিধা করে নিতে হবে। এই রাজ্যে

একটা গোলমাল বহুদিন থেকে চলে আসছিল। অমাত্য দুই জন ছিলেন। একজন আমার বাবা, অন্যজন এক সাহেব। এই dyarchyর দরুন স্টেটের অনর্থক অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে যেত। যখন এলিয়ট সাহেব বাবাকে পুরস্কৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন বাবা স্টেটের এই দুঃখের কথা তুললেন, 'কাজ দুজনের মতো যখন নেই, তখন আমাদের একজনকে সরিয়ে দেবার অনুমতি করুন।' খানিকক্ষণ আলোচনার পর সাহেব বললেন—'নেটিব রাজ্যে একজন নেটিব দেওয়ান চাই। কাজেই তোমার যাওয়া হতে পারে না। তুমি যদি সিবিলিয়ান হতে, তা হলে না হয় সাহেবকে সরিয়ে নিয়ে তোমার একার উপর সব ভার দেওয়া যেত। কিন্তু তা যখন নয়, তখন হিন্দুস্থান সরকার কিছুতেই রাজী হবেন না।' তার পর খুব সৌজন্য করে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছেলে সার্বিসে ঢুকছে, না?' বাবা কলকাতায় এসে আমায় আদেশ করলেন যে সিবিলিয়ান আমায় হতেই হবে। ফলে, ইস্পাতের ফ্রেমে একখণ্ড কর্কের ছিপি বসানোর ব্যবস্থা হল। ফ্রেমের দুর্দৈব!

ছিপিরও গ্রহের ফের। কোথায় ঘরের কোণে বোতলে আঁটা পড়ে থাকবে, তা না এক প্রকাণ্ড কারখানার স্টিল ফ্রেমের ওজন পড়ল তার ঘাড়ের উপর। কর্কের তৈরি বলেই পিষে গুঁড়ো হয়ে যায় নেই। বহুদিন থেকেই ফ্রেমের জন্য এদেশী পেরেক সংগ্রহ হচ্ছিল। ইস্পাত না হলেও কাঁচা লোহার পেরেক অনেক মিলছিল। কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যে লাটের নিরর্থক সৌজন্যের ফলে একটা কর্কের ছিপিকে সেই কাজে লাগান হল, তাঁকে আমি অভিনন্দন না করে থাকি কি করে? তাঁর বিদ্যার কথা জানি না, তবে তাঁর কীর্তিকে অঘটনঘটনপটীয়সী বললে দোষ কি?

আমার ছেলেবেলার শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলেছি। মন্ত্রীপুত্রের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নই স্বাভাবিক। সে স্বপ্ন অনেক দেখতাম। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে হাকিম হওয়ার উচ্চাশা কখনও হয় নেই, যদিচ আমাকে ক্রমাগত লোভ দেখানো হত যে নেটিব সিবিলিয়ান তো এইবার কমিশনার হয়েছে, আর দু-পাঁচ বছরে লাটও হবে। লাট হওয়ার লোভ কিছুতেই হত না। ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রাধান্য তখন সবে একশ বছরের। তাই তার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার উৎসাহ ছিল না। বরং খুব ইচ্ছা হত যে একটা দেশী রাজ্য হাতে নিয়ে গড়ে তুলি। কে জানে, ভবিষ্যতে কি সুযোগ হবে! এদেশের পাঁচ হাজার বছরের বিচিত্র ইতিহাসে আশ্চর্য আশ্চর্য উত্থান ও পতন তো কত শত হয়ে গেছে! চাকরী সম্বন্ধে আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ দেখি নেই। প্রথম বয়সে মাত্র একজন বড়ো

চাকরী নিয়েছিলেন। অধিকাংশের নজর সে দিকে ছিল না। আজ যে তাঁরা অনেকেই বর্তমান ভারতের টোডরমল মানসিংহের পদে অধিষ্ঠিত সে কেবল দেশের হাওয়া বদলেছে বলে, সরকার দেশের লোককে শাসনকার্যে সহায় হতে ডেকেছেন বলে।

আমাদের এক Bohemian Society, ভবঘুরে সমিতি ছিল। তার বৈঠক বসত প্রধানত বন্ধুবর প—র গোয়াবাগানের বাসায়। সেখানে কর্তৃপক্ষের উপদ্রব ছিল না। এক পণ্ডিতমশায় ছিলেন। তিনি চমৎকার লোক। আমাদিকে সর্বদা ভূরিভোজনে তৃপ্ত রাখতেন। আমাদের সমিতির সাধারণ কার্যক্রম ছিল তাসখেলা ও জলযোগ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে প্রোগ্রামও বিশিষ্ট রকমের হত। 'গোড়ায় গলদ' পাঠ ও অভিনয় আমাদের খুব প্রিয় জিনিস ছিল। দুয়েকবার Variety Programmeএর মতো হয়েছিল। কমিটি ঠিক করতেন কে কি অভিনয় করবে। অভিনেতাদের পারদর্শিতার দিকে কমিটির ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আদেশ অনুসারে কেউ বা বাংলা গান করতেন, কেউ ইংরেজি সংগীত চর্চা করতেন, কেউ বা তিব্বতী ভাষায় অভিনয় করতেন। সব কথা এখন মনে নেই, তবে ভূ— এমন সরসভাবে 'আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে' আবৃত্তি করেছিলেন যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সকলেই তখন নববিবাহিত। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি অল্প বিস্তর সবাইকেই করতে হত। তবু এমনটি কখনও শুনি নেই। আমাদের ডাক্তার বন্ধু এক ইংরেজি গান করলেন। এ বিষয়ে সেই দিন তাঁর হাতে-খড়ি হল। পরে বিলেতে কতবার শুনেছি, স্নান করতে করতে তিনি খুব জোর ইংরেজি গান গাইছেন। আমার অদৃষ্টে পড়েছিল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধের প্রায় সবটাই কড়ি ও কোমল, মানসী, ও সোনার তরী হতে চুরি। কিন্তু বিষয়-মাহাত্ম্য এমনই জিনিস, যে মণ্ডলীর সকলেরই বেশ ভালো লেগেছিল, অর্থাৎ আমাকে কেউ বই বা দোয়াত ছুঁড়ে মারেন নেই।

আমাদের কলেজের ক'বছর রবীন্দ্রনাথ ছাত্রমহলে খুব দেখা দিতেন। তিনি নানাস্থানে প্রবন্ধপাঠ করতেন। আমরা দল বেঁধে যেতাম, আর পাঠ হয়ে গেলেই 'গান, গান' করে চীৎকার করতাম। এই-সব সভাতেই 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না', 'আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও' ইত্যাদি গান প্রথম বের হয়। কবিবর তখন আমাদের রবিবাবু ছিলেন। কর্তারা তাঁকে নেকনজরে দেখতেন না। অনেক বাড়িতে তাঁরা বলতেন যে রবিঠাকুর বড়ো মানুষের ছেলে,

কাজ নেই কর্ম নেই, বসে বসে ছেলে বখাচ্ছে। যখন এ-সব ব্যাপারের হিসেব-নিকেশ হবে, তখন হয়তো দেখা যাবে যে, প্রথম বঙ্কিম, তার পর কবি, সত্যই তিনপুরুষ বখিয়েছেন। খুব ভালোই করেছেন, কেননা সুবোধ বালকের দৌরাত্ম্য বড়ো বেশি হয়েছিল।

একটা বিষয়ে আমার কবিবরের বিরুদ্ধে নালিশ আছে। অত বড়ো লোককে যখন কাঠগড়ায় খাড়া করছি, তখন আমার কেসটা খুলে বলা দরকার। বালিকাবধূর সঙ্গে প্রেমচর্চাকে তিনি ঠাট্টা করেছিলেন, সেজন্য আমাদের কারও মনে ব্যথা লেগেছিল, এ আমি শুনি নেই! বরং কেউ কেউ সেই কবিতা থেকেই লাইন তুলে প্রেমপত্রে নিজের বলে চালিয়ে দিতেন। কিন্তু তখনকার দিনে ফিরিঙ্গিরা যে পথেঘাটে দুর্বল লোককে নির্যাতন করত সে বিষয়ে কবি কোনো কথা লিখলেন না। কিন্তু কোথায় কোন্ জায়গায় একবার দুচারজন কাপুরুষ ছেলে মুক্তিফৌজের সাহেবকে মেরেছিল তাই উপলক্ষ করে লম্বা কবিতা বের হল। এ জিনিসটা তখনও একচোখোপনা মনে হত, এখনও হয়।

ফিরিঙ্গিরা কিংবা গোরা সেপাইরা সেকালে লোকের সঙ্গে যে কি ব্যবহার করত, তা হয়তো একটু বয়স্থ লোক সকলেরই জানা আছে। আমাদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সত্য, কিন্তু এতে যে রাজার গৌরব হানি হয়! তবু, কর্জন সাহেবের আগে কোনো লাট গোরাদের জুলুমের প্রতিবিধান করতে সাহস করেন নেই। আজ এ অত্যাচার খুব কমে গেছে। হয়তো লোকেও আর বরদাস্ত করবে না, সরকারও করবেন না। কিন্তু আমি যখন চল্লিশ বছর আগের কথা লিখতে বসেছি, তখন আমার এ-সব অপ্রিয় কথা না লিখেও উপায় নেই। অপ্রিয়, কেননা নিজেদেরই বদনাম। অপমান হজম করাতে তো কোনো গৌরবই নেই। আমি বড়ো বড়ো ব্যাপারের, অর্থাৎ খুন-খারাবীর কথা প্রত্যক্ষ কিছু জানি না। সে সম্বন্ধে কিছু বলছিও না। তবে আমাদের যে কারণে দলবদ্ধ হয়ে ময়দানে চলতে ফিরতে হত, সেটা একালের ছেলেদের জানা ভালো। ছেলেবেলায় ইংরেজদের সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে তারা ন্যায়যুদ্ধ ছাড়া অন্যায়যুদ্ধ জানে না। হয়তো ভদ্রবংশীয় ইংরেজ সম্বন্ধে এটা সত্যি, কিন্তু আমাদের আমলে গোরা সেপাই কি মেটে সাহেব যে ন্যায়যুদ্ধের উপাসক ছিল না, তার প্রমাণ খুব সুলভ।

একদিন আমরা জনাতিনেক ওয়েলিংটন স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল স্কোয়ারের ভেতর হাল্লা। দূর থেকে দেখি, তিন-চারজন ইংরেজি কাপড়-পরা লোক একটি বাঙালির ছেলেকে মারছে, লোক জমে গেছে প্রায় বিশ-

পঁচিশ জন। আমরা নির্বিরোধী লোক। শুধু দেখবার জন্য বেড়া ডিঙিয়ে সেই দিকে দৌড়লাম। ততক্ষণে পেণ্টুলুন-পরা লোকগুলো গলিতে ঢুকে দৌড়ে পালাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি একটি বছর চোদ্দর ছেলে জখম হয়ে ভুঁইয়ে পড়ে। আর পাশে একটা হোঁৎকা গোছের লোক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, বর্ণনা করছে কি হয়েছিল। তার মাথায় খুব ঢেউ খেলানো তেড়ী, গায়ে জালের গেঞ্জি, পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি। বক্তৃতা শেষ করে সে খুব জোরে নিজের বুক চাপড়ে দু-তিনবার বললে, 'ধিক্! বাঙালির জীবনে ধিক্!' আগেই বলেছি আমরা ছিলাম নিরীহ লোক। মাথা হেঁট করে চলে গেলাম। সে লোকটাকেও পিটিয়ে দিতে পারলাম না। শত ধিক্!

আর-এক দিন গড়ের মাঠে খেলা ভাঙবার পর আমরা কয়েকজন ফিরছি, এমন সময় দেখি যে এক বাঙালি ছাত্রকে দুটো ফিরিঙ্গি দাঁড়িয়ে খুব ঘুষো লাথি মারছে। পাশে আরও দু-তিনজন ফিরিঙ্গি দাঁড়িয়ে স্বজাতিকে সাবাশ দিচ্ছে। আমাদের দল নেহাৎ ছোটো ছিল না। দু-একজনের হাতে বংশদণ্ডও ছিল। তৎক্ষণাৎ আমরা চারি দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম আর ফিরিঙ্গিদের বললাম, 'এ চলবে না হে! একজন একজন লড়াই কর।' তাই করতে হল। বাঙালিটি বাহাদুর ছেলে ছিল। খুব ঠুকলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। শেষ তার বুকে বসে মাপ চাইয়ে ছাড়লে। এ পর্যন্ত নালিশ করবার মতো কিছু ঘটে নেই। কিন্তু ফেরবার পথে মনুমেণ্টের কাছে আবার ছেলেটিকে কজন ফিরিঙ্গি ঘিরে দাঁড়াল। বোধ হল, সেই প্রথম দলই। ভাগ্যিস আমরা পিছনেই ছিলাম। আমরা হুঙ্কার ছাড়তেই তারা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিলে।

আমার নিজের কখনও রণে ভঙ্গ দিতে হয় নেই। ধাক্কাধুক্কি যা খেয়েছি এক-আধবার, সে অতি সামান্য ব্যাপার। তা সে ঋণও গায় রাখি নেই। তবে এক বার passive resistance করতে হয়েছিল। ঘটনাটা গল্প হিসাবে মন্দ নয়। আগেই বলেছি, মাঠে আমরা বড়ো একটা একা একা ঘুরতাম না। একদিন ডালহৌসির মাঠে খুব বড়ো খেলা ছিল। কথা ছিল আমরা সকলে ক্লাব থেকে যাব। কিন্তু আমি যখন পৌঁছলাম, তখন একটু দেরি হয়েছে। সকলে চলে গেছে। ইতস্ততঃ করছি এমন সময় রাস্তার ওপারের মাদ্রাসা ক্লাবের ছেলেরা বললে, 'চলো বাবু, ম্যাচ দেখতে যাবে না?' গেলাম তাদের সঙ্গে। তখনকার দিনে পয়সা দিয়ে ম্যাচ দেখবার রেওয়াজ বড়ো একটা ছিল না। মাঠের তিনদিক খোলা থাকত। একটা জায়গা বেছে আমরা চারজন সামনে দাঁড়ালাম। খানিক পরে

পেছনে বিজাতীয় আওয়াজে চীৎকার শোনা গেল, 'Make room, হট্ যাও।' হঠাৎ আমার মাথার উপরে এক বেতের ঘা পড়ল। বেতটা হেঁচকা মেরে টেনে নিয়ে দূরে ফেলে দিলাম। ফিরে দেখি, Buff পলটনের জনা পঁচিশেক বীর যোদ্ধা বেগে লোক সরিয়ে দিচ্ছে। অবহেলে সরিয়ে দিলে। যতক্ষণে তারা দুই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ততক্ষণ আমার মাদ্রাসার সঙ্গীরা অন্তর্ধান হয়েছেন। আমি একা পড়লাম সেই সেপাইদলের লাইনের সামনে। অবস্থা সঙ্গীন। এক মুহূর্ত ভাবলাম মার খাব, না সরে পড়ব! তার পর মনে হল, সরে তো পড়ছিই আজ কত শো বছর, না হয় আজ মারই খাই। কে জানে হয়তো কুঁড়েমি ধরল, কে আবার সরে! ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম যে আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলে ঠেলে মাঠের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তখন আমিও, 'একা কুম্ভ,' পেছনে ঠেলতে আরম্ভ করলাম। গ্রাম্য ইংরেজিতে নানা রকম শ্লীল অশ্লীল ঠাট্টা তামাশা কানে আসতে লাগল। দু-একটা গাঁট্টাও মাথায় খেলাম। আমার পেছন দিকে ঠেলা কিন্তু বন্ধ হল না। ইতিমধ্যে একজন linesman 'পিছে, পিছে, হট্ যাও' বলতে বলতে নিশান হাতে এসে পড়ল। সেও Buff সেপাই। হয়তো সাঙ্গাতদের সঙ্গে তার চোখে চোখে কিছু ইশারাও হয়ে থাকবে। যাই হোক, লোকটা যেই আমাকে 'পিছে, বাবু' বলে ঠেলা মারলে, অমনি পশ্চাতের দুজন সেপাই ফাঁক হয়ে গেল। ফলে আমার দেহের উপরটা পেছনে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু আমি আগে থেকেই গোড়ালি কাদায় গেড়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিলাম, তাই পড়ে গেলাম না। তখন সেই অবস্থায় আমাকে সেপাই দুটো টিপে ধরলে। আমি দুই কনুই দিয়ে তাদের পাঁজরার উপর passive resistance বার দুই চালাতেই তারা কোঁক করে আবার ফাঁক হয়ে পড়ল। সুবিধা পেয়ে আমি পিছিয়ে তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলুম। ততক্ষণে খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার খেলা দেখবার মতন অবস্থা ছিল না। পিছন থেকে লাথি, গাঁট্টা, ধাক্কা ক্রমাগত খাচ্ছিলাম। বিপদে পড়ে আমিও যে চাঁট দু-চারটে মারি নেই, তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি জবাব দিচ্ছিলাম মোটামুটি দুধারের পাঁজরার উপরে। একটা কথা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে কোনো পক্ষেই ক্রোধের উদ্রেক হয় নেই। তারা যা করছিল অভ্যাস দোষে, আমি যা করছিলাম ভয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট এই রকম ধস্তাধস্তি চলল। আর বেশিক্ষণ চলে না। আমার সর্বাঙ্গ ব্যথা করছে। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, 'Let him be, Jim' (ছেড়ে দে, জিম)। এতক্ষণ আমার মুখ দিয়ে ভালো মন্দ একটি কথাও বার হয় নেই। এখন ফিরে বললাম, 'Thank you'। আমার ডান পাশের

সেপাইটি আমার সামনে সিগারেট কেস খুলে ধরে বললে, 'You are a plucky lad'। আমি তাকে জানালাম যে আমার প্রায় হয়ে এসেছে। সে আমায় ভুঁইয়ে বসবার জায়গা করে দিয়ে বললে, 'আমার পাঁজরাগুলো তোমায় সহজে ভুলবে না।' আরাম করে ম্যাচ দেখে টলতে টলতে বাড়ি ফিরলাম।

কোনো রকম জাতিবিদ্বেষ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। জাতিবিদ্বেষ সকল অবস্থাতেই ঘৃণ্য জিনিস। তা ছাড়া সেকালের যা সমস্যা ছিল, আজকের সমস্যা তা নয়। সুতরাং আমার গল্প থেকে আজকের দিনে প্রযোজ্য কোনো নীতি কেউ টেনে বের করলে আমার উপর অবিচার হবে। যে কালের কথা আমি বলছি তখন ব্যায়াম চর্চার দরকার ছেলেদের মনে খুব জেগে উঠেছে। ইতিপূর্বেই শোভাবাজার ক্লাব ফুটবলে, আর টাউন ক্লাব ক্রিকেটে অনেকটা এগিয়ে গেছল। আমাদের সময়ে প্রথমে মোহনবাগান, পরে ন্যাশনাল ফুটবল খেলতে নামল। বুট পরে খেলা চলে গেল প্রধানতঃ ন্যাশনালের উদাহরণে। নন্দলাল শুধু-পায়ে shinguard-পরা দু-চারটে পা ভাঙার পর ভয়ও ভাঙতে লাগল। ক্রমে বাঙালির একটা নিজস্ব খেলার ধারা তৈরি হয়ে উঠল। শোভাবাজারের right wing, বড়োবাবু, অবশ্য চিরকালই শুধু-পায়ে খেলতেন। ক্রিকেটে বাঙালি কখনও বিশেষ-কিছু করতে পারলে না। তবু ঢাকার সুধন্বা, বাখড়ার খেলা যা ছিল, টাউন ক্লাবের কুলদারঞ্জন, শিবপুরের প্রমদারঞ্জন ও বিশপস্ কলেজের শ্রীশ দে তার চেয়ে অনেক উন্নতি করে গেলেন। যতীনবাবুর (বাখড়ার) বিখ্যাত সেকেলে underhand (তিনি বলতেন, ছেঁচড়া) bowling প্রমদারঞ্জনের scientific bowling-এর সঙ্গে তুলনাই হতে পারে না। ক্রিকেট খেলায় একটা নীরব সাধনার দরকার। হয়তো সেটা বাঙালি প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ফুটবলে কিন্তু যে গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো বোধ হয়, বাঙালির অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। উপরন্তু ফুটবল-প্রীতির আর একটা কারণও দেখা যেত। আমাদের অত্যন্ত লোভনীয় জিনিস ছিল কেল্লার গোরাদের সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষ, বলপরীক্ষা। এই কেল্লার গোরা আমাদের চোখে ছিল মূর্তিমান পশুবল। এদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি না হলে নিজেদের পশুবলের উৎকর্ষ সাধন কি করে হবে। এমনও দেখেছি যে ম্যাচের পর খেলোয়াড়রা বসে বসে হিসেব করছে কে কটা গোড়াকে আছাড় দিয়েছে। যেন সেটা গোল দেওয়ার চেয়েও দরকারী জিনিস। শোভাবাজারের ব্যাক কালী মুখুয্যে দর্শকের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন প্রধানতঃ মানুষ ঘায়েল করতে পারতেন বলে। বাঙালির ঘুষো খেলা তখন সবে শুরু হয়েছে। তবু ওটা যে কলকাতার নিত্য জীবনে বড়ো প্রয়োজনীয় জিনিস, তা সকলেই

বুঝত। শেখার সুযোগের অভাব ছিল। যারা খুব উৎসাহী তারা অনেক পয়সা গুঁজে কেল্লায় শিখে আসত। পাঠককে একটা বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া দরকার যে বর্তমান লেখক সব খেলা খেললেও নিতান্তই হাতুড়ে চিরদিন।

আমি যে বছর কলেজে ঢুকলাম, তখন পর্যন্ত কলেজ-ক্লাব ছিল না। ক্রমশঃ সেটা গড়ে উঠল। কিন্তু আমাদের পৃষ্ঠপোষকের এত অভাব ছিল যে, আমরা অনেক চেষ্টা করেও ক্লাবটাকে জমকাল করতে পারি নেই। খেলা সম্বন্ধে প্রেরণা সংগ্রহ করে আনতে হত অন্য বড়ো বড়ো ক্লাব থেকে। যাই হোক, ক্রমশঃ আমাদের নিজস্ব খেলার দল খাড়া হল, দু-চারটে ম্যাচও খেলা হতে লাগল। ফুটবলের রঙিন জামা তৈরি হল। এখন দেখতে পাই আমাদের অত সাধের গোলাপী ও নীল রঙের বদলে কলেজ টীম এখন একটা নিতান্ত prosaic নীল রঙের জামা পরেন। রঙিন জামা পরে প্রথম ম্যাচটা আমার বেশ মনে আছে। আমি ব্যাকে খেলছিলুম। হঠাৎ এক ষাঁড় দূর থেকে জামার ঝক্‌ঝকে গোলাপি রঙ দেখে আমাকে শিঙে চড়াবার মৎলব করে চড়াও হয়ে এল। আমার নজর ছিল বলের দিকে। গোলকীপার তাড়াতাড়ি গোলের ডাণ্ডাটা খুলে নিয়ে ষাঁড়কে মেরে আমায় রক্ষা করলেন। কাজটা নিতান্ত সহজ ছিল না। কথায় বলে, red rag to a bull।

আমাদের বড়োসাহেব পয়সার বেশ সুবিধা করে দিয়েছিলেন। প্রথম কড়া নিয়ম জারি হল যে বিকেলে সবাইকে কসরতের আখড়ায় হাজিরা দিতেই হবে। তার পর হুকুম হল যারা ক্লাবে খেলবে, তাদের কসরৎ না করলেও চলবে। শতকরা আশী জনের অঙ্গ-সঞ্চালন করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, কি ক্লাবে, কি আখড়ায়। কিন্তু তাদের ক্লাবে ঢোকার পথ আমরা বেশ সুগম করে দিলাম। ফটকের কাছে খাতা হাতে ধরণা দেওয়া নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়ালো। এইরকম করে আমাদের যত টাকা সংগ্রহ হত, বড়ো সাহেব সরকার থেকে আবার তত টাকা মঞ্জুর করতেন। এত সুবিধা না করে দিলে ক্লাবটি আঁতুড়েই মারা যেত। গ্রিফিথস সাহেব আমাদের সুখ দুঃখ বুঝতেন বলেই তাঁকে আমরা ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম। ছেলেপিলে তো একটু স্বার্থপর হয়েই থাকে।

এই ফুটবলের নেশা কিন্তু সবাই ভালো চোখে দেখতেন না। একদল কর্তা-ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা বলতেন হাডুডু কপাটি গুলি-ডাণ্ডাই বাঙালির পক্ষে প্রশস্ত, বিদেশী খেলায় তার কিসের দরকার। আর একদল আবার এঁদের চেয়েও গোঁড়া। তাঁদের মতে আড্ডা মাত্রই ছাত্রদের পক্ষে খারাপ, তা সে তাসের আড্ডাই হোক, আর ব্যায়ামের আড্ডাই হোক। ও-সব স্থানে গেলে ছেলেরা সিগারেট খেতে এবং

শা— বলে গালাগাল দিতে শেখে। এই মর্মে একবার একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ-সব কুসংস্কার যাঁরা ভেঙে দিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান আমার বন্ধুরা। ভূ— মালকোঁচা মেরে ফুটবলেও যেতেন, পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হতেন। পরের জীবনে চাকুরে মানুষের কাম্যলোকে উঠেও তার মোহনবাগান-প্রীতি মন্দা হয় নেই। সুহৃদ ন—রও ঐ দশা। তাঁকে আদালত ছাড়া কোনো ব্যাপারে পাওয়া কত কঠিন, তা সবাই জানেন। অথচ ক্রিকেট, ফুটবল, কি সাঁতারের স্থানে দরকার হলে অ্যাটর্নি ফিরিয়ে দিয়েও তিনি সেখানে হাজির হন। আবার আমার মতো মানুষও ছিল, যারা খেলার হুজুগে পরীক্ষা ভাসিয়ে দিলে, আর বুড়ো বয়স পর্যন্ত খেলা খেলা করেই কাটিয়ে দিলে। মোটের উপর আমাদের মধ্যে দেহচর্চার (দেহতত্ত্বের নয়) হাওয়াটা জোর বয়েছিল। তবে আমাদের হাত-পা ছোঁড়াই সার হল, সাফল্য পেলে পরবর্তী ছেলেরা।

কলেজে একটা Debating society ছিল যেখানে নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক হত। আমাদের দলের কেউ সেখানে বিশেষ নাম করেছিলেন ব'লে মনে নেই। এটা আশ্চর্য, কেননা আমাদের অনেকেই পরের জীবনে হাইকোর্টে বক্তৃতা করে যেমন জজকে তেমনি মক্কেলকে অক্লেশে ঘায়েল করেছেন। তবে স্বীকার করতে হয় যে এক প্র— ছাড়া রাজনৈতিক সভায় কেউ সুবিধা করতে পারেন নেই। আমাদের ঠিক আগের দলের সুরেন মল্লিক, নীরদ চাটুজ্যে প্রভৃতি বেশ ভালো বক্তা ছিলেন। এই তর্ক-সভার কর্তা ছিলেন উইলসন সাহেব। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম আমাদের সঙ্গে খুব মিশতেন। আমাদেরও তাঁকে বেশ ভালো লাগত। কিন্তু কি হল কে জানে, আস্তে আস্তে ছেলেরা তাঁর উপর নারাজ হয়ে গেল। শেষ একদিন হল কি, তিনি হোস্টেলে যে ঘরে ঢুকতে লাগলেন, ছেলেরা জাত যাবে বলে তাদের জলের কুঁজো ফেলে দিতে লাগল। এই নিয়ে একটু গোলযোগও হয়েছিল। একদিন আমাদের সভায় হিন্দুর বিলেত-যাওয়া সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হচ্ছিল। আমি, হিন্দুর বিলেত গেলে জাত যায়, এই মর্মে আমার সাধ্যমত একটা ছোটোখাটো বক্তৃতা করলাম। উইলসন সাহেব সভাপতি ছিলেন। সভার পরে তিনি বাইরে এসে মহা গরম হয়ে আমাকে বললেন, "তোমরা সবাই hypocrite, মনে এক, মুখে এক। তুমি নিজে বছরখানেক বাদে বিলেতে যাবে, অথচ আজ সভায় বললে, বিলেত যাওয়া উচিত নয়। সেদিন হোস্টেলের ছেলেরা হঠাৎ এমনি হিন্দু হয়ে উঠল যে আমি ঘরে ঢুকতেই তাদের জল নষ্ট হয়ে গেল!" আমি নিবেদন করলাম, "সার্, হোস্টেলের কথা আমি জানি না, আমি সেখানে

থাকি না। কিন্তু তর্ক-সভায় তর্কের খাতিরে মানুষ যা বলে, সেটা তার যথার্থ মত বলে তো কেউ ধরে না!" তাতেও সাহেব ঠাণ্ডা হলেন না। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের অঙ্কের অধ্যাপক লিটল্ সাহেব। তাঁর বদ-মেজাজী বলে খ্যাতি ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের অন্তর বড়ো ভালো ছিল। তিনি উইলসনকে একটু চেঁচিয়েই বললেন, "এ তুমি কিরকম কথা কইছ? আমাদের কেম্‌ব্রিজ, অক্‌সফোর্ডে কি হয়? ইউনিয়ানের সভায় যার যেদিক ইচ্ছা তর্কের সময় তো সেই দিক নেয়।" তখন আমিও সুবিধা পেয়ে উইলসন সাহেবকে বললাম, "মশায়, আর-এক কথা, আপনি জাত তুলে গালাগাল দেন কেন? যা বলবেন আমাকে বলুন, তোমরা তোমরা করেন কিসের জন্য?" লিটল্ সাহেব হেসে বললেন, "খুব ঠিক কথা। সেদিন আমি এই ছোকরাকে দুষ্টুমি করার জন্য ধরেছিলাম। ওর বাঁদরামীর জন্ত সমস্ত বাঙালি জাতিকে বাঁদর বললে অবশ্য দোষ হবে।" আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ বা গবেষণার কোনো বিশেষ সুবিধা ছিল না। আমরা এম. এ. ক্লাসে এক বৈজ্ঞানিক সমিতি স্থাপন করেছিলাম। সেখানে অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপক বিজ্ঞান-বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান, তাঁরাও নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়তেন।

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় আমি ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম। সেইজন্য বি. এ. পাস হওয়া পর্যন্ত কোনো বাংলা থিয়েটার দেখার অনুমতি পাই নেই। বাইনাচ দেখা তো ইহজীবনে হল না! কিন্তু দুবার বিলেত থেকে ইংরেজি কোম্পানি এসেছিল শেক্সপীয়ারের নাটক প্রয়োগ করে দেখাতে। একবার Milne, আর-এক বার Potter-Bellew। সে অভিনয় আমরা অনেকবারই দেখেছিলাম। বাড়ি ও কলেজ দু জায়গা থেকেই, শুধু অনুমতি নয়, আদেশ পেয়েছিলাম। এই-সব কোম্পানির অভিনেত্রীরা সাধুচরিত্র, এদের দেখলে দোষ নেই, এই বোধ হয় অভিভাবকদের সংস্কার ছিল। এ সংস্কারটা যে নেহাৎ কুসংস্কার, তা অনেক পরে জানলাম। কিন্তু যেদিন আমরা হ্যামলেট দেখতে প্রথম যাচ্ছি, আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যারে, তবে যে তোদের থিয়েটার দেখা বারণ!" আমি তখন উত্তর দিলাম, "সে বাংলা থিয়েটার, মা।" মা বললেন, "কে জানে, বাবু! বাংলা ইংরেজিতে কী এসে যায়?" মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে অনেক logical, ন্যায়সঙ্গত, হয়ে থাকে। তখন, খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, এই ইংরেজি অভিনেত্রীদিগকে বিলেতেই এত নীচ জাতি মনে করত যে, মরে গেলে গির্জায় সাধারণ কবরস্থানে এদিকে মাটি দেবার হুকুম

ছিল না। মোট কথা, আমাদের সময়ে কলকাতা সমাজে একটা শুচিবাই বেশ প্রবল ছিল।

রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা একটু বলি। কলকাতার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৮৯০ সালে। লর্ড রিপনের রাজত্বের ও ইলবার্ট বিলের জের তখনও চলছে। ছোটো জাতের সাহেবদের যে নেটিব বিদ্বেষের কথা বলেছি, সেটা এরই ফল। কারণ, সিপাহী-বিদ্রোহ তখন বহু পুরাতন ব্যাপার! বছর পাঁচ-ছয় আগে বড়োলাটের শুভ আশীর্বাদ নিয়ে কংগ্রেস-মহাসভার বোধন হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর মতো দুয়েকজন নামকাটা সেপাইয়ের দৌলতে উক্ত মহাসভা সরকারের চক্ষুঃশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিনা কারণে, কেননা কংগ্রেসের কর্তারা নিরীহ জীব ছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! ১৮৯০ সালে Consent Bill-এর দরুন যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, সেটা কতকটা অন্য ধরণের। তার মূলে একটা দুর্দম জাতিবিদ্বেষ ছিল। সরকারও সেটা বুঝতেন। তাই বঙ্গবাসীর দলকে ধরে রাজদ্রোহের জন্য সাজা দিলেন। আমার দুজন সহপাঠী কলকাতা কংগ্রেসে সেবক হয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মে ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁরা কলেজে বেশ প্রকাশ্যভাবে বঙ্গবাসীওয়ালাদের নিগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করতেন। কলকাতার বাঙালি-সমাজ তখন, বঙ্গবাসীর দল আর সঞ্জীবনীর দল, এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আর এঁদের পরস্পরের বিদ্বেষের দরুন কলকাতায় প্রায় সকল কাজই পণ্ড হত। এই ঝগড়ার বিষ কলেজে মেসে অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। বেনেটোলার এক মেসে দোলের দিন মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতনী আর হিউগেনোদের অনেক কাটাকাটি হয়ে যাওয়ার পরে যেমন এক পলিতিক-দল উঠে আস্তে আস্তে দুরকমেরই গোঁড়াদের হটিয়ে দিলে, আমাদের কলকাতাতেও তেমনি এক পলিতিক-দল হিতবাদী কাগজ বের করলেন। তাঁরা অবতীর্ণ হলেন দুই গোঁড়া দলকেই "হিতং মনোহারিচ দুর্লভং বচঃ" শোনাবার জন্যে। ক্রমে এই পলিতিক-দলই বাংলার আকাশ ছেয়ে ফেললে। তাঁদের সামনে গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ দুই রণে ভঙ্গ দিলেন। অবশ্য তাঁরা তখন আর হিতবাদীর দল রইলেন না, কারণ হিতবাদীও প্রথম দুই-একজন সম্পাদকের পরেই সনাতনীর ধ্বজা উড়ালেন। যাকে বিপ্লবপন্থী বলা যায়, এরকম কেউ আমাদের সময় ছিল না। যারা ইংরেজকে শত্রু ভাবত, তারাও ভিক্টোরিয়াকে মহারানী বলে মানত। এটা খুব স্পষ্ট বোঝা গেছল কয়েক বৎসর পরে। মহারানীর মৃত্যু হলে গড়ের মাঠে যে অপরূপ দৃশ্য সে সময় এক দিন

দেখা গেছল, তার একমাত্র মানে এই হতে পারে যে জনসাধারণ রানী ভিক্টোরিয়াকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। সেই দৃশ্য দেখেই তো লাট কার্জন বলেছিলেন, "If it is real, what does it mean?" ১৮৯৫ সালে ইংলিশম্যান কাগজে এক উড়ো চিঠি, A Rampant Epistle, নামে ছাপা হয়। সে চিঠির লেখককে ধরলে দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩এ ধারা অনুসারে সাজা দেওয়া চলত। কিন্তু একটা ভাববার কথা হচ্ছে এই যে তাতে সম্পাদকের জাতভাইদিকে বলা হয়েছিল, "তোমরা সরে পড়ো। আমরা মহারানীর নামে এ দেশ শাসন করব।" অর্থাৎ এ শ্রেণীর পাগলাদের মনেও তখন ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করবার ভাব আসে নেই। চিঠিখানা নিতান্ত নগণ্য, তবে ইংলিশম্যান তার খুব সদ্ব্যবহার বছরখানেক ধরে করেছিলেন! আর দেশী কাগজওয়ালারা সেটাকে ইংলিশম্যান আফিসের জাল বলে ধরে নিয়েছিলেন। কেননা ওরকম সংযত পাগলামীও তাদের কল্পনার বাহিরের জিনিস ছিল। চিঠিটা জাল নয়, কারণ তার খসড়া আমি দেখেছি। পাঠকের মনে একটা ধারণা করে দিতে চেষ্টা করলাম যে আমাদের ছাত্র-জীবনের রাজনৈতিক হাওয়া মৃদুমন্দ গতিতেই বইত। ভিক্টোরীয় যুগের ভব্যতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় নেই। কে জানে, হয়তো সে হাওয়াকে সময় থাকতে গম ভাঙার কি জল তোলবার কাজে জুড়ে দিলে, আজ ইউরোপের ঝঞ্ঝাবায়ু এসে এ দেশকে বিধ্বস্ত করত না।

রাজনীতিচর্চা আমার অধিকারের বহির্ভূত। মাঝে মাঝে লোভে পড়ে গণ্ডী পার হয়ে যাই, পরে পস্তাতে হয়। এইবেলা আর-একটা গল্প জুড়ে দেওয়াই ভালো। আমরা কলেজে থাকতে বোডিসিয়া বলে এক রণতরী গঙ্গার ঘাটে এসে লাগল। পেছনে পেছনে এল একটি ছবির মতন সুন্দর টরপিডো বোট, নাম মারাথন। এই দুই জাহাজের মাল্লারা শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। ধবধবে সাদা কাপড়, হাসিমুখ, হেলেদুলে চলন দেখে আমি তো মুগ্ধ হয়ে যেতাম! মনে হত এই-সব লোক নিয়েই, বোধ হয় বোডিসিয়া একদিন রোমানদের হায়রান করে তুলেছিলেন, এরাই হয়তো মারাথনে ইরানের দুর্ধর্ষ বাদশাহকে হটিয়ে দিয়েছিল। একদিন এদের মাত্র দুজন আমাদের চুনাগলির পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশ জন মেটে সাহেবকে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিলে। আমাদের বাড়ির পাশে এক চেলাকাঠের দোকান ছিল। সেইখান থেকে ক্ষেপনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে শত্রুদের উপর বর্ষণ করতে লাগল। সে কি সুন্দর দৃশ্য! যুদ্ধজয়ের পর কাঠের দোকানে গিয়ে, আবার একটা দশ টাকার নোট খেসারত দিয়ে গেল। আমি স্থির করলাম এরা সাহেবের সেরা, এদের সঙ্গে আলাপ করতেই

হবে। পরদিন দুজন মারাথনের মাল্লাকে ধরলাম ইডেন গার্ডেনে। বসে বসে তারা আমাদের সঙ্গে কত গল্প করলে। তাদের মাল্লার জীবন কি সুন্দর, আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে। আমরা ধরলাম, "চলো, তোমাদের জাহাজ দেখাও। আমরা টরপিডো বোট কখনও দেখি নেই।" একজন বললে, "আজ নয়, কাল এসো। জাহাজে উঠে আমাদের ডাক দিও। আমার নাম বার্বার, ওর নাম উড। মনে থাকবে তো? Barber is one who shaves, and Wood is something you can't shave with।"

পরদিন গেলাম। বড়ো জাহাজটা তো বেশ দেখা হল। কিন্তু মারাথনের সামনে যে গোরাটা পাহারা দিচ্ছিল, সে ঢুকতে দিলে না। অনেক কাকুতি মিনতি করলাম, কত ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকটা থোট ছাড়লে না, "No orders।" ইতিমধ্যে খুব জরিঝব্বা পরা এক বড়ো সাহেব বোর্ডিসিঁয়া থেকে বেরিয়ে এলেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি স্বয়ং নৌ-বহরের অধিনায়ক। তাঁর কাছে নালিশ করলাম। তিনি গোরাটার সঙ্গে কথা কয়ে এসে খুব ভদ্রভাবে বললেন, "তোমরা নেটিব কাপড় পরে এসেছ, তাই ঢুকতে দিচ্ছে না। ও কেল্লার গোরা, ওর উপর আমার কোনো অধিকার নেই। I am sorry, boys!" তবু দাঁড়িয়ে রইলাম জাহাজের দিকে হাঁ করে চেয়ে। সাহেবদের মজলিসে আমাদের কত হোমরা-চোমরা কর্তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তীর্থের কাকের মতন, আমাদের কিসের লজ্জা! আমরা পরে এসেছিলাম গরম ইজার, আর সার্জের গলাবন্ধ কোট, অর্থাৎ আমাদের অফিসকা কাপড়া। তাকে বললে কিনা নেটিব ড্রেস! হঠাৎ দেখি দুই বন্ধু বেরিয়ে আসছেন মারাথন থেকে। তাঁদের আমাদেরই মতন পোশাক, শুধু মাথার উপর, আমরা যাকে monkey cap বলতাম, সেই জিনিস। তাড়াতাড়ি তাঁদের শিরস্ত্রাণ চেয়ে নিয়ে আমরা মাথায় দিলাম। গোরাটা হেসে বললে, "এই তো এইবার বেশ সাহেবী কাপড় হয়েছে, চলে যাও ভেতরে!" ভেতরে গিয়ে আমাদের সেই দুই বন্ধুর সন্ধান করলাম। তারা এক গাল হেসে উঠে এল, ঘুরে ঘুরে সব আমাদের দেখালে। চা খাওয়ালে, সিগারেট দিলে পর্যন্ত। আসবার সময় আমার ভাই দুটো টাকা তাদের দিতে গেল, কিন্তু তারা কিছুতেই নিলে না। বললে, "We don't rob boys!" পরের জীবনেও মানোয়ারী গোরাদের সঙ্গে যখনই আলাপ হয়েছে বড়ো আনন্দ পেয়েছি। একেবারে ছোটো ছেলের মতো প্রকৃতি। গল্পটা থেকে পোশাকের মাহাত্ম্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হল তো? আমার তো হয়েছিল। ঘটনাটা আমার স্মরণীয় কেননা জীবনে সেই প্রথম ইউরোপীয়ান ড্রেস পরা। একবার কাশী বেড়াতে

গেছলাম। সেখানেও এই পোশাক-বিভ্রাট ঘটেছিল। ব্যাস-কাশীতে রামনগরে কাশী-নরেশের কেল্লা। সে কেল্লার অনেক স্তুতিবাদ শুনে দেখতে গেলাম। কিন্তু ফটকে সান্ত্রীরা আটকে দিলে। বললে, "নাঙ্গা শির অন্দর যানে কা হুকুম নেহি।" তাড়াতাড়ি মলমলের টুপি কিনে আনিয়ে মাথায় দিয়ে কেল্লা দেখা হল। বাঙালির মাথাকে এত ভয় কেন সকলের!

১৮৯৫ সালে রাজদরবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। মহারাজের হুকুম এল যে আমি বড়ো হয়েছি, এবার আমাকে যথারীতি তাঁর দরবারী হতে হবে। কুচবেহার গেলাম। আবার পোশাক-বিভ্রাট। আমার সেই বিখ্যাত সার্জের গলাবন্ধ কোর্তা এখানে চলল না। চুড়িদার পায়জামা ও আংরাখা পরে, মাথায় মুরেঠা বেঁধে দরবারে হাঁটু গেড়ে বসলাম। যখন ডাক পড়ল, তিনবার কুর্নিশ করে রাজসিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আতর-মাখা রুমালের উপর এক আশরফি রেখে মহারাজের সামনে ধরলাম। তিনি ঈষৎ হেসে আমার নজর স্পর্শ করলেন। আবার কুর্নিশ করে পিছু হেঁটে নেমে এলাম। রোমান্টিক প্রকৃতি হওয়ার অনেক জ্বালা! নিজের আসনে বসে একটু ক্ষণ চোখ ঢেকে রইলাম। সব যেন বেঠিক হয়ে গেছে। কোথায় রয়েছি, এ কোন শতাব্দী, কে রাজা, কে আমি? চকিতের মতো মনে হল যেন আমার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। তবে স্বপন আর কতক্ষণ থাকে!

কলকাতার অনেক কথাই আমার বলা হল না। প্রথম যখন আসি, তখন খুব কম লোকের সঙ্গেই পরিচয় ছিল।' যে কজনকে চিনতাম তাঁরা আমাদের আত্মীয়, আমাদের জেলার লোক। তাঁদের মধ্যে প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশবাবু ও ক্ষুদিরামবাবু। দুজনেই অধ্যাপক ছিলেন, আর দুজনেই জানতেন যে ছেলেপিলের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, পুরোমাত্রায় কি করে আদায় করতে হয়! সকলের হেনস্তার জিনিস ধুতিকে যাঁরা আজ সম্মানের পদবীতে তুলেছেন গিরিশবাবু তাঁদের মধ্যে প্রধান। সেকালের বিলেত-ফেরত, কিন্তু ফিরে এসে অবধি একদিনও ইজার পরেন নেই। অথচ তাঁর অতি বড়ো শত্রুও তাঁকে কোনোদিন নড়বড়ে ঢিলেঢালা মানুষ বলতে পারে না। ক্ষুদিরামবাবু নামে হিন্দু হলেও প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম, যাঁরা কখনও খোসামোদ করতেন না, মিথ্যা কথা, মিথ্যাচার জানতেন না। এ দুজনের কাছে ছাত্রজীবনে অনেক আশীর্বাদ, অনেক শিক্ষা পেয়েছি।

আমার বিবাহসূত্রে শহরের অনেক বনেদী ঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা হল। একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। সেকালের কলকাতার exquisites, সেকালের কাপ্তান, আজ আর নেই। একদিন তাঁদের কথা বলব। হয়তো এক

ফোঁটা চোখের জলও ফেলব। তাতে পাঠক যদি আমায় ধাষ্টামো বলেন, তা হলেও রাগ করব না।

আমার ছাত্রজীবনের যথার্থ গুরুর নাম এইবার করব। তাঁর কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখতে পেরেছিলাম বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু আরও অনেক জিনিস শিখেছিলাম, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের বাইরে। তাঁর নাম বললে অনেকেই চিনবেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন বিলেতে পাস করি তিনি লিখেছিলেন, "এ তো আমার গুরুদক্ষিণা হল না, বাবাজী! সেটা বাকি রইল, ভুলো না।"

আমার বিদ্যার্জন-নামক প্রহসনের খুঁটিনাটি চেপে যাওয়াই ভালো। কোনোরকমে বি. এ. পরীক্ষার মোহনা পার হয়ে গেলাম, কিন্তু Post-Graduate নদী প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গেই নৌকা বানচাল! বন্ধুরা সকলেই বিজয়পতাকা উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে, জীবন-সংগ্রামে যাত্রা করলেন। আমাকে নিয়ে আমার কর্তৃপক্ষ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেকালে যদি কোনো ছোটো ছেলের কোথাও লেখাপড়ায় মনোযোগ না হত, তাকে কটন ইস্কুলে পাঠানো হত, যদি- না সে নিজের বুদ্ধির জোরে সরকারী reformatoryতে ঢুকে পড়তে পারত। তেমনি একটু বয়স্থ ছেলেদের চালিয়ে দেওয়া হত বিলেতে, কেননা সেখানে তখনকার দিনে বিনা শ্রমে বিনা আয়াসে ব্যারিস্টার হয়ে আসা যেত। আমার সার্বিস পরীক্ষা পার হওয়া সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান হলেন। কিন্তু তাঁদের আশা, পাস হয়ে যায় ভালোই, নইলে ব্যারিস্টার তো হবে! এ দিকে আমি প্রাণপণ টানাটানি করছিলাম যাতে বিলেত না যেতে হয়। শেষে একদিন শুনলাম যে বিলেত যদি না যাই, তো ডেপুটিকলেক্টর হতে হবে। হাকিমি আমার অদৃষ্টে বাজছে। ভাবলাম, তাই যদি হয় তো তপ্ত বালির পূজা কেন করি, দীপ্ত সূর্যের উপাসনা করা যাক। বাবাকে জানালাম যে আমি বিলেত যেতে রাজি আছি। এর ভেতর আর-একটা কথা ছিল, সেটাও প্রকাশ করি। ব্রেজিলের সেনানী সুরেশবাবুর নাম সকলেই শুনেছেন। তাঁকে আমি খান-দুই চিঠি লিখেছিলাম আমাকে সেই দেশে একটা গতি করে দিতে। মনে করলাম, বিলেত থেকে ব্রেজিল যাওয়া সোজা হবে। কিন্তু অদৃষ্ট কি এড়ানো যায়? আমি ছমাস কাল bar-এ জমা দেওয়ার টাকাটা ধরে রাখলাম। শেষে শুনলাম সুরেশবাবু মারা গেছেন। সেপাইগিরি অদৃষ্টে নেই, হবে কোথা থেকে? এত কথা তো আর কলকাতায় থাকতে জানতাম না। কাজেই শ্বেতদ্বীপে পাড়ি জমাবার জোগাড়যন্ত্র করতে লেগে গেলাম।

৭

ছেলেবেলায় ভূত প্রেত দানা দক্ষ যক্ষ রক্ষ, এর কোনো কিছুই মানতে শিখি নেই। জুজু নামক একটা জীবের নামও লোকজন আমাদের কাছে করতে পেত না। আষাঢ়ে গল্প নানা রকমের শুনতাম বটে, কিন্তু সে-সব গল্প সত্য নয় জেনেই শুনতাম। এই তো গেল শৈশবের কথা। তার পর ইস্কুল কলেজে বছর পনেরো ধরে শিখলাম যে ইংরাজেরা এ দেশে যে নবীন চিন্তার ধারা এনেছেন, তাতে সংস্কার, বিশ্বাস, এ-সবের স্থান নেই; যুক্তিদ্বারা যা সিদ্ধ হয়, একমাত্র তাই মেনে নেওয়া যেতে পারে, বাকি সব বাতিল। এও মাথা পেতে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন বিষম সমস্যায় পড়েছি। সাহেবেরা যে এত দিন ধরে হাইড্রোজেন অক্সিজেন ইত্যাদি নানা শ্রুতিমধুর নাম দিয়ে গণ্ডাবিশেক বিভিন্ন গোত্রীয় পরমাণুর অবতারণা করে আমাদের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছিলেন সে তো শুনতে পাই আজ রদ্দী হয়ে গেছে। আবার নাকি মান্ধাতার আমলের সেই এক অদ্বিতীয় পরমাণুর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার পর, ইথার। বিদ্যার্জনের সময়েই ঐ অদৃশ্য অস্পৃশ্য ভারবিহীন পদার্থটা সম্বন্ধে একটু খটকা লেগেছিল। এক-একবার মনে হত যে যেমন তাপের ক্যালরী বাতিল হয়ে গেছল, তেমনই এটাও যাবে। তবু সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিজ্ঞানের একটা মূলমন্ত্র আঁকড়ে ধরে ছিলাম যে, পদার্থ আর শক্তি দুটো বিভিন্ন জিনিস, এ দুটোর অদল বদল হতে পারে না। এ সম্বন্ধে প্রাচীনদের মত যখন কানে আসত, অমৃতং বালভাষিতং বলে উড়িয়ে দিতাম। সে দিকেও তো আজ সব গুলিয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা বলছেন যে রেডিয়ম বলে নাকি এক পদার্থ বেরিয়েছে, যা একটুকুও ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে ক্রমাগত শক্তি বিকীর্ণ করছে। তা হলে আর কী ধরে থাকি? এ অবস্থায় একবার সমস্ত লব্ধবিদ্যাটা কষ্টিপাথরে ঘষে যাচিয়ে নেওয়া ভালো। আলোর কিরণ মাধ্যাকর্ষণের জোরে বেঁকে যায়, এ কথা মনে করতেও যে আমাদের মাথা ঘুরে যায়! একদিন সমস্ত মন্ত্রতন্ত্র দেবদেবীকে হাঁচি-টিকটিকির সঙ্গে পুঁটুলিতে বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলাম। আজ আবার ডুবুরি না ডাকতে হয়!

বহু দিন পূর্বে ঋষি চার্বাক বলেছিলেন, মানুষের জীবন দীপশিখার মতো। তেল ফুরিয়ে গেলে নিবে যায়, তখন তাকে আর তেল ঢেলে উসকে তোলা যায় না। মূর্খ! শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান কাকে করছ! কপিল মুনি জোর গলায় বলেছিলেন, ঈশ্বর অসিদ্ধ, মূলাভাবে, প্রমাণাভাবে। হাল আমলের আমাদের গুরুরা হাজার হলেও ইংরেজের

ধামাধরা। চার্বাক-কপিলের সাহস পাবেন কোথায়? তাঁরা স্বাধীন চিন্তার ঢং একটা করলেন বটে। অর্থাৎ শাস্ত্রের অনেকগুলো তত্ত্বের মধ্যে মনের মতো একটাকে বেছে নিলেন। সেইটা ছাড়া বাকিগুলোর নাম দিলেন, কুসংস্কার। তাঁদের নিজের বিশ্বাসটা হল প্রমাণসিদ্ধ বিশ্বাস, আর অন্যগুলো হল অন্ধবিশ্বাস। যতদিন ছোটো ছিলাম, এ-সব মেনে নিতাম। কিন্তু বড়ো হতেই পাঁচজনা মিলে ক্রমাগত জটলা করতে আরম্ভ করলাম, প্রমাণ কই, প্রমাণ কই? মনে আছে, একদিন জনাকয়েক আমরা বসে পেলীর ঈশ্বরতত্ত্ব খুলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের পরিচ্ছেদটা পড়ছি, ও সশব্দে আলোচনা করছি। নিঃশব্দে আমার মাস্টার-মহাশয় ক্ষেত্রবাবু কখন এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারি নেই। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে খুব জোরে হেসে উঠলেন, "এর চেয়ে ঝেড়ে নাস্তিক হয়ে যা, বাবা! পাপ কম হবে।" অথচ, একবার যদি বুক ফুলিয়ে বলি যে যা প্রামাণ্য নয় তা আমার গ্রাহ্য নয়, তা হলে সৃষ্টিকর্তাকেই বা প্রমাণের বাহিরে ঠেলে দিই কি করে?

খুব ছোটো থাকতে খিদিরপুরের যোগেন্দ্রবাবুর কাছে বাবা নিয়ে গেছলেন। তাঁকে নাস্তিক বলে জানতাম, কিন্তু তবু বড়ো চমৎকার লাগল। আমার মনে আছে তিনি বাবার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হেসে বললেন, "You can't be an ancient and a modern man at the same time— প্রাচীন, আধুনিক, দুই তো আর একসঙ্গে হওয়া যায় না!" পাঠক, আমার উপর বিরক্ত হবেন না। আমি ঠিক করেছি যে আমি ancient, প্রাচীন। আর সেই প্রাচীনদের মন নিয়েই অর্বাচীনদের বলতে ইচ্ছা করি, "কোনো প্রত্যক্ষ জিনিসকেই ছেঁটে ফেলতে পারে না, যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক, যে যথার্থ দার্শনিক। যদি তাঁর বড়ো সাধের বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে ঘা লাগে, তা হলেও না।" পুরানো বৈজ্ঞানিক theories যে রকম করে হেলায় আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, নূতনগুলোর অদৃষ্টেও তাই আছে, যদি না নূতন factsএর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে।

পাঠক, আমার অনধিকারচর্চা ক্ষমার চোখে দেখবেন। আমি কতকগুলো ভুতুড়ে ব্যাপারের গল্প আজ করব তারই জন্য এত কৈফিয়ৎ দিতে হল। ঘটনাবলী অতিপ্রাকৃত হলেও অতিরঞ্জিত নয়। গল্প লিখছি প্রধানতঃ আমার যুক্তিবাদী বন্ধুদের জন্য। তাঁরা তাঁদের সাধের theoryগুলো একবার যাচিয়ে নেবেন।

যখন আমার বয়স বছর দশেক, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে গেছলাম। আমাদের গ্রামের বাড়ির দক্ষিণে বারান্দায় ওঠবার যে সিঁড়ি আছে, তার মাঝ-খানটায় এক চওড়া চাতাল। সেই চাতালে মাদুর পেতে আমরা শুতাম।

আমাদের সামনে পাঁচিলের ঠিক বাহিরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক সজনে গাছ ছিল লোকের বিশ্বাস যে ঐ সজনে গাছে এক ডাইনি থাকে। কথাটা আমাদের কা এসেছিল তবে হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নেই, কেননা আমরা ভূত-প্রেত বিশ্বা করতাম না। একদিন আমি আর আমার মেজোভাই ঐ চাতালের উপর ঠাণ্ড হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সরকারদাদা আমাদের ঘুম না ভাঙিয়ে পাশে এ বালিশ নিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। প্রায় রাত দুটো হবে, হঠাৎ আমার ঘুম ভে গেল। সজনে গাছের দিকে নজর পড়তেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এক স্ত্রীলোক ডা বসে আঁচল দুলিয়ে আমাকে ডাকছে। চুপি চুপি আমার ভাইকে জাগি দেখালাম। সে বললে, "বসে বসে দেখা যাক, দাদা, ডাইনিটা কি করে।" আ উত্তর দিলাম, "না রে, না! তার চেয়ে খুব পা টিপে টিপে আয়। কাছে গি দেখে আসি। খবরদার, সরকারদাদা না জেগে ওঠেন।" হাত ধরাধরি ক দু ভাই এগিয়ে চললাম। ভূত তো মানতাম না, কিন্তু বুক অকারণ ঢিপ ঢিপ করে লাগল। খানিক দূর যেতে না যেতে স্ত্রীলোকটা মিলিয়ে গেল, আর তার জায়গা দেখা গেল একটা কলাপাতা দক্ষিণে হাওয়ায় নড়ছে। সুস্থমনে চাতালে ফি গেলাম। গিয়েই কিন্তু দেখি কলাপাতার উপর চাঁদের আলো পড়ে আবার সেট ডাইনীর আঁচল হয়ে গেল। দুজনে খুব হেসে উঠতেই সরকারদার নিদ্রাভঙ্গ হল। তাঁকে ডাইনি দেখালাম। তিনি বেরসিক লোক, ঘাড় ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। মার কাছে পরদিন গল্পটা করতেই তিনি বললেন "এইজন্যই তো বলি, ও-সব ভূত-প্রেতের কথায় কান দিস না। ও-সব গল্পই ঐ রকম।"

তা কিন্তু নয়। অনেক বছর পরে আর-এক রকম ভূতের সংস্পর্শে এসেছিলাম। তখন আমি আহমদাবাদ জেলায় কাজ করি। ছাপ্পান্ন সংবতের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পরের বছর। লোকের বড়ো দুরবস্থা। আমার প্রধান কাজ ছিল কুলি মজুর জাতী লোকদিকে খয়রাতী টাকা বিলি করা, আর খাতেদার চাষীদের বলদ বীজ কেনবা জন্য দাদন দেওয়া। অনেক সময় নগদ দাদন না দিয়ে বলদই কিনে দিচ্ছিলাম। এই-সব কাজে সাহায্যের জন্য সরকার আমাদিকে কয়েকজন ফেমিন অফিসা দিয়েছিলেন। আমার ধোলকা তালুকার সহায় যিনি ছিলেন তাঁর নাম, ধরুন Mr. S.। তিনি বৃদ্ধ ইংরেজ, পুলিসের পেনশনপ্রাপ্ত কর্মচারী। দিনের বেলা কাজ বেশ করতেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর নিজের পানীয় নিয়েই কাটাতেন। আমি দুই-একবার সদুপদেশ দিতে গেছলাম। তবে বালকের উপদেশ তিনি ভালো ভা

নিতেন না, বিরক্ত হতেন। একদিন আমাকে বললেন, "মশায়, আমি বুড়ো মানুষ। আমার কি খেলে ভালো হয়, কি খেলে মন্দ হয়, আমি বুঝি।" বৃথা বড়াই, বুঝতে পারলেন না। শেষে দুদিনের অসুখে মারা গেলেন। সহজ অসুখ নয়। বিকারের অবস্থায়, দুনিয়া-সুদ্ধ লোককে গালাগালি দিতে দিতে গেলেন। যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেই ঘরের জানালার সার্সীগুলো ঘুষো মেরে ভেঙে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার মাস দুই পরে আমাকে কতকগুলো বলদ বিলোতে ধোলকায় যেতে হয়েছিল। এক দিনের কাজ, তাই সঙ্গে তাঁবু নিয়ে যাই নেই। তহশীলদার রাও সাহেবকে বলে পাঠিয়েছিলাম যে সরকারি বাঙলাতে থাকব। আমার ক্যাম্প ছিল ৩০।৪০ মাইল দূরে। সেখান থেকে একজন চাকর নিয়ে টাঙায় রওয়ানা হয়ে ধোলকা বাংলায় পৌছলাম সন্ধ্যাবেলায়। রাও সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বললেন, "আপনার এখানে থাকা হবে না। আমি ডিস্‌পেনসারির একটা খালি ঘরে আসবাবপত্র সব রাখিয়ে দিয়েছি।" আমি রাজি না হওয়াতে বললেন, "চৌকিদার কি বলছে, তা হলে শুনুন।" চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, "ঐ সাহেবটা বড়ো দৌরাত্ম্য করে। কাউকে এখনও মারে নেই বটে, কিন্তু রোজ সারা রাত বেড়িয়ে বেড়ায় কুঠির ভেতর। আমরা রাত্রে ভয়ে কেউ ওদিকে যাই না। বেলা থাকতে থাকতে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে এসে নিজের কুঠরীতে শুই।" আমার সন্দেহ হল। মনে হল, কোনো কু-মতলবে মিথ্যা কথা কইছে, বাড়িটাকে পোড়ো বাড়ি করে রাখতে চায়। তাই জিদ করে ঐখানেই রইলাম। বাড়িটা আমারই সরকারি আবাস। আগে অনেকবার থেকেছি। উপরতলার একটা ঘর আমার বড়ো ভালো লাগত। সেই ঘরটাই নিলাম। S. মরেছিল নীচের এক ঘরে। উপর-নীচে সব সুদ্ধ শোবার ঘর চারটে। খুব বড়ো বড়ো ঘর। মাঝখানে সিঁড়ি। প্রত্যেক শোবার ঘরের লাগা কাপড় পরার ঘর, স্নানাগার। দোতলার মেঝে খুব পালিশ করা তক্তার।

আমি খাওয়া দাওয়ার পর প্রায় একটা পর্যন্ত লেখাপড়া করে শুয়ে পড়লাম। বড়ো ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিলাম। একটা লণ্ঠন জ্বলতে লাগল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ঠিক জানি না। মিনিট পনেরো হবে। হঠাৎ জেগে উঠে শুনলাম, পাশের শোবার ঘরটায় কে একজন ভারী বুট জুতো পরে মশ্‌ মশ্‌ করে চলছে। উঠে বসে বেশ করে কান পেতে শুনলাম। ঠিক বুটের আওয়াজ। লোকটা ঘরের এক দিক থেকে আর-এক দিক ক্রমাগত টহল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মেজের তক্তা মড় মড় করছে, যেমন হয় পুরানো কাঠের মেজের উপর লোক চললে। দু ঘরের মাঝে সিঁড়ির

চাতাল। আমার স্থির বিশ্বাস হল, কোনো মানুষ আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ভয়ানক রাগ হল। বালিশের নীচে এক পিস্তল ছিল। এক হাতে সেইটা নিয়ে, অন্য হাতে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে, তিন চার লাফে সেই ঘরটায় গিয়ে পড়লাম। যে ভাবে যতটুকু সময়ে আমি গেলাম, তাতে কোনো মানুষের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাবার সম্ভাবনা ছিল না। ও ঘরে যেতে যেতে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। বেশ করে দরজা জানালা পরীক্ষা করে দেখলাম। এক চাতালের দিকের দরজা ছাড়া সব ভেতর থেকে ডবল ছিটকিনি লাগানো ছিল। ঘর একেবারে খালি। একটা কেদারা পর্যন্ত নেই! ভাবতে লাগলাম। যে আওয়াজ আমি পাঁচ মিনিট ধরে শুনে এসেছিলাম, সে নির্ঘাত মানুষের পায়ের আওয়াজ। ইঁদুর, বেড়াল, এমন-কি কুকুর, ও-রকম শব্দ করতে পারে না। আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চারি দিক নিস্তব্ধ। কিন্তু যেই তন্দ্রা এসেছে, আবার সেই মশ্ মশ্ মশ্। আবার, একটুক্ষণ শুনে, পিস্তল লণ্ঠন নিয়ে লাফিয়ে গেলাম। এবার আরও তাড়াতাড়ি গেলাম, যাতে সিঁড়ি বেয়ে কারও পালাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে। লক্ষ্য করে এবার দেখলাম যে আমি ঘরে পা দিতেই আওয়াজ থামল, তার আগে নয়। চারি দিকে ফের খুঁজে দেখলাম। সব আগের মতন বন্ধ। বিছানায় ফিরে গেলাম। আবার তন্দ্রা আসতেই শব্দ আরম্ভ। ফের লণ্ঠন নিয়ে দৌড়। আবার চারি দিক চুপচাপ। তিন বারের পর একটু একটু ভয় হতে লাগল। মানুষই হোক অন্য কিছুই হোক, আমি তো কিছু করতে পারছি না! অথচ উপায় নেই। লোকজনকে ডাকাডাকি করতে প্রবৃত্তি হল না। শেষ স্থির করলাম, হোক গে আওয়াজ, আমি ঘুমাব। বড়ো শ্রান্ত হয়েছিলাম। পায়ের শব্দ শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা আমার চাকর চা নিয়ে এসে আমাকে জাগালে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "সাহেবের কি রাত্রে ঘুম হয় নেই?" আমি বললাম, "কেন?" সে বললে, "যে চাপরাসিটা নীচে সদর দরজার বাহিরে শুয়ে ছিল, সে সারারাত কার বুট পরে বেড়াবার শব্দ শুনেছে।" আমি চুপ করে গেলাম।

কাজকর্ম সেরে সেই দিন বিকেলেই আমার ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। তার কিছু দিন পরে আমার আহমদাবাদ থেকে দাক্ষিণাত্যে বদলি হয়ে গেল। আর খোলকা বাংলার কিছু খবর জানি না।

কখনও মৃতব্যক্তির ছায়া দেখেছি কি না, অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন। দেখেছি যে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে যখন একা দেখেছি, সেটা আমার ভ্রম

বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু যেখানে আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেউ সে ছায়া-মূর্তি দেখেছে, সেখানে ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য আর, বোধ হয়, প্রণিধানযোগ্যও। এ রকম আমার দু-তিনবার হয়েছে। তার মধ্যে একটা ঘটনা বর্ণনা করা নানা কারণে অনুচিত মনে হচ্ছে। দ্বিতীয়টির কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এক পরমশ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়ের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর পরে তাঁর বাড়িতে এক শুভকর্মের আয়োজন হয়েছে। বাড়ির সকলেরই বার বার মনে হচ্ছে যে আজ এমন দিনে তিনি নেই, থাকলে কি আনন্দ হত তাঁর! শুভ মুহূর্তে দেখা গেল যে সদর দরজায় তাঁর আত্মীয়-স্বজনের পেছনে তিনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত হলাম। গাড়ি থেকে তাঁর শান্ত প্রসন্ন বদন দেখতে দেখতে নামলাম। ভেতরে যেতে যেতে মূর্তি মিলিয়ে গেল। আমি কাউকে এ ঘটনা বলি নেই। দুদিন বাদ জানতে পারলাম যে, আমি ছাডাও আর একজন সেই সৌম্য মূর্তি দেখেছিল। যে গাড়িতে আমি আসি, সেই গাড়ির শোফেয়ার ঐ বাড়ির পুরানো চাকর। আমার স্বর্গীয় আত্মীয়ের প্রিয় ভৃত্য ছিল। সে পরদিন সকালে মহিলাদের জানায় যে আগের দিন তার মনিব উপস্থিত ছিলেন সদর দরজায়, সকলের সঙ্গে। পরে আমি সেই শোফেয়ারকে জিজ্ঞেস-পড়া করে জানলাম যে ঠিক যে জায়গায় যে কাপড়ে আমি মৃত মহোদয়কে দেখেছিলাম, সেই স্থানে সেই পোশাকে সেও দেখেছিল। আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা আছে। আমার গাড়িতে সেদিন আরও দুজন ছিলেন। তাঁরা কিছুই দেখেন নেই। তবে তাঁদের সঙ্গে আমার স্বর্গীয় আত্মীয়ের কোনো স্নেহ-সম্বন্ধ ছিল না।

আমি অনেক বয়স পর্যন্ত কখনো কোনো Séance দেখি নেই। Séance-এর উপর কোনো শ্রদ্ধাও আমার ছিল না। ১৯১৮ সালে যখন আমি রত্নাগিরিতে ছিলাম, আমাদের জেলার কলেক্টর ছিলেন B. সাহেব। একদিন বিকেলে B. আমার বাড়ি এসে হাজির হলেন। দেখে মনে হল, তাঁর মন বড়ো ক্ষুব্ধ অশান্ত হয়ে রয়েছে। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে, তুমি Séance সম্বন্ধে কিছু জান?" আমি উত্তর দিলাম, "কিছু মাত্র না। কখনো চক্ষে দেখার সুযোগও হয় নেই।" "আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাংলাতে এসো। দেখতে পাবে।" "বেশ আসব। কিন্তু তোমার এ-সব ঝোঁক আছে, জানতাম না তো!" B. ভদ্রলোক ছিলেন, যাকে বলে, Canny Scot। তাঁর পেটে এত বিদ্যা, কে জানে! তিনি বললেন, "না হে, আমি এ-সবের কিছুই জানি না। কিন্তু আমার বড়ো তাক লেগে গেছে। আমি মালবনে ছিলাম, গেল কয়েক দিন। সেখানে ইস্কুলে পড়ে এক ছোকরা, নাম

কান্দে। আমাকে একজন উকিল বললেন যে, এই কান্দে খুব ভালো medium, পরলোকগত আত্মা নামাতে পারে। কথা হচ্ছিল এক বাগান পার্টিতে। সন্ধ্যা হতেই কান্দে বসল এক পেনসিল কাগজ নিয়ে। অচ্যুতরাও দেশাইকে চিনতে তো? তাঁর Spiritকে ডাকলে। প্রথমে কাগজে কতকগুলো যা তা আঁচড় পড়তে লাগল। তার পর ধীরে ধীরে দেখা গেল এক-একটা স্পষ্ট ইংরেজি অক্ষর। ক্রমশঃ অক্ষর থেকে কথা, কথা থেকে একটা পুরো বাক্য বের হল। আমি কাগজটা নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। তার পরদিন দপ্তর থেকে অচ্যুতরাওয়ের লেখা বার করে সেটার সঙ্গে কাগজের লেখা মেলালাম। দুটোই এক হাতের লেখা স্পষ্ট বোঝা গেল। এই তুমি নিজেই দেখ-না!" বলে আমাকে দুখানা কাগজ দিলেন। আমি বেশ করে পরীক্ষা করলাম। লেখা এক রকমই তো মনে হল! B. ফের বলতে লাগলেন, "আচ্ছা, কি করে এ-সব হয়, বল দেখি নি। Spirit কি করে আসতে পারে? এলেই বা লেখে কি করে? যাক্, আমি কান্দেকে সঙ্গে এনেছি। সে বলেছে আমার ভাই আল্‌ফ্রেডকে ডাকবে।" এই আল্‌ফ্রেড এক বছর আগে যুদ্ধে মারা গেছল। B. তাকে বড়ো ভালোবাসত, আজও এতটুকু ভুলতে পারে নেই। আমি বললাম, "আচ্ছা বন্ধু, আমি সন্ধ্যাবেলা আসব তোমার ওখানে। আমার স্ত্রীকেও বলে যাও। তিনি এ-সব ব্যাপার কিছু-কিছু বোঝেন। আগে Séance দেখেছেন।" B. ওঁকেও বলে গেল।

সাতটার সময়ে দুজনে কলেক্টরের বাড়ি গেলাম। সেখানে তিনজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। দুজন আমার চেনা। একজন বৃদ্ধ প-রাও সাহেব থিওসফিকাল সভার অধ্যক্ষ, আর অন্যজন এক মাস্টার, খুব উৎসাহী থিওসফিস্ট। তৃতীয় লোকটি বালকমাত্র, বয়স ষোলো সতেরো, অত্যন্ত রোগা, কিন্তু বড়ো উজ্জ্বল চোখ। B. তার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন, "এইটি মিস্টার কান্দে। এরই কথা তোমায় বলছিলাম।" নমস্কারাদি সেরে সবাই এক গোল টেবিলের (তেপায়া) চারি দিকে বসলাম। টেবিলটা প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া। আমার স্ত্রী হাতখানেক দূরে দর্শক হয়ে বসলেন। আমি বললাম, "রাও সাহেব, আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানি না। কি করতে হয়, দেখিয়ে দেবেন।" তিনি বললেন, "আমরা আজ কলেক্টর সাহেবের ভাই আল্‌ফ্রেডের প্রেতাত্মাকে ডাকব। সকলে হাত উপুড় করে টেবিলের উপর রেখে হাতে হাত ছুঁইয়ে বসা যাক্।" সেই রকম বসা হলে তিনি B. সাহেবের কাছে তাঁর ভাইয়ের একখানা ছবি চেয়ে নিলেন। সুন্দর চেহারা, একুশ বাইশ বছরের জোয়ান, পুরো জঙ্গী পোশাক পরে তলোয়ার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবিখানা আমরা সবাই

দেখে নিলে পর রাও সাহেব বললেন, "আপনারা এক মনে এঁর কথা ভাবুন।" প্রায় দশ মিনিট ঐ রকম বসার পর B. অধীর হয়ে উঠতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কই রাও সাহেব, আল্‌ফী তো এল না!" রাও সাহেব কান্দেকে বললেন, "কি হে কান্দে?" ঠিক সেই মুহূর্তে আমার কাঁধের পেছনে একজন কে এসে দাঁড়াল। তার মুখ আল্‌ফ্রেডের মতো কিন্তু সাজ অন্য রকমের। ছবির মূর্তির গায়ে একটা ঘোর রঙের পল্টনী কোট, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঘোড়সওয়ারী বুট, কোমরে তলোয়ার ছিল। আর এর অঙ্গে খাকি কামিজ ও কাটা পেণ্ট্‌লুন, পায়ে পট্টি জড়ানো আর কোমরে পিস্তল। ছবির মুখটা গম্ভীর, কিন্তু এ মৃদু মৃদু হাসছে। আমি মূর্তিটি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম, যদিচ আমার চোখ টেবিলের পানে ফেরানো ছিল। কান্দে উত্তর দিলে, "ঐ যে এসেছেন।" "কোথায়?" "জজ সাহেবের পেছনে। ঠিক তাঁর ডান কাঁধ বরাবর।" এতটা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কান্দে, কি রকম কাপড় পরে এসেছে, বলো তো!" ছোকরা যথাযথ বর্ণনা করলে। তার পর প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কওয়ার একটা উপায় স্থির হল। টেবিলের পায়া একবার ঠুকলে, "হাঁ", দুবার ঘন ঘন ঠুকলে, "না"। রাও সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "লেফটেনাণ্ট সাহেব কি ঠিক বুঝতে পেরেছেন কি রকম করে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন?" টেবিলের পায়া একবার ঠক্ করলে, আমরা বুঝলাম spirit জবাব দিতে প্রস্তুত। নানাপ্রকার প্রশ্ন করা হল। কোনো কোনোটার "হাঁ, না," জবাব হয়, কোনো কোনোটার হয় না। "আপনি কোন্ যুদ্ধে মারা যান?" "আপনার কর্ণেলের নাম কি ছিল?" "আপনি কোন্ স্কুলে পড়তেন?" এই রকম প্রশ্নের উত্তর টেবিলটা বানান করে করে দিতে লাগল। একটু বুঝিয়ে বলি, যাঁরা আমার মতো আনাড়ী তাঁদের জন্য। ধরুন, কোনো বিশেষ জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করা হল। টেবিল একবার পায়া ঠুকে জানালে যে সে প্রস্তুত। তার পর রাও সাহেব আস্তে আস্তে A B C D বলে যেতে লাগলেন। যেটার বেলায় ঠক্ করে আওয়াজ হল সেইটে প্রথম অক্ষর। চার বার এই রকম করে পাওয়া গেল A, V, O, N। আমরা বুঝলাম নামটা Avon। তখন একবার সোজা প্রশ্ন করে মোকাবিলা করে নিলাম। যত কথা জিজ্ঞাসা করা হল, তার অধিকাংশের উত্তর B. ছাড়া আর কেউ জানতেন না। Adjutant-এর নাম তাঁরও জানা ছিল না। অথচ টেবিলের কাছ থেকে একটা নাম পাওয়া গেল। পরে B বিলেতে খোঁজ করে জেনেছিলেন নামটা ঠিক। এ সমস্ত সময়টাই ছায়ামূর্তি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম। হঠাৎ মনে হল কেউ নেই। দুই একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। কান্দে বললে, "আল্‌ফ্রেড বেরিয়ে যাচ্ছেন।"

এই কথা বলতে না বলতে টেবিলটা ভয়ানক দুলে উঠল— প্রায় নাচতে লাগল, যেমন ছোটো নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর করে। একবার এ পা ঠোকে, একবার ও পা। রাও সাহেব খুব চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে তুমি, আমাদের বিরক্ত করতে এসেছ?" কোনো সাড়া নেই। টেবিল সেই পাগলের মতো নাচছে। খুব জোরে কয়েকবার ধমক দিতে স্থির হল। রাও সাহেব বললেন, "নিশ্চয় সেই White।" আমাকে বোঝালেন, "মহাশয়, একটা অতি পাজি spirit আছে। আমাদের জ্বালাতন করে মারে। কখনও বলে, আমি Scotchman, কখনও বলে পারসী। কিন্তু বোধ হয় ও মুসলমান, কেননা একদিন ফারসীতে নাম লিখেছিল medium-এর মারফত, মীর মহম্মদ মুনশী।" আমি এবার কিছুই দেখতে পেলাম না। কান্দে বললে, "হাঁ, সেই বটে।" একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে ঘর অন্ধকার ছিল না। একটা বড়ো ল্যাম্প কোণে জলছিল, তবে তার আলোটা কমিয়ে রাখা হয়েছিল। তার পর White-এর সঙ্গে কথাবার্তা। সুবিধা করা গেল না। সে যা তা উত্তর দিতে লাগল। শেষ রাও সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখো, তোমাকে কিছুতেই ছুটি দেব না এ রকম করলে। যখন এসেছ একটু খেলা দেখিয়ে যাও। রাজী আছ?" টেবিল আওয়াজ দিলে, ঠক্। মাস্টার তখন তাঁর গোল টুপিটা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, "এটাকে দাঁড় করাও দেখি, White।" আস্তে আস্তে টুপিটা দাঁড়িয়ে উঠে গড়াতে আরম্ভ করলে টেবিলের এ পাশ থেকে ও পাশ। তার পর White (?) দেশালাইয়ের বাক্স নাচালে। বাক্সটা নেচে নেচে হুকুমমত একবার এর কাছে যায়, একবার ওর কাছে। আলফ্রেডের সঙ্গে কথা কওয়ার সময় যে গাম্ভীর্য সকলের মনে এসেছিল, সেটা চলে গেল। B. পর্যন্ত হাসতে লাগল। হঠাৎ টেবিল আবার ক্ষেপে উঠে নাচতে লেগে গেল। খানিকক্ষণ কিছুতেই বাগ মানে না। তখন রাও সাহেব টেবিল চাপড়ে বললেন, "আচ্ছা, একটা কাজ করে তুমি চলে যেতে পার। আমাদের টেবিলটাকে হাঁটাও।" আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম। পাঁচজনেরই হাত টেবিলের উপরে। টেবিল দেড় বছরের ছেলের মতো টলতে টলতে হাঁটি-হাঁটি পা-পা আরম্ভ করলে। দরজার গোড়ায় পৌঁছলে সকলে হাত ছেড়ে দিলে। শুধু আমার হাত রইল। রাও সাহেব বললেন, "মুখে বলতে থাকুন, Go on, go on।" আমি তাই বলতে লাগলাম। টেবিল চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাহিরের ছাদে গেল। ঠক্ ঠক্ করতে করতে ছাদটা পার হল। তার পর কে যেন টেবিলটাকে হুড়মুড় করে ছাদের আলসের গায়ে উলটে দিলে। হয়ে গেল Séance!

B. দু-তিনদিন ধরে আমায় ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কি ব্যাপার, বলো তো! আল্‌ফী কি সত্যি এসেছিল? না ওদের মধ্যে কেউ আমাদের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছিল?" আমি কি উত্তর দেব? নিজেই বুঝতে পারি না কিছু। আগে মনে করতাম Seanceগুলো সব জুয়োচুরি! নিজে চোখে দেখলাম যে কেউ হাতে করে টেবিলও নাড়ে নেই, টুপি দেশালাইও কেউ তারে বেঁধে নাচায় নেই। তার পর আমার পিছনদিকে যে মূর্তি দেখলাম সেটা কান্দে দেখতে পেলে কি করে, যদি আমার মনের ভ্রমই হয়? বুদ্ধিমান পাঠক নিজের বুদ্ধিমত ব্যাখ্যা করে নেবেন। আমি আর কি বলব।

আর-এক রকমের ঘটনা একটা বলি। এটাতে প্রেতাত্মার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেবারও আশ্চর্য এই লেগেছিল যে আমি যে ছায়াটা দেখলাম তার কথা আর একজন জানলে কি করে? প্রায় পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন খুব বেশি ছবি আঁকতাম। প্রায় সব ছবিই দেবদেবীর মূর্তি। ছবিগুলোর technique নেই বললেই হয়, কেননা আমি আঁকতে কখনও শিখি নেই। তবে আমার কাছে তার মূল্য খুব বেশি এইজন্য যে ঐ daub আঁকতে আঁকতে আমি আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি পরিষ্কার বুঝতে পারি। আমার বাঁধা নিয়ম ছিল যে কোনো ঠাকুরের ধ্যান বার বার পড়ে মূর্তিটা ধারণা করতে চেষ্টা করতাম। যতক্ষণ না বেশ স্পষ্ট একটা মূর্তি মানসপটে দেখতাম, ততক্ষণ আঁকতে আরম্ভ করতাম না। অবশ্য, শিব গড়তে বাঁদর গড়ার যে কথাটা আছে, সেটা আমারও বার বার হত। কল্পনার মূর্তিটা কাগজে ফোটাতে পারতাম না। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। আমার চেষ্টার সাক্ষী অনেকেই ছিলেন। তার মধ্যে একজন আজ দেশবিশ্রুত সাধু পুরুষ। তিনি প্রায়ই বসে বসে আমার আশা-নিরাশার খেলা দেখতেন। দিলাসাও যথেষ্ট দিতেন। একদিন বললেন, "এই ছবি আঁকতে আঁকতেই একদিন আপনার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হবেন।" পাঠককে অভয় দিচ্ছি। সে রকম কিছু ঘটে নেই, কুণ্ডলিনী আজও ঘোর সুষুপ্তিতে মগ্ন!

অতসীকুসুম, জবাকুসুম, নবজলধর শ্যাম, নবদূর্বাদল শ্যাম, হিরণ্ময় বপু, নানা রকম রঙ দিবারাত্র মাথার ভেতর ঘুরছে। ক্রমাগত তুলি ঘষে ঘষে এই-সব রং ফলাতে চেষ্টা করছি, আর চিত্রকর-জাতীয় যাকে কাছে পাচ্ছি তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করছি, লজ্জা শরম কিছুই নেই! এখন কিন্তু সে সব মনে করতেও লজ্জা বোধ হয়। অন্যান্য রং তুলি থেকে এক-রকম বের হত। মূর্তির ভঙ্গ ও মুদ্রাও কতকটা রপ্ত হয়েছিল। কিন্তু দেবতার পদতল করতলের অলক্তরাগ, আঁকা দূরে থাক, মনেও

দেখতে পেতাম না। সেকাল একালের যত ছবি দেখেছি, কোনোটাতেই এই জিনিস আমার মনে ধরে নেই। এত করে এ কথা বলবার কারণ এই যে, আমার গল্পটাই ছবির রং নিয়ে।

১৯০৯ সালে যখন কুচবেহারে রয়েছি; তখন এক বৈষ্ণব কীর্তনীয়ার সঙ্গে আলাপ হয়। শুধু আলাপ নয়, ঘনিষ্ঠতা হয়। বার বার তার কীর্তন শুনতাম, কখনো কখনো সারা রাত। সে নীচ জাতীয় ছিল, বিদ্যাবুদ্ধিরও বিশেষ ধার ধারত না। কিন্তু তার ভক্তির পুঁজি অপর্যাপ্ত ছিল। তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করে বড়ো আনন্দ পেতাম। সে আমায় কেবলই বলত, "বাবু, আমাকে আমার গোপালের একটা ছবি এঁকে দিন।" আমার ছবি আঁকার কত হাঙ্গাম, তা সে কি জানবে! একদিন কথাটা ভেঙে বললাম, "বৈরাগী, তোর গোপাল যখন ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজায়, তখন তার ডান হাতের চেটোর রং কি রকম দেখায়, আমি বুঝতে পারি না। আমাকে দেখাতে পারিস!" বলে আমার আঁকা এক বংশীধারী মূর্তি দেখালাম তাকে, "এই দেখ্-না, এ কি তোর গোপালের হাতের রং!" বৈরাগী চুপ করে রইল।

পরে, একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর কোনো বন্ধুর বাড়িতে কীর্তন শুনতে যাওয়ার কথা। বৈরাগী যাওয়ার পথে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে। রাত আটটায় আমি বসে বসে পড়ছি, এমন সময় সে এল। সেইদিন ভারতীতে নন্দলালবাবুর আঁকা "জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ" ছবিটা এসেছিল। আমার সেটা এত ভালো লেগেছিল যে ছিঁড়ে ঘরের বেড়ায় টাঙিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। বৈষ্ণবকে দেখালাম "ছবিটা দেখ্ তো, চিনতে পারিস্ কি না!" সে একবার দেখেই ছোঁ মেরে ছবিটা খুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, "বাবু, এ যে আমার গৌর! আমি এটা নেব। আপনি তো আমার গোপালের ছবি করে দিলেন না!" আমি বললাম, "তা নে। আমার আর-একখানা আছে। কিন্তু তুই গোপালের হাতের রং তো কই বলে দিলি না। কি পূজা করিস্ রোজ রোজ!" বৈরাগী একটু হাসলে।

কীর্তনের আসরে পৌঁছেই সে গৌরাঙ্গের ছবিখানা এক থামের উপর এঁটে দিলে। তার পর সেই ছবির উপর চোখ রেখে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করলে। কি গানই গাইলে সেদিন! গলা তার চিরদিনই মিষ্টি, কিন্তু সেদিনের মতো মধুর স্বর এক দিনও শুনি নেই। সার্থক চিত্রকরের ছবি আঁকা!

গান নাচ নিত্যপ্রথামত চলল। বারোটার পর খুব জমেছে। বৈরাগী রাধা কৃষ্ণের এক-একটা উপমা দিচ্ছে, আর সেইটে গাইতে গাইতে ঘুরে ঘুরে নাচছে।

"শ্যাম নবনীরদ বরণ, রাধা থির বিজুলী", "নীল তমাল ঘেরে কনকলতা রে", এই রকম এক-একটা আলাদা পদ গাইছে। আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি। অন্ততঃ আমি নিজের কথা বলতে পারি। গানে সুরে নাচে তালে আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি আমার সামনে দুটি নীল হাত বাঁশি ধরে রয়েছে। ডান হাতের চেটো আমার দিকে ফেরানো। তার সে রং বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। লাল, কিন্তু সে রকম লাল আমি কখনও দেখি নেই। রঙের বাক্স থেকে সে রক্তরাগ কি করে বেরোবে? আঁকতে কখনো চেষ্টাও করি নেই। তবে আমার সমস্যা পূরণ হয়ে গেল। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

এ পর্যন্ত সবটা বোঝা যায় এক রকম। ঐ অলক্ত রাগ দেখবার জন্য আমার এত দিনের আগ্রহ যে সেটা ঐ ভাবে দেখব তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কীর্তন আরম্ভ হওয়ার সময় নন্দলালবাবুর চিত্রের মন্ত্রের মতন অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মনে একটু হিংসাও হয়েছিল। কেন ও রকম আঁকতে পারি না? কে জানে, হয়তো গান শুনতে শুনতে ছবির কথা অজানতে মনের মধ্যে তোলা পাড়া করছিলাম। তার উপর সংগীতের মোহিনী শক্তি। ফলে একটা ও রকম ছায়াচিত্র দেখা অসম্ভব নয়।

কিন্তু যেটা যথার্থ অদ্ভুত, সেটা হচ্ছে এই যে, ঠিক ঐ মুহূর্তে গায়ক মুখ ঝুঁকিয়ে আমার কানে বলে গেল, "বাবু, দেখলেন?" এই দুটি কথা চকিতের মতো বলে আবার ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। আমার পাশে যে বন্ধুটি বসেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বৈরাগী কি বললে?" আমি উত্তর দিলাম. "কিছু না।"

পরদিন আমি বৈষ্ণবকে বললাম, "আমি তোর গোপাল আঁকতে পারব না। তুই যে রং দেখালি, ও রং আমি কোথায় পাব!" সে হাঁ করে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। বললে "বাবু, আমি কী দেখালাম?" আমি বললাম, "কাল রাত্রে নাচতে নাচতে আমায় যে বললি, দেখলেন বাবু?" বৈষ্ণব আশ্চর্য হয়ে গেল, "আমি তো কিছুই বলি নেই, বাবু। আমার তো কোনো কথাই মনে হচ্ছে না।" আমি তাকে কি হয়েছিল বর্ণনা করাতে সে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে তার ঠাকুরকে প্রণাম করলে। পাঠক, বৈরাগী কি করে জানলে যে আমার চোখের সামনে দুটো হাত বাঁশি ধরে দেখা দিয়েছে? কথাটা ভেবে দেখার মতন।

এই বৈরাগীর কথা বলতে বলতে অন্য সাধু সন্তের গল্পও মনে আসছে। তবে তাতে চটকদার কিছু নেই। যোগবলের কোনো অদ্ভুত নিদর্শন দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নেই। সুদূর প্রদেশে মঠ অনেক দেখেছি। তবে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও

শচীদেবীর ঢেঁকিশালে ধান ভানবে, অপ্সরাদের সংগীত তার কানে কি করে পৌঁছবে?

অন্য রকমের দুই-একটা আশ্চর্য জিনিসের কথা বলে আজকের লেখা শেষ করব। এ কথাগুলোর সঙ্গে ভূত-প্রেতের বা ঠাকুর-দেবতার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার এক কবিরাজ বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেক দিন কৈলাসবাসী হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসাবিদ্যায় অসাধারণ অধিকার ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু এ প্রসঙ্গে বলা অবান্তর হবে। তবে তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটা ঘটনা বলব, যা আমাদের বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। কবিরাজ, বোধ হয়, কোনো রকম যোগ সাধনা করতেন। কখনো খুলে কিছু আমাকে বলেন নেই। তবে, আমাকে শিকারে আসক্ত জেনে লক্ষ্যবেধ সিদ্ধির জন্য ত্রাটক যোগ অভ্যাস করতে বারবার উপদেশ দিতেন। উপদেশ নিষ্ফল হয়েছিল। আমাদিকে লোভ দেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি একটা বুজরুকি মাঝে মাঝে করতেন। একটা কাগজে কিছু লিখে, সেটা আমরা ওঁর কপালে গঁদ দিয়ে এঁটে দিতাম। তার পর উনি রীতিমত পদ্মাসনে বসে, শিবনেত্র হয়ে, ধীরে ধীরে বানান করে করে সেই লেখা পড়তেন। মনে হত, পড়তে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। কিন্তু সবটা ঠিক পড়তেন শেষ পর্যন্ত।

কবিরাজ মহাশয়ের হাত দেখার অভ্যাসও ছিল। এক-একটা খুব আশ্চর্য কথা বলতেন। বিশেষ ভুল কখনো করেছিলেন বলে মনে নেই। একদিন এক বিয়েবাড়িতে এসে কনের হাত দেখে হঠাৎ বললেন, "না, বিয়ে তো হবে না ও তারিখে!" সকলে শশব্যস্ত হয়ে উঠল। বিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে না হওয়ার তখন কোনো কারণই ছিল না। আবার ভালো করে হাত দেখে পরীক্ষা করে বললেন যে কয়েকদিন পরে অমুখ তারিখে বিয়ে হবে। সেই দিনই বরের হাত দেখলেন। দেখে, অনেক ইতস্তত: করে বললেন, "আপনার পিতার সাংঘাতিক অসুখ, পৃষ্ঠব্রণ হয়েছে। অস্ত্র চিকিৎসা করে সারবে। ভোগ অনেক আছে, তবে ভয় নেই!" বরের পিতা সেই দিন সন্ধ্যাবেলা কলকাতায় পৌঁছলেন পিঠে একটা সামান্য ফোড়া নিয়ে। দেখতে দেখতে সেই ফোড়া ভীষণ কারবঙ্কলে দাঁড়াল। কাটাকুটি হল। বেশ কয়েক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থেকে অবশেষে সেরে উঠলেন। বিবাহ কবিরাজের বলা তারিখেই সম্পন্ন হল।

একবার আমার কর্মস্থানে ফিরে যাওয়ার দিন কবিরাজ এসেছেন বিদায় নিতে। আমি ঠাট্টা করে বললাম, "কবিরাজ, হাতটা একবার দেখ, কিছু লাভ লোকসান আছে কি না।" কবিরাজ বললেন, "তোমাদের ভাই, সব বিষয়েই ঠাট্টা। আচ্ছা,

দাও হাত।" হাত বেশ করে দেখে জানালেন, "বিশেষ কিছু দেখছি না। তবে মাসখানেকের পরে কিছু ধনাগম হবে। একটা খারাপ জিনিসও আছে। শীঘ্রই বাম অঙ্গে একটা আঘাত পাবে। কপালগুণে অল্পের উপর দিয়েই যাবে। ভয় পাবার কারণ নেই।" কর্মস্থানে ফিরেই শুনলাম একটু আয়বৃদ্ধি হয়েছে। অভাবনীয় কিছু নয়। তবে আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। বাম অঙ্গে আঘাতটাও বাদ গেল না। সেটা পেলাম পথেই, জাহাজের স্নানাগারে। চৌকাঠটা বাঁ হাতে ধরে দরজা দিয়ে ঢুকছি, এমন সময় অকস্মাৎ একটা বড়ো ঢেউ লেগে জাহাজটা খুব কাৎ হয়ে গেল। ফলে লোহার দরজা দড়াম করে আমার হাতের উপর পড়ল। হাতটা সময়ে টেনে নিতে পেরেছিলাম, তাই ভেঙে গেল না। কিন্তু একটা আঙুল চিমটে গেল। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগ করলাম। শেষ নখটা কালো হয়ে উঠে গেল!

হাত দেখার কথা বলতে আর-একজনের কথা মনে হচ্ছে। ভদ্র লোকের নাম বিনয়বাবু। 'বন্দে মাতরম' আপিসে কাজ করতেন। খুব কাজের লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নেচে গেয়ে, যাত্রা থিয়েটারের নকল করে, লোককে হাসানো। একদিন আমরা অনেকগুলি লোক জমা হয়েছি। বিনয় হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলার ঢং করে সবাইকে হাসাচ্ছেন। স-বাবু সেই সময় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভীষণ ঝোঁক ছিল তাস খেলার। এসেই চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন, "কেন সময় নষ্ট করছেন সব? তাস বের করুন।" বিনয় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "একবার হাতটা দেখে দিই, আসুন স্যার!" তিনি হেসে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, "চট্‌পট্ সেরে নিন, মশায়!" বিনয় ভদ্রলোকের হাত দেখেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে আবার নানা রকম হাসিঠাট্টা আরম্ভ করলে। একটু পরে সুবিধা বুঝে আমার কাছে উঠে এসে চুপি চুপি বললে, "কর্তা, একবার বাহিরে আসবেন? একটু কথা আছে।" বাহিরে আমাকে নিয়ে গিয়ে মুখটা খুব ভার করে বললে, "আপনাদের বন্ধুর হয়ে এসেছে। একটা চিহ্ন হাতে উঠেছে। আগে ও চিহ্ন দুবার দেখেছি, দুবারের কোনো বারই তিন মাস কাটে নেই। কথাটা বলতাম না। কিন্তু উনি আমাদের কাগজে উইল করে কিছু দিয়ে যাচ্ছেন না? সেইটে একটু তাড়া দেবেন। নইলে ফসকে যাবে।" এর কয়েক দিন পরে এক শনিবারে আমরা স-বাবুর বাড়ি বেড়াতে গেলাম। বাড়ি শহরের বাইরে। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে তাঁর গাড়িতেই কলকাতা ফিরলাম। পথে তিনি সংগীত সমাজে নেমে পড়লেন। স-বাবু লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড মানুষ। বেশ ভালো স্বাস্থ্য। থেকে থেকে দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার পর্যন্ত মোটরে পাড়ি

দিতেন। তাঁর যে হঠাৎ কিছু হবে, এটা অভাবনীয়। কিন্তু দুদিন পরে সোমবারে সকালবেলা এক ভদ্রলোক এসে বললেন, "স-চন্দ্র যে যায় যায়। আপনারা দেখতে গেছলেন?" আমরা কিছুই জানতাম না। ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম যে শনিবার দিন ক্লাব থেকে ফেরবার পথে হেদোয় নেমে স-বাবু রক্তবমি করেছিলেন। বাড়ি গিয়ে আরও বমি হয়। ডাক্তার বলেছেন যে ভেতরের কি শিরা ছিঁড়ে গেছে। যখন এই-সব কথা হচ্ছে, তার আগেই স-চন্দ্র ইহলোক ছেড়ে গেছেন। উইল সই হয় নেই, টাকাকড়ি সব এক ধনী আত্মীয় পেলেন।

কোষ্ঠীর ফলাফল সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলব। ঘটনাটা আমার এক বন্ধুর জীবনের। সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধেই আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, শোনা কথা নয়। একদিন ইন্দ্রলোকে দেবরাজের সভায় নাচতে নাচতে বন্ধুবরের তাল কেটে যায়। ফলে, স্বাধিকারপ্রমত্ত শাপেনাস্তংগমিত-মহিমা হয়ে তাঁর কতিচিৎ বর্ষ নির্বাসনে কাটাতে হয়, রামগিরিতে নয়, সিন্ধুতীরে। প্রভু শাপমোচনের কোনো দিবস বা উপায় স্থির করে দেন নেই। তবে বন্ধু সেখানে অবলাবিপ্রযুক্ত ছিলেন না। উপরন্তু সেই মরুপ্রদেশে তাঁর পুত্ররত্ন লাভ হল। বন্ধুবরকে মরুবাসী সবাই বড়ো স্নেহ করতেন। এক ইসলামপন্থী মিত্র অনেক যত্ন করে নবজাত কুমারের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হলেন। গ্রহের ফলাফল গণনা করতে গিয়ে জ্যোতিষী পিতার শাপমোচনের কাল জানতে পারলেন। বন্ধুর কাছে গিয়ে বললেন, আগামী বছর অমুক মাসের বারোই তারিখে তোমার শাপমুক্তি হবে।" আমি নিজে স্থির জানি যে সে সময় পর্যন্ত মুক্তির দিন নির্দিষ্টই হয় নেই, বিচারসাপেক্ষ ছিল। অথচ জ্যোতিষীর গণনা ঠিক ফলল এক বছর পরে। নির্দিষ্ট মাসের দশই তারিখে এক মোহর-বন্ধ আদেশ-পত্র বন্ধুর হাতে এল। তিনি ঠিক বুঝলেন, ভেতরে কি আছে। কিন্তু খুলে দেখবার উপায় ছিল না। লেফাফার উপর বড়ো কর্তার নাম, সুতরাং পত্র তাঁর কাছেই পাঠাতে হল। বন্ধু বড়ো কর্তাকে এক চিঠি লিখলেন সেই দিনের ডাকে, "আজ তোমার কাছে একটা সরকারি চিঠি পাঠাচ্ছি। যদি ভেতরে আমার নামে কোনো হুকুম থাকে, তো তারযোগে খবর দিও।" যদি বড়ো কর্তা তার করতেন, তো বন্ধু তাঁর মুক্তির হুকুম এগারোই তারিখে পেতেন। কিন্তু তা করলেন না। নানা রকম ভেবে ডাকে চিঠি লিখলেন। ফলে, শাপমোচনের আদেশ ঠিক বারোই তারিখে বন্ধুর হাতে এল। জ্যোতিষগণনা হুবেহুব ঠিক হল।

Coincidence, "কোনোরকমে মিলে গেল," বলে এত কথা কাটিয়ে দেওয়া কঠিন।

৮

যখন বিলেত রওয়ানা হই, তখন আমার বয়স কুড়ি বছরও হয় নেই। তবু আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমি রীতিমত বড়ো হয়েছি, সংসারকে বেশ চিনেছি। চেনারই তো কথা! ছটি বছর মাথার উপর কেউ কর্তাব্যক্তি ছিলেন না। মনের সাধে কলকাতার পথ ঘাট চষে বেড়িয়েছি। তার উপর, বিয়ে করেছি, পরীক্ষায় ফেল হয়েছি, দিন-দুপুরে রাত-দুপুরে ফুটবল খেলেছি, সভা-সমিতিতে মোড়লি করেছি। আর কি রকমে মানুষে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে!

কর্তৃপক্ষের কিন্তু ধারণা অন্য রকম ছিল। তাঁরা এই নাবালকটির তত্ত্বাবধানের নানা ব্যবস্থা করতে লাগলেন। স্থির হল, অমুক আমাকে বোম্বাইয়ে জাহাজে তুলে দিয়ে আসবেন, অমুক মার্সেইয়ে নামিয়ে নেবেন। জলপথটা যে একটু স্বস্তিতে কাটবে, তারও উপায় এঁরা রাখলেন না। কাপ্তান সাহেবকে আমার অভিভাবক করে ছেড়ে দিলেন। আমি সমুদ্র পার হচ্ছিলাম ফরাসি কোম্পানির জাহাজে। ওদের ভাষা একটু-আধটু বলতে পারতাম বলে অফিসারমণ্ডলীর কাছে আমার আদর খুব বেড়ে গেল। তারা আমার খাবার জায়গা করে দিলে নিজেদের মাঝে, আর, এটা খাও, ওটা খাও, করে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে লাগল। আমার কেবিনে উইলিয়ামস নামে এক বুড়ো ইংরেজ ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল রাজারাজড়ার ঘোড়দৌড়ি আস্তাবলের তদারক করা। আমি কুচবেহারের লোক জেনে তিনি মহাখুশি হয়ে আমাকে বললেন, "তুমি তো আমার আপনার লোক হে! আমি তোমাদের রাজার কত ঘোড়া রেস-এর জন্য তৈরি করে দিয়েছি।" ফরাসি কাপ্তানকে এই বৃদ্ধ কি বললেন, জানি না। কিন্তু এডেন, পোর্টসৈয়দ বন্দরে ইনিই আমাকে ডানা ঢাকা দিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। পাঠককে আগেই বলেছি আমার সহযাত্রী কাপ্তান স্টুয়ার্টের কথা। পোর্টসৈয়দ ছাড়বার পর তিনিও আমার একজন অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন। আমাকে একটু বকে ধমকে বললেন, "তুমি বড়োলোকের ছেলে, উইলিয়ামসের সঙ্গে অত মাখামাখি কর কেন? লোকটা জাতে সহিস বই তো নয়!" ছেলেবেলা থেকে বাপ-মার হুকুমে ঝি চাকরদের দাদা দিদি বলে ডেকে এসেছি, তাতে তো কোনো দিন ইজ্জৎ যায় নেই। আজ উইলিয়ামস আমার জাত মারবে কি করে!

মার্সেই বন্দর চোদ্দ দিনের দিন পৌঁছলাম। কাপ্তান পিঠ চাপড়ে বললেন, "তোমার কর্তাদের লিখো যে আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলি নেই, ভালোয় ভালোয়

ইউরোপে পৌঁছে দিয়েছি। তাঁরা যেন আমার এজেন্ট সাহেবকে জানান।" একটু পরেই দেখি চৌধুরী সাহেব এসেছেন। জাহাজের বন্ধুবান্ধবের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। লণ্ডন পর্যন্ত তিনিই আমার কর্ণধার।

এইবার একটু বাজে কথা বলব। আমি বিলেত প্রবাসের গল্প লিখব শুনে এক তরুণ বন্ধু সেদিন ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের সময়ে বিলেত ছিল নাকি?" প্রশ্নটা নিতান্ত অর্থহীন নয়। তবে, একটা যেমন-তেমন বিলেত ছিল বই-কি! যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। আমাদের সেই সংকীর্ণ ব্রাহ্মযুগের ভাবনা সাধনা যে রকম ছিল, আমাদের বিলেতরূপী সিদ্ধিও তদ্বৎ ছিল। এখনকার বাঙালির উৎকট সাধনার উপযুক্ত সিদ্ধি এখনকার উগ্র বিলেতী সভ্যতা। এ বিলেত আমাদের ধাতে সইত না। হয়তো ভিক্টোরীয় যুগের একজন সেকেলে স্কোয়ার এসে দাঁড়ালে তারও ঠিকে ভুল হয়ে যেত। সকলের কি পেঁয়াজ, রসুন, গরম মসলার গন্ধ বরদাস্ত হয়! তবে একটা কথা বারবার মনে হয়। যে জাত মহাযুদ্ধের সময় চার বছর ধরে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করেছিল, trench-এর (খাদের) পাঁকের মাঝে শুকনো নোনা মাংস খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছিল, shrapnel গুলির বর্ষণে কাতারে কাতারে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের ঘরে ফিরে এসে, কিছু দিন সকল বাঁধন সকল শাসন কেটে ফেলে দিয়ে, জীবনটাকে আবীর গুলালের রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার সাধ হবে বই-কি! কিন্তু যারা রণদেবতার তাণ্ডবলীলার সময় লেপ মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিল, তাদের যোগ্য কণ্ঠাভরণ লৌহশৃঙ্খল। বসন্তোৎসবের ফুলের মালা তাদের জন্য নয়!

আমি যে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে বসন্তোৎসবের চিহ্নমাত্র ছিল না। চারি দিকে একটা বিরাট আত্মপ্রসাদের হাওয়া। কোনো রকমের হালকাপনা সে হাওয়ার সঙ্গে খাপ খেত না। লোকে হাসত মুখ টিপে টিপে, নাচত পা ঘসে ঘসে, চলত গজেন্দ্রগমনে। ইংরেজ তখন তার অগাধ ঐশ্বর্য নিয়ে, বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে, মশগুল। কিসে টাকার থলি আরও ভারী হবে, কিসে রাজ্য আরও বিস্তৃত হবে, এই তার ধ্যান। এই যুগের সম্বন্ধেই এক রসিক ফরাসী লেখক বলে গেছেন, ইংরেজ-বাপ তার ছেলেকে সংসারযুদ্ধে পাঠাবার সময় আশীর্বাদ করে বলতেন, "যাও বাপু! টাকা রোজগার করো গিয়ে; পার, তো সৎপথে থেকে রোজগার কোরো। কিন্তু মনে রেখো, টাকা আনাই চাই।"

মোটের উপর ইংরেজের তখন একটা খুব হাম-বড়া ভাব। তা, হওয়ার কারণও ছিল। তাদের Free trade (অবাধবাণিজ্য), তাদের Constitutional

monarchy (নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র), তাদের Public school (ইটন, হ্যারো প্রভৃতি), তাদের Varsity (অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিদ্যাপীঠ), জগতের আদর্শ। তাদের বিশাল সাম্রাজ্য কেমন সুশৃঙ্খলায় চলছে! বিদেশীরা দেখুক, শিখুক। যুদ্ধবিগ্রহ অনেকদিন হয় নেই, কিন্তু তাতে কি এসে যায়, ইংলণ্ড সদাই প্রস্তুত! সেই সময়কার একটা গান মনে পড়ছে। তখন কুলি মজুরেও রাস্তায় গাইত :

We don't want to fight
But, by Jingo, if we do,
We have got the ships,
We have got the men,
We have got the money too.

বড়াই শুনে ভাগ্য-দেবতা হয়তো অলক্ষ্যে আকাশের কোণে বসে হাসছিলেন। তার পর কটা বছরই বা গেছে! এত সাধের Free trade, Constitutional Monarchy, Eton, Harrow, Oxford, Cambridge, আর জগতের চোখে ধাঁধাঁ লাগাতে পারছে না। রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি এখন জগৎকে শিখতে হচ্ছে টিউটন, লাটিন ও শ্লাভ জাতের কাছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর পারের দুই জাতের হাতে। তার পর, জগৎজোড়া একটা বৃহত্তর ব্রিটেন গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা, তাও আজ জেনিভার আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মহান আদর্শের পাশে একটা অতি ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পন্থা বলে ধরা পড়ে গেছে। যাক গে, এ সব পুরানো কথা নয়, অতএব আমার অধিকারের বহির্ভূত।

চৌধুরী মহাশয়কে পাওয়া পেয়ে আমার একটা মস্ত সুবিধা হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে ইংলণ্ডে যেতে হল না। প্রায় হপ্তাখানেক ধরে মার্সেই ও পারিস দেখে নিলাম। আমি অজ-নেটিব ঘরের ছেলে, সাহেবী কায়দা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কলকাতায় শেষ কদিন ইংরেজ দরজি, ইংরেজ মুচি ও ইংরেজ নাপিতে মিলে আমাকে কোনো রকমে সাহেব সাজিয়ে দিয়েছিল। কাজেই বড়ো বড়ো হোটেলে বাধ-বাধ ঠেকত বই-কি! তবে মুরুব্বী সঙ্গে। ছোটো বড়ো সমস্যাগুলো তিনিই মিটিয়ে দিতেন।

ডুমাসের Monte Cristo বইখানা আমার বড়ো ভালো লাগত। দেশে অনেকবার পড়ে এসেছিলাম। মার্সেই ঘুরে ঘুরে ঐ কেতাবের জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে লাগলাম। আব-কিছু দেখতে পেয়েছিলাম কি না, মনে নেই। কিন্তু মার্সেইয়ের জাহাজঘাটা, আর বন্দরের মুখে শাতো দিফের কেল্লা দেখে বড়ো ফুর্তি হয়েছিল। আনন্দের আতিশয্যে ফরাসী ভাষায় একখানা Monte Cristo অনেক দাম দিয়ে

কিনে ফেলেছিলাম। মার্সেইয়ের আর-একটা romance আমার মনে গাঁথা ছিল। আমার মাস্টার ফোশার সাহেব ফরাসী প্রথম ভাগ শেষ করেই আমাকে যত্ন করে La Marseillaise পড়িয়েছিলেন, আর এই গান রচনার গল্প বলেছিলেন। যারা এই শহরে এক শতাব্দী আগে প্রথম মার্সেইয়েজ গেয়েছিল, তাদের কথা বারবার মনে পড়তে লাগল, যখন পারিসমুখো রওয়ানা হলাম। কানে সুরটা বাজছে। সেই "Allons, enfants de la Patrie" (স্বদেশ সন্তান, চল সবে আজি, বিজয়ের অভিযানে)-র তালে আমিও আজ পারিস চলেছি। স্বপ্ন কি সুন্দর জিনিস!

পারিস পৌঁছে এক মস্ত হোটেলে আমরা উঠলাম। হোটেলটা দেখলাম ইংরেজে ভরা। তাদের অনেকে আবার ভারত-ফেরৎ সাহেব মেম। এ বেচারারা আমাদিগকে যে খুব স্নেহ আদরের চোখে দেখছিল, তা বোধ হল না। তবে তারা নিজেরাই বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। একদিকে চৌধুরী সাহেব বৈঠকী মানুষ, খুব জমিয়ে নিয়েছিলেন সকলের সঙ্গে। তার উপর আবার তাঁর পরিচিত এক ইংরেজ-পরিবার সেখানে ছিলেন, তাঁরা সর্বদা আমাদের নিয়েই থাকতেন। এই দলে দুটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সকলের নজর তাদের দিকে, কিন্তু তারা কারও দিকে ফিরে চাইত না। আমার হাতে এক আংটি ছিল। তার উপর লেখা, "Pensez a moi, মনে রেখো।" এক সুন্দরী সেই আংটি নিয়ে আমাকে ক্রমাগত জ্বালাতন করতে লাগলেন, "কে দিয়েছে, বলুন।" শেষ আমি বুঝিয়ে দিলাম যে ওটা আমার রক্ষা-কবচ, পরা থাকলে দেবতা-বিশেষের বাণ আমার গায়ে লাগবে না। সুন্দরীরা বললেন যে সব চেয়ে ভালো হয় আমার কপালের উপর একটা লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখলে, তা হলে কেউ কাছে ঘেঁসবে না। "কোনো গুণ নাই তার, কপালে আগুন!" এঁরা আনকোরা এসিয়াটিক ছেলে এই প্রথম দেখলেন। নূতন জীবটির, আশা করি, একটা গুণও দেখেছিলেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করার সাহস হয় নেই।

পারিসের দ্রষ্টব্য জিনিস চৌধুরী সাহেব সবই দেখালেন। কিন্তু আমার সব চেয়ে মনে লেগেছিল Place de la Bastille। অত্যাচারী বুর্বঁ রাজার সেই বিশাল দুর্গের একখানা পাথরও আজ দাঁড়িয়ে নেই। চৌমাথার উপর ভুঁইয়ে শুধু গোটা কয়েক দাগ আছে। লোকে বলে ঐ দাগের উপর দুর্গের দেওয়াল ছিল। প্রজারা ক্ষেপে উঠে হাতের নখ দিয়ে একখানা একখানা করে দেওয়ালের পাথর ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ভেরসাই, লুভরের রাজবাড়িও দেখলাম! এই দুই বাড়িতে আমি পরে এত সময় কাটিয়েছি যে এদের কথা আর-একবার ভালো করে বলব! আমার অভিভাবক আমাকে নিয়ে একটু বিব্রত হয়েছিলেন, বোধ হয়। কোথায় পারিসের

শোভা দেখে মশগুল হয়ে বেড়াব, না যত সেকালের ভূত প্রেতকে নিয়ে টানাটানি করছি। নিজেরও লজ্জা বোধ হত। কিন্তু কি করব, পারিস ও ফ্রান্স সম্বন্ধে নানা রকম romantic সংস্কার নিয়ে যে ইউরোপ এসেছিলাম!

দিন চারেক পর লণ্ডন পৌঁছলাম। স্টেশনে ডাক্তার সিংহ নিতে এসেছিলেন। তাঁর হাতে আমাকে তুলে দিয়ে চৌধুরী সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ি গেলেন। লণ্ডন ভালো লাগল না। বাড়িগুলো মনে হল যেন ইংরেজ-চরিত্রেরই অনুরূপ, খুব বড়ো, ভারী, মজবুত, কিন্তু একেবারে সৌন্দর্য-বিহীন, একটুও চটক কি জলুস নেই! তার উপর আবার এপ্রেল মাস। ঝির ঝির করে কেবল বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় কাদা। চারি দিক কেমন অন্ধকার মতন, নিরানন্দ। দু-চারদিন থাকার পর সূর্যদেবের মুখও দেখলাম, Albert Memorialএর মতো সুন্দর ইমারৎও এক-আধটা নজরে পড়ল। কিন্তু চার বছরেও কিছুতে লণ্ডনকে একটু ভালোবাসতে পারলাম না। একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন সব সময় এই শহরের মুখটাকে বিকৃত করে রেখেছে। হয়তো পারিস আগে দেখে এসেছিলাম বলেই এটা এমন করে মনে বসে গেছল।

সিংহ সাহেব আমাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন আমার লণ্ডনের অভিভাবকের বাড়িতে। তাঁদের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। তাঁরা বিলেতফেরত সমাজের লোক। কিন্তু আমাকে এমন আদরযত্ন করলেন যেন আমি তাঁদের চির-দিনের চেনা মানুষ। আমার তখন নূতনের নেশা অনেকটা কেটে গেছে, বাড়ির জন্য ভয়ানক মন কেমন করছে। মাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে এসেছি, সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এ সময় মিসেস পালিতের মাতৃস্নেহ না পেলে কি হত বলতে পারি না। হয়তো পালাতাম, ভারত সরকার একজন অতিযোগ্য সিবিলিয়ান হারাতেন!

বিলেতে এসে আমার একটা মস্ত বড়ো লাভ হল। আস্তে আস্তে কূপমণ্ডূক ভাবটা কেটে গেল। প্রথম, আমাদের বাঙালি-সাহেব সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। তাঁরাও যে আমাদেরই মতো বাঙালি, ইংরেজি কাপড় পরলেও, ইংরেজিতে কথা কইলেও অন্তরে বাঙালি, এটা বুঝতে পারলাম। তখনকার দিনে বিলেতে সবসুদ্ধ চারশো ভারতীয় লোকের বাস ছিল। তার ভেতরে অতি অল্পসংখ্যক লোক বিলেতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছলেন। বাকি সবাই আমাদের মতো কাজ উপলক্ষে এসেছিলেন, কাজ হলেই বাড়ি ফিরে যাবেন। এই চারশোর মধ্যে দেড়শো বাঙালি, দেড়শো পারসী, আর বাকি একশো অন্য সব জাত মিলিয়ে। মহিলারা অধিকাংশ

ইংরেজি ঘাঘরা পরতেন। বিলেতে শাড়ি পরে বেড়ানো তখনও রেওয়াজ হয় নেই! কিন্তু এই গাউন-পরা ইংরেজিভাষী মহিলারা আমাদের ছেলেছোকরার দলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেন, ঠিক দেশের সেকেলের গিন্নীদের মতন। সেই নিঃশব্দে একশো দেড়শো সিঙারা কচুরী ভাজা, সেই প্রসন্ন হাসি সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে, বিদায়ের সময় সেই সাদর নিমন্ত্রণ, "আবার কবে আসবে সব?" এঁদের জন্যই তো বিদেশকে বিদেশ বলে মনে হত না। বাঙালি অ-বাঙালির মাঝে তখনও দুর্ভেদ্য প্রাচীর ওঠে নেই। পাঞ্জাব-ক্লাব, মাদ্রাজ-ক্লাব, ইত্যাদিও গজায় নেই। কোনো কোনো পারসী একটু দূরে দূরে থাকতেন বটে, তা নইলে সকলের মধ্যে বেশ একটা আত্মীয়তা ছিল। Superiority complex যে মোটে ছিল না, তা নয়! বাঙালিদের বুদ্ধির ও সাহেবিয়ানার বড়াই, আর পারসীদের রঙের বড়াই কতকটা ছিল বই-কি! সময় সময় "মেড়ো, মেড়ো" শুনে কান ঝালপালাও হয়ে যেত। তবু মোটের উপর বলা যেতে পারে ভেদবুদ্ধি তখনও প্রবল হয় নেই। এমন-কি আঞ্জুমান-ই-ইসলামও জাতীয় আদর্শ একেবারে ছাড়ে নেই। অনেকেই ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাবে যেতেন। তাঁরা যে খুব প্রচণ্ড লিবারেল ছিলেন বলে এটা করতেন, তা বলা যায় না। ক্লাবটা মোটামুটি শস্তা ছিল, আর সেখানে প্রবেশলাভ করাও খুব কঠিন ছিল না। আমার মুরুব্বী লোকেন পালিত মহাশয় ঐখানেই সন্ধ্যাবেলাটা কাটাতেন। আমাকেও দুচার বার বিলিয়ার্ড খেলতে নিয়ে গেছলেন। তবে আমার অত সাহেবসুবো পোষাত না বলে নাম লেখালাম না।

আমার কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন যে আমি গণিতের অধ্যাপক মিঃ এডওয়ার্ড্‌সের বাড়িতে থাকব। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় শেষ পর্যন্ত আমাকে নিতে পারলেন না। তাই পালিত সাহেব আমার কলেজে থাকারই ব্যবস্থা করলেন। এর পর থেকে কয়েকমাস কলেজের কর্তা রেন সাহেব আমার অভিভাবক হলেন। তিনি আমাদের খুব কড়া রাশে চালাতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও ঝেড়ে ফেলে দিলাম। সে পরের কথা। ইতিমধ্যে আমার বোর্ডার-জীবনের দুই-একটা গল্প বলি।

তখনকার দিনে ভারতীয় ছাত্রেরা অর্ধেক থাকত আমাদের Bayswater অঞ্চলে, আর অর্ধেক থাকত গাওয়ার স্ট্রীটের দিকে। রেনের কলেজটা পাশাপাশি তিনখানা বাড়ি জুড়ে ছিল। সাহেব নিজে পঙ্গু ছিলেন, নড়াচড়া করতে পারতেন না। তাঁর স্ত্রী পরিবার সকাল সন্ধ্যা আমাদের সঙ্গে খেতেন। টিফিনে আসতেন না। দু-চার জন বাহিরের ছেলেও আমাদের সঙ্গে টিফিন খেত। রেন পরিবারের একজনের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সে তাঁর মেয়ে Dolly। ডলী বাপের

সেক্রেটারি ছিল, আপিসের কাজকর্ম সব করে দিত। কর্তাকে আমাদের কিছু বলবার কইবার থাকলে তাকেই মুরুব্বী পাকড়াতাম। সে হাসমুখী সুন্দরী ছিল, সবাই তাকে ভালোবাসত। রেন সাহেব নিজেও খুব ভালো লোক ছিলেন। মন বড়ো সাদা ছিল। কিন্তু বৃদ্ধের গলা কর্কশ আর কথাবার্তা বড়ো রূঢ় ছিল। আমাদের মাঝে মাঝে হুজুরে ডাক পড়ত, যেতেও হত, কিন্তু আগ্রহ কারও ছিল না। যে দোর দিয়ে আমরা আপিসে ঢুকতাম সেটা সাহেবের চৌকীর পেছনে ছিল। দোরে টোকা মারলেই যে "Come in" জবাবটা পাওয়া যেত, সেটা ঠিক পিস্তলের আওয়াজের মতো। কিন্তু ভেতরে যেতেই আগে নজরে পড়ত সেক্রেটারি সুন্দরীর মুখ। সে একটু হেসে, দরকার হলে চোখ টিপে, আসামীকে আশ্বস্ত করত। তার পর কথাবার্তা কতকটা এই রকম চলত। "ডলী, কে এসেছে?" "মিস্টার অমুক এসেছেন, বাবা।" "সামনে এসো। গুডমর্নিং। দেখি, তোমায় কেন ডেকেছিলাম।" "বোধ হয় ইতিহাসের পরীক্ষার কথা বলবে বলে।" "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্ ডলী। মনে পড়েছে। তুমি ইতিহাসে মন্দ কর নেই, প্রায় সত্তর নম্বর পেয়েছ। তাই বলে যেন আবার মাথায় হাওয়া ভরে না ওঠে। আমি নজর রাখব, বুঝলে? বেশ করে পড়াশুনো কোরো।"

একদিন হল কি, আমায় ডাক পড়াতে আমি গেলাম সাহেবের কাছে। ভেতরে ঢুকে দেখি ডলী নেই। অকূল সমুদ্রে পড়লাম। আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে ডেকেছিলেন, মহাশয়?" "হ্যাঁ, ডেকেছিলাম বই-কি! এই নাও।" বলে একখানা নিজের ফোটো আমার পানে ছুঁড়ে দিলেন। আমি ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখছি, সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখ বাপু, নিতে ইচ্ছে হয়, তো নাও। নইলে ফিরিয়ে দাও।" এর আমি কি জবাব দেব! আস্তে আস্তে বললাম, "আমাকে এটা দিন। বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব।" "না, না, তাঁকে আমি পাঠিয়েছি। ওটা তোমার। নিতে চাও তো?" আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম, তিনি সেটা ধরে খুব ঝাঁকানি দিলেন। ভদ্রলোকের জোয়ান বয়সে নিশ্চয় খুব জোর ছিল! সাহেব আমাকে সত্যি একটু ভালোবাসতেন। তবে তিনি যাদু, বাছা, বলতে জানতেন না। আর-একটা গল্প বলি ওঁর। মাস দুই পরে আমি খবর পেলাম যে আমার মা মারা গেছেন। বিদেশে বিভূঁয়ে এ রকম খবর পাওয়া কী ভয়ানক, তা সবাই বুঝবেন। তার উপর আরও মন খারাপ হল এই ভেবে যে, সামান্য যে অশৌচ পালন, সেটাও করতে পারব না। ভেবে চিন্তে কদিন শুধু রুটি মাখন খেয়ে রইলাম। মনকে বোঝালাম, যতটুকু পারা যায় সেই ভালো। কলেজে কাউকে কিছু বললাম না।

পরের মেলে রেন সাহেব বাবার চিঠি পেয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই খুব কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "আমাকে বল নেই কেন? আমাকে সব কথা জানানো তোমার কর্তব্য, তা জান না? এখানে তোমার জন্য তো আমি দায়ী!" আমি চুপ করে রইলাম। সাহেব ধমকে উঠলেন, "তুমি নিতান্ত বুদ্ধিহীন। এই ঠাণ্ডা দেশে নিরামিষ খাওয়া চলবে না। শরীরের পক্ষে খারাপ।" আমি ধীরে ধীরে বললাম, "আর তিনদিন মাত্র বাকি, মহাশয়। এর মধ্যে আর মাংস খেতে বলবেন না।" সাহেব আমার পিঠে হাত রেখে ভারী গলায় বললেন, "It is hard lines on you, boy!" বলে চশমা মুছতে মুছতে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। পরের তিন দিন আমার জন্য অজস্র দামী ফল ও ক্রীম এল। বুঝলাম, কার হুকুমে এসেছে।

পাঠককে তো আগেই জানিয়েছি আমার পলটনে কাজ করার কি রকম সাধ ছিল। বিলেত পৌঁছানোর কিছুকাল পরেই সব কাগজে খবর বেরোল যে ব্রেজিলের সুরেশ-বাবু মারা গেছেন। ও দিক তো বন্ধ হল। এখন কি করা যায়? একদিন কপাল ঠুকে রেন সাহেবকে আমার দুঃখের কথা জানালাম। তিনি বললেন, "তাতে কি হয়েছে? তুমি army পরীক্ষা দাও। তা হলে আমাদের বৃটিশ ফৌজেই চাকরি পাবে। আমি আজই ব্যবস্থা করছি।" আমার প্রাণে আশা হল। কিন্তু আশায় ছাই পড়তেও দেরি হল না। সাত দিন পরে রেন সাহেব আমাকে ডেকে, অনেক দুঃখ করে দরদ দেখিয়ে বললেন, "তোমার হুকুম এসেছে। তুমি Army পরীক্ষায় বসতে পারো। কিন্তু first (সকলের উপর) হলেও জঙ্গী কলেজে ঢুকতে পাবে না। তোমার জন্য আমার বড়ো দুঃখ হচ্ছে।" তার পর একটু গরম হয়ে উঠলেন, "এ সব ঐ হতভাগা Toryদের চালাকি। ওদের মতো সংকীর্ণ মন নিয়ে কি আর এত বড়ো বাদশাহী চালানো যায়!" বলতে ভুলে গেছি যে রেন একজন গোঁড়া Radical ছিলেন। ব্রেজিল গেল, স্যাণ্ডহর্স্ট গেল, এখন আমি করি কি? দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। ভলণ্টিয়ার হওয়া যাক। কিন্তু সে পথেও দেখলাম অনেক বাধা। আমার স্যাণ্ডহর্স্ট যাওয়ার চেষ্টাতে লোকেনবাবু সায় দেন নাই। কিন্তু ভলণ্টিয়ারী করার বিষয়ে তাঁর খুব উৎসাহ দেখলাম। তিনি নিজেও আমার সঙ্গে বন্দুক কাঁধে করবেন বললেন। অনেক খোঁজখবর নিয়ে Honourable Artillery Company বলে এক নামজাদা অভিজাত পলটনে নাম দাখিল করার জন্য দরখাস্ত করা হল। স্বয়ং যুবরাজ এই পলটনের কর্নেল, আর এদের উর্দী খুব জাঁকাল। আমাদের দরখাস্ত গ্রাহ্য হল। লোকেনবাবু রীতিমত গোলন্দাজ হয়ে গেলেন, কিন্তু আমার কিছুই

হল না। তিন কেতা উর্দীর দাম ও চাঁদা বাবদ প্রায় দেড়শো পাউণ্ড দিতে হবে। অত টাকা আমি কোথায় পাব! বাড়িতে চেয়ে পাঠালাম, কিন্তু গরিবের দুঃখ কেউ বুঝলেন না। আমার যুদ্ধ করা হয়ে গেল। ভালো মানুষের মতো ব্যারিস্টারী আড্ডায় নাম লেখালাম।

নাম লেখালাম বটে, কিন্তু প্রাণপণে বিদ্যাচর্চা করতে লেগে গেলাম বললে মিথ্যা কথা হবে। আমার এত রকম ধান্দা ছিল যে বিদ্যাচর্চার জন্য খুব বেশি সময় পেতাম না। সে সব কথা ক্রমশঃ জাহির করব। আপাততঃ অন্য একটা গল্প করি। সে সময়কার আবহাওয়া সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে। কলেজে আমার ম্যাক্ বলে এক বন্ধু ছিল। সে এবার্ডীন হতে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস করে এসেছিল। ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ, প্রাণে রস-কস বিন্দুমাত্র ছিল না। একদিন ম্যাকের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। ভদ্রপল্লী ছেড়ে Protobello Road বলে এক বস্তীর মতন মহল্লায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে কুলিমজুরের বাস। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তারা সব মেয়ে ছেলে নিয়ে ফুটপাথে পায়চারি করছে। নানা রকমের ফেরিওয়ালা চারি দিকে ভিড় করে রয়েছে। আমার কাছে পাড়াটা একেবারে নূতন, তাই ঘুরে ফিরে সব দেখছি। এমন সময় একটু দূরে একটা "Shame, Shame!" রব উঠল। চেয়ে দেখি একটি ভদ্রলোকের মেয়ে, বছর পঁচিশেক বয়স হবে, খাটো নিকার-বকার পেণ্ট্‌লেন পরে বাইসিকেল চেপে যাচ্ছে, আর দুধারি লোক তাকে দুয়ো দিচ্ছে। ম্যাকও দেখলে। দেখে ঘৃণাভরে বলে উঠল, "Shameless hussy, বেহায়া ছুঁড়ি!" মেয়েটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এই ছোটোলোকের ভিড় থেকে। ম্যাকের স্কচ্ রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমাকে বললে "Come, let us hoot her, mon—এসো, ওকে খুব দুয়ো দেওয়া যাক।" বলে খুব উৎসাহে হাত তালি দিয়ে উঠল। আমি তাকে জোর করে এক হেঁচকা মেরে টেনে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরলাম। পথে তাকে বললাম, "ম্যাক্, তুই ভদ্রঘরের ছেলে, ধার্মিক লোক, এ কি ব্যবহার তোর!" মেয়েটার উপর ম্যাকের রাগ তখনও যায় নেই। সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই সব নির্লজ্জ ছুঁড়িদের প্রশ্রয় দিলে ধর্মই বা থাকবে কোথায়, ভদ্রঘরই বা থাকবে কি করে? ভেবে দেখো, এরাই ভবিষ্যৎ বৃটনের মাতৃকুল!" এই রকম কত কি বক্তৃতা করলে। আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। দেশ ছেড়ে এসেছি বটে, কিন্তু পবিত্র সনাতনী ভাব এখানেও ধাওয়া করেছে। বাস্তবিক, ইংলণ্ডের লোকের মনে তখনকার দিনে একটা মস্ত সমস্যা ছিল যে স্ত্রীলোকের ঘাঘরা কত লম্বা হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনেক গান ছড়া মনে আসছে, বাহুল্য ভয়ে

পাঠককে উপহার দিতে পারছি না। বেচারা ম্যাক্ এখনও বেঁচে আছে কি না, জানি না। থাকে তো তার মেয়েদের আজানুলম্বিত গাউন দেখে কত না মনে কষ্ট পাচ্ছে! তার পর ভেবে দেখুন, আমাদের কালে বিলেতে মেয়ে পুরুষ এক ঘাটে কখনও স্নান করত না। যারা খুব রসিক পুরুষ, তারা তাই স্নান করতে Trouvilleএ যেত। আজ সে সব গোলযোগ নেই। ম্যাকের মেয়েরা হয়তো স্নানের পোশাক পরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বালির উপর বসে টিফিন খাচ্ছে। একটা কথা বলি— কেউ রাগ করবেন না। উনিশ শতকের ইংরেজ মেয়েরা কাপড় পরত অঙ্গ, শুধু অঙ্গ নয় অঙ্গের গড়ন পর্যন্ত, ঢাকার জন্য। সে বিদ্যাটা তারা খুব রপ্ত করেছিল। সেই গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা বেঢপ ঘাঘরা, আর গায়ে একটা ততোধিক বেঢপ লম্বা কোট পরলে সব মেয়েমানুষকেই Mrs Grundyর মতন দেখাত। আর আজ, আমাদের এই সভ্য ভব্য Grundy মেম সাহেবটি গেলেন কোথায়! না, তিনিও খাটো চুল কেটে, খাটো পোশাক পরে অঙ্গের অনুপম গঠন দেখাবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেড়াচ্ছেন ?

আমাদের কলেজে পড়ার নিয়ম ছিল রাত নটার ভেতর বাড়ি ফিরতে হবে। নটার সময় রোজ ভেতর থেকে দোরে খিল পড়ত। কেউ ঘণ্টা বাজালে, বুড়ো খানসামা হোপ দোর খুলে দিত। দিয়ে গম্ভীরভাবে বলত, "মশায়, কাল আপনার নামে রিপোর্ট করা আমার কর্তব্য, তা আপনি জানেন।" অধিকাংশ সময় কিন্তু রিপোর্ট করাটা হয়ে উঠত না। হোপ বুড়োর এই থেকে একটা বাঁধা আয় ছিল। তবু মাঝে মাঝে সে বেঁকে দাঁড়াত, আর অধর্ম করবে না! তখন কিছুদিন আমাদের গবাক্ষপথে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হত। হোপ লোকটা বড়ো ভালো ছিল। দিনের বেলায় খুব গম্ভীর গজেন্দ্রগমনে চলাফেরা করত। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় যখন দোর খুলে দিতে আসত, তখন মুখে বেশ একটা রঙিন ভাব দেখা যেত। এমন-কি, কখনো কখনো দাঁড়িয়ে দু-পাঁচ মিনিট হালকা খোশগল্পও করত। আগেই বলেছি Wren গিন্নি আমাদের সঙ্গে টিফিন খেতেন না। টিফিন ব্যাপারটার অধ্যক্ষ ছিল মিস্টার হোপ। তার "Luncheon is on the table, young gentlemen," বলার কায়দা কি! আমরাও যথাসম্ভব তার মর্যাদা রক্ষা করতাম। টেবিলে বেশি গোলমাল করতাম না। কিন্তু একবার হল কি, দিন-কয়েক ধরে বড়ো খারাপ মাংস টিফিনের টেবিলে আসতে আরম্ভ হল। হোপকে বারবার বলেও কোনো ফল হল না। তখন একদিন আমাদের দলের চাঁই M. তার মাংসের প্লেটটা তুলে নিয়ে জানালা পর্যন্ত কাওয়াজ করে গিয়ে, "Here goes," বলে বাহিরে ফেলে দিলে ছুঁড়ে। আমরা বাকি সবাই দাঁড়িয়ে

উঠলাম, হুর্‌রে বলে! হোপের মুখে কথা সরল না। দুবার তিনবার Sir, Sir, করে বুড়ো বেচারা কেঁদে ফেললে। কত বড়ো বড়ো ঘরে কাজ করেছে সে। এ রকম অপমান তার স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু জগতের গতিই তো এই! অত্যাচার অবিচার তিলে তিলে জমে যখন একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন মানুষ ভব্যতার মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিধানের জন্য। M.এর অসমসাহসিক কাজের ফলে কিন্তু কেলেঙ্কার হল অশেষ রকমের। প্রথম, আমাদের সবাইকে গাঁটের পয়সা খরচ করে টিফিন খেতে হল বাহিরে কাফিখানায়। দ্বিতীয়, হোপ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এক চিঠি লিখলে মনিবকে। তৃতীয়, চায়ের পর আমাদের সবায়ের ডাক পড়ল বড়ো সাহেবের কামরায়। রোস্ট মাংসের চাপড়াটা আনা হল সেইখানে। M. রেন সাহেবকে সেটা দেখিয়ে একটা ছোটোখাটো বক্তৃতা করলে। বক্তৃতার শেষ বাক্য, "The article is more useful as a geological specimen than as human food." সাহেব কোন্ রকমে হাসি থামিয়ে বললেন, "Shut up. Go away, you greedy fellows." এর পর থেকে কিন্তু টিফিনে মাংস খুব ভালো আসতে লাগল। আমরা চাঁদা করে হোপকে এক গিনি বকশিশ দেওয়াতে সে ইস্তফা পত্র ফিরিয়ে নিলে। গোল মিটে গেল। তবে Wren গিন্নী দিন দুই তিন খুব মুখ ভার করে রইলেন। ডলী আমাদের খুব ধমকালে, "তোমরা মাকে না বলে হোপের উপর জুলুম করতে গেলে কেন?" M. ছোকরা বড়ো জ্যাঠা ছিল—সে বলে উঠল, "সুন্দরী, তোমার চরণে আমরা সবাই হেঁট মাথা হয়ে মাফ চাচ্ছি।" অনেক বছর পরে এই M-কে বেঁটে মোটা, গাল ফুলো, কমিশনার সাহেব রূপে দেখে সমস্ত গল্পটা মনে পড়ে গেছল। বহু কষ্টে হাসি চেপে ছিলাম।

আমি লণ্ডনে গিয়েই কলেজে বোর্ডার হয়ে গেলাম বলে স্বদেশী বন্ধুবান্ধব জুটতে একটু দেরী লাগল। পালিত, চৌধুরী, সিংহ সাহেব প্রভৃতি বয়স্থ লোকের সঙ্গে প্রথমেই আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের কাছে ঘেঁষতে সংকোচ হত। অবশ্য মিসেস পালিতের কাছে লুচি পোলাও খেতে সময় পেলেই দৌড়তাম। আমার এক বাল্যবন্ধু শীল মেডা ভেলে এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা ধর্মে ক্যাথলিক ছিলেন, আর ইউরোপের অন্যান্য ক্যাথলিক জাতের মতোই খুব মিশুক ছিলেন। তাঁদের বাড়ি বহুকাল পর্যন্ত ফি শনিবারেই যেতাম। গেলে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতাম। গিন্নী প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন, "এ তোমার বন্ধুর বাড়ি। এখানে ঘরের ছেলের মতো যাওয়া আসা করবে।" এক রকম ঘরের ছেলের মতনই হয়ে গেছলাম। এঁদের বাড়িতে বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল, আর বেশ

একটি বাগান ছিল। কাজেই সময় সহজেই কেটে যেত। অন্য পাঁচজন ভদ্রলোকের যাওয়া-আসাও ছিল। কখনো কখনো বাগানে চা-পার্টি হত। এখানে নিয়মিত গিয়ে ইংরেজ ভদ্রসমাজে মেশা অভ্যাস হয়ে গেল। নইলে প্রথম প্রথম লজ্জা করত বই কি! আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর মুশকিলই তো ছিল ঐখানে। অনেকে Miss Manning-এর বিখ্যাত N. I. A-র সান্ধ্য সম্মিলনীতে যেত। সেখানে যত হোমরা-চোমরা ভারত-ফেরত ইংরেজ জমায়েত হতেন, আর প্রাণ ভরে তাদের পিঠ চাপড়াতেন। বন্ধু শীলের বাড়িতে সুবিধা এই ছিল যে কালা আদমি বলে কেউ হেনস্তাও করত না, পিঠও চাপড়াত না।

অল্পদিনের মধ্যে Summer (গ্রীষ্ম) এসে পড়ল। এই Summerই এদের যথার্থ মধুঋতু। Springএর চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর। আকাশ পরিষ্কার। চারি দিকে যেন ফুলের মেলা লেগেছে। পার্কে বাগানে সর্বত্র দলে দলে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের মুখে হাসি। দীর্ঘ বেলা, সাড়ে আটটা নটা পর্যন্ত বাহিরে আলো। দৈনিক কাজকর্ম সেরে মানুষ অনেকক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করে ঘুরে বেড়াতে পারে। এই তিন মাসের ইংরেজ, আর বাকী ন মাসের ইংরেজে অনেক তফাৎ। তবে এ-সব সেকালের কথা। তখনও ইংরেজি সমাজ neurosisএর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নেই। তখন এদের ধাত ছিল phlegmatic (কফপ্রধান)। বায়ুর প্রকোপ ছিল না।

আমাদের কলেজ তিন হপ্তার জন্য বন্ধ হল। আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে। বিলেতের পাড়াগাঁ দেখার জন্য বড়ো ব্যস্ত হয়েছিলাম। রেন সাহেব আমাকে ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলেন টেম্‌স্ পারে গোরিং বলে এক গ্রামে। সেখানে পেনী নামে এক farmer (কৃষক) ছিল। সে গোঁড়া লিবারেল ছিল, তাই রেন তাকে বড়ো শ্রদ্ধা করতেন। তার বাড়ি তিন হপ্তা থাকব ঠিক হল। আমার বিলেত সম্বন্ধে জ্ঞান এত কম ছিল যে ফার্স্ট কেলাসের টিকিট কিনে রওয়ানা হলাম। ঐ পথেই উইণ্ডসারের রাজবাড়ি। কাজেই গার্ড সাহেব ধরে নিলেন যে আমি সম্রাজ্ঞী সন্দর্শনে যাচ্ছি। আমি বুঝিয়ে বললাম যে কোথায় যাচ্ছি। তবু সেলামের ঠেলায় অস্থির হয়ে উঠতে হল, আর বকশিশ বাবৎ মব্‌লক পয়সা বেরিয়ে গেল। গোরিং স্টেশন পৌছুতেই গার্ড স্বয়ং জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়ে স্টেশন-বাবুকে বলে দিলে, "ইনি পেনীর ফার্মে (খামারে) যাবেন। গাড়ি ডাকিয়ে পাঠিয়ে দিন।" গাড়ি কোথায় পাবে বেচারা! ট্রেন বেরিয়ে গেলে বললে, "আপনি একটু বসুন, আমি ফার্ম থেকে গাড়ি আনাচ্ছি।" এমন সময় আমি দেখলাম যে এক টাকমাথা, টুকটুকে লাল মুখ,

সাদা দাড়ি, গোঁফ কামানো, বুড়ো দাঁড়িয়ে রয়েছে টিকিটঘরের কাছে। আমাদের হোপের মতো দেখতে, শুধু পোশাক আলাদা। পায়ে গেটার, গায়ে চৌখুপী কম্বুলে কাপড়ের লম্বা কোট, টুপিটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ভরসা করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ফার্মার পেনী, না? গুড মর্নিং, আমি এসেছি।" বুড়ো আমার হাতটাকে খুব নাড়া দিয়ে বললে, "আপনি মিস্টার রেনের বিদেশী বন্ধু, না? আসতে আজ্ঞা হোক।" মুটের মাথায় জিনিস তুলে দিয়ে চললাম ফার্মের পথে।

ফার্ম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এর নাম চাষার খামার বাড়ি! ফটক থেকে বাড়ি পর্যন্ত লাল কাঁকরের রাস্তা, দুধারে আপেল বাগান। বাড়িটি ঝকঝকে নূতন, পেনী নিজে মজুর লাগিয়ে তৈরি করেছে। হল্-এ ঢুকেই ডান দিকে আমার বসবার ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাবুলোকের ব্যবহারের উপযোগী আসবাব-পত্র দিয়ে সাজানো। বাঁ দিকে রান্নাঘর। পেনী-পরিবার সেইখানে খাওয়া-দাওয়া করে। রান্নার চুলো, বাসন-কোসন, টেবিল, তাক, সব তকতক করছে। আমাদের হিঁদু বাড়ির রান্নাঘরও এককালে এইরকম ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল। এখন আর নেই। সে কথা যাক। পেনীর রান্নাঘরের অধিষ্ঠাত্রী বেরিয়ে এলেন মেয়েদুটিকে নিয়ে। তিনজনেই অতিথিকে খাতির করবার জন্য পরিষ্কার ছিটের গাউন পরে রয়েছেন। গিন্নী আমাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আপনি আসবেন শুনে আমাদের বড়ো আনন্দ হয়েছিল। আমরা কখনও বিদেশী ভদ্রলোক দেখি নেই। যা দরকার, চেয়ে চিন্তে নেবেন।" মেয়েরা বললে, "আপনার জন্য আমরা কেক তৈরি করছিলাম। আপনি কেক খান তো?" দেখলাম এরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে, আমি সাধারণ ইংরেজ ছেলের মতোই খাই দাই, থাকি। যতটা পারি অভয় দিলাম। আমার শোবার ঘর দোতলায়। সে ঘরেরও সাজসজ্জা দেখলাম সাদাসিধে কিন্তু পরিষ্কার। তার পর মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে সমস্ত ফার্ম দেখে এলাম। তখন ক্ষেতে কিছু শস্য ছিল না বটে, কিন্তু ফলবাগান ফলে ভরা। বড়ো বড়ো গোরু রয়েছে গোয়ালে। অজস্র হাঁস, মুরগি, পেরু। কিন্তু সব চেয়ে তোয়াজ দেখলাম শুয়োরের। সে শুয়োরের সঙ্গে আমাদের দেশের ঐ নামের নোংরা জন্তুগুলোর তুলনাই হয় না। এদের শুয়োরগুলো যেন মোটা মোটা প্রকাণ্ড খরগোস। নানারকম রঙের, আর কি পরিষ্কার! আমাদের গোরুর গাও এত পরিষ্কার নয়। বসে বসে বিট, গাজর, শালগম, এই-সব খাচ্ছে। মেয়েরা বড়াই করে বললে, "আমাদের ফার্মের হ্যাম বেকন খেয়ে দেখবেন। এ রকম লণ্ডনেও পাওয়া যায় না।" সব ঘুরে ফিরে এসে সেদিন পেনী-

গিন্নীর কাছে চা খেলাম। মা মেয়েরা তিনজনেই চমৎকার সরল, যেমন চাষার মেয়ে সব দেশেই হয়। চকোলেট কেকটা সাদাসিধে কিন্তু সুন্দর লাগল। Home made কেকের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। সন্ধ্যার সময় পেনীর ছেলে এল। সে বিয়ে-থা করে গাঁয়ে মুদীর দোকান করেছে। দোকান-ঘরের দোতলায় থাকে। বাপ-মার সঙ্গে খুব ভাব। তবু আলাদা থাকে কেন, তখন বুঝতে পারি নেই। ক্রমশ জানলাম, এই ও দেশের প্রথা। প্রথাটা নিতান্ত মন্দ নয়। গোরিং গাঁ-টি খুব ছোটো। তবে ইস্কুল আছে, গির্জা আছে, ডাকঘর আছে। ডাকঘরের আলাদা বাড়ি নেই। এক মেঠাইয়ের দোকানে ডাক-অফিস, আর সেই দোকানওয়ালী ডাক-মাস্টার।

পরদিন আমার এক বন্ধু লণ্ডন থেকে এলেন। দুজনে গ্রামে গিয়ে ক্রিকেট খেলার বন্দোবস্ত করে এলাম। চারি দিকের ফার্মের মজুর ছোকরারা গাঁয়ের গোচারণ মাঠের এক কোণে খেলত। তাদের খেলার সরঞ্জাম একটু মেঠো রকমের ছিল। আমরা এই ছোকরাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে রেডিং থেকে নূতন ব্যাট, বল, সব আনালাম। যতদিন ছিলাম, এদের সঙ্গে প্রায় রোজ ক্রিকেট খেলতাম। খেলার প্রয়োজনও যথেষ্ট ছিল। ফার্মের তৈরি হ্যাম বেকন, তাজা ডিম, তাজা মাখন ক্রিম সামনে পেয়ে লোভ সংবরণ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই একটু ব্যায়াম না হলে চলে কি করে! আমরা ডাকঘর থেকে এক-এক ঠোঙা মেঠাই কিনে রোজ গ্রাম প্রদক্ষিণ করতাম, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করার জন্ত। দু-চার দিনেই তাদের সঙ্গে খুব আলাপ জমে গেল। আর এক নিয়ম আমরা করেছিলাম। গ্রামের থেকে কাউকে না কাউকে রোজ ডিনার খেতে ডাকতাম। স্ত্রীলোক কেউ এলে মিসেস পেনীও বসতেন। কিন্তু প্রধানতঃ পুরুষরাই আসত। এই রকমে চাষা, কারিগর, দোকানদার, সকলের সঙ্গেই কতকটা ঘনিষ্ঠতা হল। একদিন আমাদের ফার্মার পেনীও খেলেন! এমনি তো আমরা প্রায়ই রান্নাঘরে টিফিন খেতাম! তখন পেনীরা নিত্যকার পোশাকেই বসতেন। কিন্তু মিস্টার পেনী যেদিন খানা খেতে এলেন, সেদিন লম্বা কালো কোট, শক্ত খাড়া কলার, কালো বার্নিস-করা জুতো, এই-সব পরেছিলেন। বোধ হয়, ভদ্রলোকের বিয়ের সময়কার কাপড়, গায়ে বড্ড আঁট হয়ে বসেছিল। নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছিল। কেননা, খাওয়ার পর ঝাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে কাপড় বদলে রোজকার Corduroy পরে এসে তবে সুস্থির হয়ে পাইপ ধরিয়ে বসলেন। গল্প করতে করতে যখন শুনলেন যে আমি বাঙালি হিন্দু, তখন বললেন, "তা

হলে তো আপনার একটা জিনিস দেখা উচিত। এখান থেকে পাঁচ কোশ দূরে এক বড়ো ইঁদারা আছে। তার নাম Rajah's Well। বাংলা দেশের রাজা সেই ইঁদারা করে দিয়েছেন। আমরা বললাম, "চলুন-না, কালই যাওয়া যাক সেখানে।"

পরদিন গেলাম সেই কুয়ো দেখতে। পেনী-গিন্নী নোনা শূকর মাংস, রুটি, মাখন, পনীর, বেঁধে দিলেন সঙ্গে। ফার্মার বলেছিল পাঁচ কোশ পথ। কিন্তু তেরো-চৌদ্দ মাইলের এক হাত কম হবে না। চাষাদের কোশ-জ্ঞান দেখছি সব দেশেই এক রকম! যাই হোক, বুড়ো হাঁটল কিন্তু সমানে আমাদের সঙ্গে। বেলা বারোটায় আমাদের গন্তব্য গ্রামে পৌঁছলাম। খোঁজ নিয়ে কুয়োর কাছে গেলাম! দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার। চুড়োওয়ালা সুন্দর হাওয়া-খানা। তার ভেতর বসবার বেঞ্চি পাতা। মাঝখানে এক গভীর ইঁদারা। শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে যে কাশী-নরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ এই ইঁদারা বেঁধে দিয়েছেন। চৌকিদার এলে তার কাছ থেকে এক ছোটো বই ও গোটাকয়েক মেডেল কিনলাম। বই থেকে ইতিহাস জানা গেল। এই গ্রামের এক সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজের কিছু উপকার করেছিলেন। মহারাজ পুরস্কার দিতে গেলেন, কিন্তু ভদ্রলোক নিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর এতদূর রাজী হলেন যে পরে তাঁর কিছু অভাব হলে জানাবেন। কিছুকাল পরে নিজ গ্রামে ফিরে ভদ্রলোক দেখলেন যে সেখানে বড়ো জলকষ্ট। মহারাজকে জানালেন। তিনি অনেক খরচপত্র করে, তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, এই ইঁদারা করে দিলেন। আমরা বেঞ্চে বসে ভোজন সেরে নিলাম। জল বড়ো মিষ্টি লাগল। লাগারই কথা। ও জলের সঙ্গে যে ভারতের হৃদয়ের যোগ আছে!

৯

বিলেত সম্বন্ধে রং চড়িয়ে প্রবন্ধ লেখা আমার পক্ষে বড়ো কঠিন। ও দেশের সভ্যতা কখনই তেমন রপ্ত করতে পারি নেই। পারি নেই বলেই হয়তো আমার মনের ভাব কতকটা সেই কথামালার আঙুর-লুব্ধ শেয়ালের মতন। কপালের ও-আঙুরে অনেকেই মিষ্ট রস পেয়েছেন। আমি সে রসে বঞ্চিত।

তবু পাঠক যেন দয়া করে ধরে নেবেন না যে আমার মনের অবস্থা, 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।' সাহেবদের অনেক গুণ আমার টেরা চোখকেও

এড়াতে পারে নেই। সেগুলোর কথা অবশ্য বলব। তবে সেখানেও গলদ অনেক। আমি যা দেখেছিলাম, সে সব তো আজ নেই। শুনতে পাই, ইংরেজ তার সাবেক রোস্ট বিফ ও বিয়ারের সভ্যতা ছেড়ে snacks and cocktail-এর পন্থা নিয়েছে। Snacks and cocktail-এর বাংলা তর্জমা করতে পারলাম না। চাট ও মদ বললে অনেকে চটবেন। মোটের উপর, বোধ হয়, আমার এখনকার কথা বেশি কিছু না বলাই ভালো, কেননা পুরানো মানুষ পুরানো কথা লিখতে বসেছি।

আমাদের কালে ইংরেজ সত্যিই Punch পত্রিকার জন বুলের মতন ছিল। পোশাকের কথা বলছি না, কারণ ও পোশাক তখন চলে গেছে। কিন্তু চরিত্রে বিশেষ কিছু তফাৎ হয় নেই। একটু বুদ্ধিহীন, একটু হাঁদা, আর পুরোদস্তুর একগুঁয়ে। চটক নেই, লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ে না, তবে এক কথার মানুষ। তাদের বাড়ি ঘর দোর, তাদের সমাজ, তাদের রাষ্ট্র, সব নিরেট পোক্ত ভিতের উপরে তৈরি। তোতাবুলি দরকার মতো আওড়ায়, কিন্তু হুজুগে পড়ে নিজের নাক কান কাটে না। এক কথায় অজ-bourgeois, বিংশ শতকের জুজু!

কিন্তু এই ইংরেজকে আমার ভালো লেগেছিল। এদের ঘর-বাড়ি ছিল। এরা হোটেলে হোটেলে ঘুরে ব্যাণ্ডের তালে খানা খেয়ে বেড়াত না। আড্ডায় আড্ডায় নিত্য নূতন উত্তেজনা খুঁজে বেড়াতে হত না। এদের সত্যি বনেদী ঘরে পর্যন্ত কতকটা ছা-পোষা গেরস্তের ধরণ-ধারণ ছিল। বাড়ি ছিল, বাড়ির উপর টান ছিল, তাই এদের অতিথি-সৎকারও আশ্চর্য সুন্দর ছিল। খানার টেবিলে গিন্নী সামনে একটা হাঁড়ি নিয়ে বসে সুরুয়া পরিবেশন করতেন, কর্তা রোস্ট মাংসের চাংড়া থেকে বেছে বেছে ফালি কেটে সবায়ের পাতে দিতেন। চায়ের টেবিলে অতিথির জন্য একটা না একটা কিছু ঘরের মেয়েদের তৈরি খাবার থাকত। আমাদের ছেলেবেলা থেকে পরিচিত একটা হৃদ্যতা, আনন্দের ভাব, সে দেশেও সর্বত্র দেখতে পেতাম।

কলেজে রেন-গিন্নী স্বয়ং চা ঢেলে দিতেন, সুরুয়া পরিবেশন করতেন, প্লেটের উপর খাবার তুলে দিতেন। আমার ব্যারিস্টারি আড্ডায় (Gray's Inn) চার-চার জনে এক-এক Mess করে খেতে বসতে হত। তার মধ্যে একজন হত কাপ্তান। সেই অতিথি-সৎকারের অভিনয় করত। নিতান্ত ভেটেরাখানা না হলে চাকর দিয়ে খাবার পরিবেশন হত না। অবশ্য রাজা-রাজড়ার কথা আলাদা। তাঁদের বাড়িতে কি হত, আমি কোথা থেকে জানব!

নিত্যকার ব্যবহারেও ইংরেজ ভদ্রলোকের আদব-কায়দা আমার বড়ো ভালো

লেগেছিল। ফরাসিদের মতন কথায় কথায় মাথা নিচু করা কি টুপি তোলা, চোস্ত জবানে আলাপ করা, এদের না থাকলেও একটা গম্ভীর নির্বাক খানদানী চাল সব কাজে দেখা যেত।

ইংরেজের আর-একটা গুণ নিতান্ত অন্ধ ছাড়া সবাই দেখতে পেত। সেটা ওদের অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য। ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ, আমাদের কাব্যেই আছে, ঘরে নেই। ওদের ভদ্রসমাজে কিন্তু শতকরা পঁচিশ জনের বেলা ঐ বর্ণনা খাটে, অন্ততঃ আমার সময়ে খাটত। তাদের পাশে আমাদের অধিকাংশ কৃষ্ণকায়কে হাস্যাস্পদ দেখাত, বিশেষ করে যখন আখাড়ায় কি সমুদ্রের ধারে গা খুলতে হত। এমন-কি জার্মান ও ফরাসি সাহেব যারা সব রকমে ইংরেজের সমকক্ষ, তারাও এ বিষয়ে ইংরেজের তুলনায় অনেক নিরেস। কেন যে এমনটা হয়েছে বলা শক্ত। অনেক ইংরেজের মুখে শুনেছি যে এই দৈহিক আদর্শ তারা সাবেক গ্রীকদের কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু এত লোক থাকতে শুধু এরাই গ্রীক আদর্শ পেলে কোথা থেকে।

আমি তো ইংরেজের রূপ নিয়ে এতটা উৎসাহ দেখাচ্ছি, কিন্তু একজন সাহেব নিজে কি বলে গেছেন সেটাও প্রণিধানযোগ্য। সেকালের নামজাদা মুসাফের লিভিংস্টোন সাহেব কাফ্রীদেশের জুলুদের দেখে লিখে গেছেন, এদের শরীরের গড়ন এত চমৎকার যে এদের সাক্ষাতে পোশাক খুলতে আমার ভয়ানক লজ্জা বোধ হয়।

পুরুষের কথা যখন এত বললাম, মেয়েদের কথাও কিছু বলতে হয়। তবে আমার ঘাড়ে একটা বই মাথা নেই। কালো চোখের সঙ্গে নীল চোখের তুলনা আমি করতে পারব না। কালো কুন্তলের সঙ্গে লাল হলদে কুন্তলের তুলনা করতে আমি অক্ষম! কবির কথায়, 'তোমরা সবাই ভালো'। তবে এইটুকু শুধু বলব যে, সে যুগের ইঙ্গসুন্দরীদের চলাফেরাতে একটু আড়ষ্ট ভাব ছিল, একটু যেন কমনীয়তার অভাব নজরে পড়ত। এ বিষয়ে তাঁরা ফরাসি সুন্দরীদের চেয়ে অনেক খাটো ছিলেন। তেমনই complexion বা চামড়ার সৌন্দর্যেও ইংলণ্ডীয়ারা হার মানতেন। ছোটো জাতের ফরাসিনীদের চামড়াও এদের চেয়ে বেশি চিকন মোলায়েম ছিল। এ কথা সবাই নাও মানতে পারেন। যাঁদের চোখে চামড়ার রংটাই সব, তাঁরা অবশ্য ইংরেজকে prize দেবেন, কেননা বেশির ভাগ ফরাসিনীর রং ঠিক সাদা নয়, খুব ফিকে একটু গজদন্তের আভা আছে। বর্ণ-সম্বন্ধে আমার নিজের মতামত কতকটা কাফ্রীদের মতন। বিকট সাদা রং আমি দেখতে পারি না। তার চেয়ে নিখুঁত কালোও আমার ঢের ভালো লাগে। যখনই ইংরেজের সঙ্গে গা

খুলে ঘুরেছি, তখনই মনে হয়েছে যে ওদের ঐ সুন্দর সুঠাম শরীর আরও কত সুন্দর হত যদি অমন ফ্যাককেকে সাদা না হত। রোদে পুড়ে ওদের মুখের রং কেমন চমৎকার হয়ে যায়, গাটা কেন হয় না!

কি কথা বলতে কোথায় এসে পড়লাম। স্ত্রীলোকের রূপের কথা হচ্ছিল। সে সৌন্দর্যের আদর্শ যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে। মরালগামিনী বললে এখন আর বোধ হয়, কোনো অর্থবোধ হয় না। চকিতনয়নী কথাটাও লোপ পেয়েছে, কেননা আর তো কেউ চকিত হয় না! লতার মতো দেহযষ্টি, সেও আর শোনা যায় না। এক রইল লাঠির মতো দেহযষ্টি। সেটা যে যায় নেই, তা আমরা পথেঘাটেই দেখতে পাই। বিলেতের কথা বলছি, সুতরাং এদেশের কেউ রাগ করবেন না।

রূপের কথা বলতে গেলে এটা ভুললে চলবে না যে সভ্যজগতে রূপ অনেকটা বেশ-প্রসাধনের উপর নির্ভর করে। আমার সময়ে পুরুষের কাপড় এক ইংরেজ দরজিরাই কাটতে জানত। তেমনই আবার মেয়েদের কাপড় পারিস ছাড়া কোথাও হত না। ভিয়েনাতে কতক কতক হত। এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। যখন মার্কিন আর স্পেনে লড়াই বাধল, আর স্পেনের রাজা হেরে যেতে লাগলেন, তখন তাঁর উপর ফরাসিদের দরদ উথলে উঠল। পারিসের খবরের কাগজগুলো দিবারাত্র পৃথিবীকে এই বোঝাতে লাগল যে, ভুঁইফোঁড় মার্কিনরা জবরদস্তি করে একটা নির্বিরোধী বনেদী বংশের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে, আর তাদের বেইজ্জৎ করছে। মার্কিন কাগজগুলো চটে ফরাসিদের শাসাতে আরম্ভ করলে যে, পারিস শহরের দরজীরা মার্কিন অন্নে পরিপুষ্ট, এইবার তাদের জব্দ করব, আমরা ভিয়েনাতে কাপড় করাব। ফরাসি কাগজওয়ালারা পালটা জবাব দিলে যে, মার্কিনীদের যা গড়ন, ওদের গায়ে কাপড় বসানো পণ্ডশ্রম, মজুরী পোষায় না। যা হোক এ-সব অসভ্য কথা-কাটাকাটির কোনো ফল হল না, কেননা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার কিছু দিন পরেই মার্কিন সুন্দরীরা কাপড় করাতে দলে দলে আবার পারিসেই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলেন। ভিয়েনার কিছু সুবিধা হল না।

আমার নিজের গল্প আবার ধরি। শরৎকালে মাস চারেকের জন্য কলেজ বন্ধ হয়। ছুটিটা কোথায় কাটাব, এই নিয়ে নানা জল্পনা করতে লাগলাম। বাবার পরিচিত এক ইংরেজ পরিবার নিমন্ত্রণ করলেন, তাঁদের কাছে দূর পাড়াগাঁয়ে মাসখানেক কাটাবার জন্য। কিন্তু যেতে সাহস হল না। বিলেতে বসে ইঙ্গ-ভারতীয় আবহাওয়া সহ্য করতে পারব কি না, কি বলতে কি বলে ফেলব, তারাই বা কি ভাববে, কাজ নেই, ভেবে নিমন্ত্রণ নিলাম না। ফরাসি ভাষা শিখছিলাম

সেটা রপ্ত করার মতলবে পারিস চলে গেলাম। কপাল জোরে এক মধ্যবিত্ত ফরাসি পরিবারের মাঝে থাকবার সুযোগ মিলল। খুব ভালো লাগল। তাদের আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। মোটের উপর দেখলাম, যে ফরাসিদের চাল-চলন একটু একটু আমাদের মতন। হো হো করে হাসে, চেঁচিয়ে কথা কয়, ভুঁড়ি দুলিয়ে চলে, পেটুকের মতো খায়। কালো সাদার ভেদজ্ঞান ওদের ইংরেজের মতো প্রখর নয়। ইংলণ্ডে আমরা রাস্তায় বের হলে যেমন সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকত, ছোঁড়াগুলো 'Blackie, Blackie,' বলে চেঁচাত, পারিসে তা মোটে দেখি নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সের কি স্পেনের অনেক লোকের মুখের রং এত কালো বা পাটকিলে, যে হঠাৎ তাদের সঙ্গে ভারতীয় লোকের তফাৎ বোঝা যায় না। তাই, বোধ হয়, আমাদিকে ততটা আজগুবি দেখাত না ওদের চোখে। তবে সহ্যের একটা সীমা আছে তো! একদিন এক দল কাফ্রী মুসলমান তাদের স্বদেশী পোশাক পরে সরকারী বাগানে বেড়াচ্ছিল, আর খুব হাল্লা করে নিজের ভাষায় কথা কইছিল। এক দল রাস্তার ছোঁড়া খানিক ক্ষণ চেয়ে দেখলে, তার পর তাদের পিছু নিলে, আর হাততালি দিয়ে 'boule de neige' (snow ball) বলে ঠাট্টা করতে লাগল। কাফ্রীরা চুপ করে গেল।

ইংলণ্ডেও যে আমাদের অপমান করবার ইচ্ছাতে কালা বলে ডাকত, তা আমার মনে হয় না। অত বড়ো সাম্রাজ্যের মালিক হলেও, ইংরেজের তখনকার দিনে বড্ড কুনো ভাব ছিল। একটা-কিছু আজগুবি দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। বোধ হয়, বুঝতও না যে ওটা অভদ্রতা। আমাদের কেউ কেউ কিন্তু এতটা না বুঝে ভয়ানক চটে উঠতেন। সিং বলে আমার এক বিশালকায় বন্ধু ছিল। অত্যন্ত ভালো মানুষ। ইংরেজি বেশি বলতে পারত না। জিমিদার ঘরানার আওলাদ, ম্যাট্রিক কোনোক্রমে পাস হয়েছে, ইজ্জৎকে লিয়ে তার লায়ার হওয়ার খাহেশ, নইলে ঘরে টাকার অভাব নেই। দুজনে আমরা রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমনসময় এক বছর-কুড়িকের কুলি ছোঁড়া 'কালা' বলে ডেকেছে। যেই ডাকা কি সিংজি এক হাত বাড়িয়ে বেচারার ঘাড় ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেললে। তুলে নানা রকম গালিগালাজ করতে লেগে গেল। আমি বন্ধুর হাতে পায়ে ধরে কত কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করে বাড়ি নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করলে না যে লোকটা ইচ্ছে করে আমাদিগকে অপমান করতে চায় নেই।

আর এক দিন হল কি, আমরা তিন জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি উলউইচ শহরে। তিন জনেরই ঘোড়সওয়ারী পোশাক, হাতে চাবুক। এক শুঁড়ীর দোকানের পাশ দিয়ে চলেছি! এমন সময় একটা প্রকাণ্ড Navvy (কুলি মজুর) বলে উঠল,

"হ্যালো, ব্লাকী!" আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেঁটে, রোগা, তিনি তৎক্ষণাৎ "হারামজাদা!" বলে গর্জন করে লোকটার মুখের উপর মারলেন চাবুক। সাদা একটা দাগ পড়ে গেল বেচারার লাল টকটকে মুখে। সে দু-তিন বার ঢোক গিলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "এ কি রকম ব্যবহার, এ কি জুলুম!" লোকটা ইচ্ছা করলে আমাদের তিনজনকেই ধরাশায়ী করতে পারত পাঁচ মিনিটে। যাই হোক, আমি তার পিঠ চাপড়ে একটা শিলিং বকশিশ দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। সে বার বার বললে, "আমি কি দোষ করেছি, কি দোষ করেছি?" আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রায় ঝগড়া হয়ে গেল এই ব্যাপার নিয়ে। তিনি আমায় কাপুরুষ, দেশদ্রোহী, ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন।

আর একদিন, দূর দেহাতে আমি অনেকখানা বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে গাঁয়ে ফিরছি, এমন সময় দেখি এক চাষা তার গাড়িতে ঘাস বোঝাই করে চলেছে। আমি বললাম, "আমাকে গাঁয়ে পৌছে দেবে হে?" সে টপ করে লাফিয়ে ভুঁইয়ে নেমে টুপি তুলে বললে, "গুড্ ইভনিং, ব্লাকী। আসুন, নিশ্চয় পৌছে দেব।" লোকটা আমাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিলে, এক পয়সাও নিলে না। কি করে মনে করব যে সে আমাকে অপমান করবার জন্য কালা আদমী বলেছিল?

আর এক রকমের একটা গল্প বলি। সেখানেও পাঠক দেখবেন যে অপমান করার চেয়ে ছেলেখেলা করবার ইচ্ছাটাই বেশি। আমরা সব খানা খাচ্ছি আমাদের Inn-এ। আমার বন্ধু সিং আর আমি এক মেসে বসেছি। অদূরে এক মেসে পল পীটার পিলে নামে এক মাদ্রাজী বন্ধু খাচ্ছেন। পিলে ভদ্রলোকটি খুব কালো, ছোট্ট, আর পেট মোটা। লম্বা গলাবন্ধ কোট পরতেন। মাথায় খুব জলজ্বলে লাল সোনালী পাগড়ী। মুখটি বিশেষ বুদ্ধিমানের মতো নয়। মহাজন সভার প্রতিনিধি হয়ে বিলেত এসেছেন। সেই সুযোগে ব্যারিস্টার হওয়ার কাজটাও কতক এগিয়ে রাখছেন। সাহেবদের সঙ্গে কথা কওয়ার সময় বড়ো অমায়িক হাসি হাসতেন। ইংরেজ ছেলেরা তাঁর যে নামটা দিয়েছিল সেটা খুব সম্মানসূচক নয়। হঠাৎ একজন ছোকরা পিলের পাগড়ীটা টপ করে তুলে নিয়ে চালিয়ে দিলে আর একজনের কাছে। দেখতে দেখতে পাগড়ী চলে গেল বহু দূর। বেচারা দাঁড়িয়ে উঠে "My turban, please," বলে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। সবাই হেসে উঠল। কিন্তু বন্ধু সিং রক্তচক্ষু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, রোস্ট কাটার ছোরাটা হাতে নিয়ে। অস্ত্র তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার পাগড়ীতে যদি কেউ হাত দিত তো—"। পিলের পাগড়ী ফিরে এল দু মিনিটে। আমি সিংজির কোটের ল্যাজ ধরে টেনে বসিয়ে দিলাম। সে তখনও

রাগে ফুলছে, "পাগড়ী খুলে নেওয়া আর মাথা কেটে ফেলায় তফাৎ কি!" আমি বললাম, "ঐ সব পাঁচরকম ভেবেই আমরা বাঙালিরা পাগড়ী বাঁধি না!" তখন সিং হেসে উঠল। আমি সময় বুঝে বললাম, সিং, তুই ফার্স্‌ বুঝিস না। সব তাতেই ট্রাজেডি দেখিস।" সত্যি অপমান কেউ করে না, তা নয়। খুব করে। তবে রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে লাভ কি!

১৮৯৬ সালের লণ্ডনে আমি মোটর গাড়ি দেখি নেই। শুনেছিলাম যে যুবরাজ এডওয়ার্ডের একখানা আছে! পারিসে অনেকগুলো দেখলাম। কিন্তু এমন বেঢপ অদ্ভুত যান যে আজকার দিনে লোকে রাস্তায় দেখলেই হেসেই আকুল হবে। প্রায় টমটমের মতো উঁচু গাড়ি, ছোট্ট বনেট, খাড়া হয়ে বসে একটা লোহার ডাণ্ডা ধরে চালাতে হয়। আর আওয়াজ, এখনকার ভদ্রবংশীয় মোটর সাইকেলও অত ফট্‌ফটাফট্‌ আওয়াজ করতে পারবে না। অধিকাংশ গাড়ির আবার মাথার উপর রঙিন চাঁদোয়া খাটানো। সেই চন্দ্রাতপতলে দু তিনজন জুলজুলে দাড়ি ছোকরা ফরাসিবাবু সিগারেট মুখে গল্প করতে করতে চলেছে, দেখে ভারি মজা লাগত। সব গিয়ে জমা হত সরকারী বাগান—'Bois be Boulogne-এ, এক বড়ো নামজাদা কাফি-খানায়। পাশে এক কৃত্রিম জলপ্রপাত ছিল বলে তার নাম, Cafe de la Cascade। বড়ো বড়ো বাবুলোকেব আড্ডা কিনা, তাই খাবার দাবারের অসম্ভব দাম নিত। গরিব লোকের গতায়াত ছিল না। আমি কিন্তু রোজ ঐ কাফেতে গিয়ে জুটতাম, আর দুদণ্ড বসে একটা লেমনেড খেয়ে বাড়ি ফিরতাম। লেমনেডের দাম লাগত প্রায় এক টাকা। তখনকার দিনে বাইসিকেলও একটা শৌখিন চিজ ছিল। আমি সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে একখানা লণ্ডন থেকে কিনে নিয়ে গেছলাম। সেটা থাকত পার্কেই, এক দোকানে। রোজ সকালে বাসে করে গিয়ে বাইসিকেল চড়ে বাগানে ঘুরতাম। এই সূত্রে দুচারজন ফরাসি বাবুলোকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। এক-আধবার তারা মোটরেও চড়িয়েছিল। মোটে ভালো লাগে নেই। রূপ শব্দ ও গন্ধ, তিনটেই এমন বিকট, যে রস কিছুই পেতাম না। তার চেয়ে আমার দুচাকার পা-গাড়ি চেপে ঢের বেশি আনন্দ পেতাম।

আমি যাঁদের বাড়িতে ছিলাম, তাঁরা খুব সাদাসিধে লোক। পরিবারে মাত্র একটি পুরুষ মানুষ। তিনি সব দিন বাড়ি ফিরতেন না, দেরি হলে তাঁর কারখানাতেই রাত কাটাতেন। যাঁদের সঙ্গে আমি দিন যাপন করতাম, তাঁরা সবাই স্ত্রীলোক। সব চেয়ে বড়ো ছিলেন বুড়ি দিদিমা। তাঁর বয়স সত্তর। আর সব চেয়ে ছোটো একটি কুড়ি বছরের মেয়ে, Suzanne। সবাই আমার বন্ধু ও মুরুব্বি ছিলেন।

তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে আমার মতন নাবালকের ডিনারের পর বাড়ির বার হওয়া উচিত নয়। কাজেই এ যাত্রা আমার পারিসের নাচ গান দেখা হল না। Champs d'Elysées দিয়ে যেতে যেতে সব নাচ-ঘরের রোশনাইয়ের দিকে লুব্ধনয়নে চাইতাম, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম যে এবার পারিসে এলে হোটেলে থাকব। মাদাম, মাসিমা ও দিদিমাকে কিছু বলতে পারতাম না, কিন্তু মেয়েটাকে খুব শাসাতাম। একদিন তাকে খুব গম্ভীর ভাবে বললাম, "স্যু, এর শোধ আমি নেব। একদিন তোকে নিয়ে এমনি উধাও হয়ে যাবে, যে তোর দাদা কেঁদে মরবে।" স্যু একটু মুখরা ছিল। আর আমিও না ভেবে চিন্তে মূর্খের মতন তাকে আমার দেশের কথা, অত্মীয়স্বজনের কথা, ইতিপূর্বেই বলে ফেলেছিলাম। কাজেই সেও খুব মুখনাড়া দিত আমাকে। বলত, "রোসো না, তোমার স্ত্রীকে সব লিখে দিচ্ছি। নাচঘরে যাওয়া বের করছি।" বুড়ি দিদিমার সঙ্গে আমার নিত্য রহস্য ছিল যে আমি তাঁকে আমার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার করে দেশে নিয়ে যাব! আমার বন্ধু রায়কে সাক্ষী মেনে প্রমাণ করে দিয়েছিলাম যে আমাদের সমাজে বহু বিবাহ ধর্ম-সংগত। দিদিমাও থিয়েটারি ঢঙে রোজ দুহাত তুলে উত্তর দিতেন, "বাপরে! সে আমি কিছুতেই পারব না, ভাই। যে বাঘ ভালুক ও সাপের দৌরাত্ম্য তোদের দেশে!" এই রকম খোশগল্পে অমূল্য সন্ধ্যাবেলাগুলো কাটত। দিনের বেলা সারা পারিস চষে বেড়াতাম, কখনো একা, কখনো রায়ের সঙ্গে। কোনো কোনো দিন রায়ের বন্ধু এক মাদমোয়াজেলও থাকতেন। আমার রাগ ধরল, "এই তো মাদমোয়াজেল আমাদের সঙ্গে কেমন বেড়ায়, স্যু কেন যাবে না!" বললাম তাকে, "আজ তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে বেড়াতে।" সে লক্ষ্মী মেয়েটির মতন উত্তর দিলে, "মাকে জিজ্ঞাসা করব।" একটু পরে মাসিমা এসে বললেন, "ম্যসিঅ, আজ স্যু আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাব। নিয়ে যাবে?" খুব সৌজন্য করে বললাম, "তার চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি হতে পারে!" গেলামও দুজনকে নিয়ে বেড়াতে সেদিন। কিন্তু আর কখনও স্যুকে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলি নেই। একদিন তার দাদা আমাকে বেড়াতে বেড়াতে বললে, "মশায়, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে ফ্রান্সে কুমারী মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বেড়াতে যায় না। ইংলণ্ডের মতন তো নয়! এখানে লোকে বড়ো নিন্দা করে। আপনি বিরক্ত হবেন না।" আমি হেসে উত্তর দিলাম, "দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। আমি তো ইংরেজ নই। আমাদের দেশে আরও ঢের কড়াকড়ি!"

এবার পারিসে খেমটা নাচ তো দেখা হল না! কি করা যায়! একদিন এঁদের সবাইকে নিয়ে অপেরা দেখতে গেলাম। মেয়েরা ইভনিং পোশাক পরলেন বটে, কিন্তু গলা পর্যন্ত ঢাকা। ইংলণ্ডে শুনেছিলাম যে ফরাসি মেয়েরা ভয়ানক নির্লজ্জ, অর্ধেক গা বের করে খানায়, থিয়েটারে যায়। গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "পারিসে যাদিকে ঐ রকম গা খুলে বেরোতে দেখ, ওরা ভালো স্ত্রীলোক নয়।" সত্য মিথ্যা ঠিক করতে পারলাম না, তবে বুঝলাম যে আমার বন্ধুরা bourgeois, যারা বিংশ শতকের ভাষায়, "wallow in the mire of chestity"—সতীত্বের পঙ্কে খাবি খাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ পারিস দেখার পর মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলাম যে ইংরেজ ও মার্কিন বাবুরা পারিসে যে-সমস্ত স্ত্রীলোকের সংসর্গে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ান, তাদের ফরাসি ভাষায় আধ-সংসারী বলে, তাদের সঙ্গে গেরস্ত ঘরের মেয়েছেলের কোনো সম্পর্ক নেই। পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি। এ-সব সেই যুগের কথা, যখন মার্কিন দেশের মহিলারা টেবিলের leg (পায়া) বলাটাও নির্লজ্জতা মনে করতেন। সে যুগ গেছে, আপদ গেছে!

অপেরা খুব চমৎকার লাগল। ওস্তাদী বিলেতি সংগীতের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তবু বেশ উপভোগ করতে পারলাম। দুটো পালার একটা ছিল Cavallieri Rusti-cana। তার গান ও গৎ এত সুন্দর যে অতি বড়ো আনাড়িও মোহিত হয়ে যায়। ইংলণ্ডের অপেরা আমি দেখি নেই। কিন্তু কি প্রকাণ্ড অরকেস্ট্রা পারিসের এই অপেরায়! নানা রকমের বেহালাই যে কত ছিল তার ইয়ত্তা নেই। একটা দৃশ্য ছিল সুইস্ দেশের বরফের পাহাড় ধসে পড়ার। এই ভীষণ ব্যাপারের সমস্ত আওয়াজটা অরকেস্ট্রা থেকে বের হল। আর একটা দৃশ্য ছিল, একটি মেয়ে পাহাড়ের ঝরনায় জল ভরছে। তারও সমস্ত ধ্বনি নকল করলে অরকেস্ট্রা। ছেলেবেলা থেকে স্বদেশী সংগীতকলার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল, সংগীতাচার্য কৃষ্ণধনবাবুর কল্যাণে। কিন্তু এ এক নূতন ব্যাপার। একটা নূতন আনন্দের দরজা খুলে গেল আমার সামনে। পরে একে একে প্রায় সব বড়ো অপেরার পালাই শুনেছি।

একটা কথা এইখানেই আমি কবুল করি। ইংলণ্ডের অপেরা যেমন দেখি নেই, তেমনই ওখানের জাতীয় চিত্রশালা, বড়ো গির্জা, রাজবাড়ি, কিছুই কখনো দেখা হয় নেই। কিন্তু পারিসে এই ধরণের জিনিস সবই বারবার দেখেছি। এর বিশেষ কারণ কিছু দেখাতে পারি না। যে মানুষ চার বছরেও একবার ব্রিটিশ মিউজিয়ম কি ওয়েস্টমিন্স্টার-এবী দেখে নেই, সে আর কৈফিয়ৎ কি দেবে! তার দুর্দৈব!

পারিসে যত বড়ো বড়ো গির্জা ছিল সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে আমার ভালো লাগত মাদেলিন গির্জা। সেখানকার হাওয়াতে কেমন একটা শান্তির ভাব ছিল। একদিন করলাম কি, আমাদের মাসিমার সঙ্গে মেরী মূর্তির সামনে নীরবে দু ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। অদ্ভুত-দর্শন কিছু অদৃষ্টে হল না, কিন্তু মনটা বড়ো হালকা বোধ হতে লাগল। বাড়ির পথে মাসি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি খ্রীস্টান-মন্দিরে পূজা করলে, তোমাদের ব্রাহ্মণেরা চটবে না?" আমি উত্তর দিলাম, "আমাদের হিন্দু ধর্মগুরুরা ওরকম একচোখো নন।" সত্যি বললাম কি না, কে জানে!

আমার এই এক বাতিক ছিল। যেখানে সেখানে যখন তখন খুব জোর গলায় প্রচার করতাম, যে আমাদের হিন্দুধর্মের মতো উদার ধর্ম কোথাও নেই, এই ধর্মের কোলে সকল পন্থার, সকাল বিশ্বাসেরই, স্থান আছে। একবার জব্দও হলাম খুব। সেটা আরও বছরখানেক পরের কথা। জেনিভা শহরে এক ছোটো হোটেলে ছুটি কাটাচ্ছি। হোটেলটি শহরের বড়ো বড়ো সরাইখানার মতো নয়। ফ্রেঞ্চ সীমান্তের কাছে বাগানের মাঝখানে ছোট্ট একটি বাড়ি, সবসুদ্ধ জনাপনেরো কুড়ির থাকবার ব্যবস্থা। আমরা নানা দেশের লোক সেখানে ছিলাম। তার মধ্যে এক মার্কিন মহিলা তাঁর ছোটো ছেলেটিকে নিয়ে বাস করছিলেন। মহিলাটির স্বামী মনোয়ারী জাহাজে কাজ করতেন। জাহাজ ভূমধ্যসাগরে কোনো বিশেষ কাজে মোতায়েন ছিল। সাহেব সুবিধা পেলেই এসে দুই-একদিন জেনিভায় কাটিয়ে যেতেন। আমার ভাব হল প্রথম তাঁদের বাচ্চা টেডীর সঙ্গে। সে বাগানের বেঞ্চে আমার পাশে বসে রোজ গল্প শুনত। মেম সাহেব দূরে দূরে থাকতেন। একদিন টেডী ডাকাডাকি করাতে কাছে এসে সলজ্জভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "আমিও বসতে পারি কি?" তার পর একদিন জাঁকালো জরীর উর্দী পরা টেডীর বাপও এলেন। তিনি সটান আমার কাছে এসে, এক গাল হেসে, আমার হাতে মোচড় দিয়ে, নাকি-সুরে বললেন, "আপনি টেডীর বন্ধু! আমিও দুদিন বসে আপনার দেশের রূপকথা শুনব। May I?" মজার কথা নয়! ছ ফুট লম্বা, বিশাল-ছাতি লালমুখো এই খোকাটি বসে দুয়োরানী সুয়োরানীর গল্প শুনবে! হাসি চেপে উত্তর দিলাম, "তা বেশ তো! আমার পুঁজি এখনও ফুরোয় নেই।" টেডীর মহা আনন্দ। বললে, "হ্যাঁ বাবা, খুব ভালো গল্প!" এইভাবে এঁদের সঙ্গে বেশ বনে গেল। একদিন হল কি, খেয়ে দেয়ে দু-তিনজন ফরাসি বন্ধুর সঙ্গে দালানে বসে রাজনীতিক তর্ক-বিতর্ক করছি, খুব জোর গলায় ভারতের দুর্দশার বর্ণনা করছি, (সেই বছর পুণাতে বিনা-

বিচারে জেলে পোরার সূত্রপাত হয়েছে) এমন সময় মার্কিন মহিলাটি এসে আমাকে ডাকলেন। আমি উঠে যেতেই বললেন, "আমার ঘরের বাহিরে যে balcony বারান্দা আছে, একবার আসবেন সেইখানে!" আমি তো তখন ছেলেমানুষ, অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তবু মনে হল যে মনোয়ারী সাহেবের আপত্তি থাকতে পারে তো আমার এই রকম যাওয়া আসাতে! জিজ্ঞাসা করলাম, "লেফটেনাণ্ট সাহেব এসেছেন না কি? তাঁকে তো খানার সময় দেখলাম না।" Mrs C. হয়তো আমার প্রাচ্য মনোভাব বুঝলেন। কেননা হেসে উত্তর দিলেন, "না, সে আসে নেই। কিন্তু আমার দেশের কয়েকজন বন্ধু এসেছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।" গেলাম মেম-সাহেবের বারান্দায়। দেখি, জনা তিন চার সাহেব-মেম বসে আছেন। তাঁরা উঠে আমাকে খুব আদর-অভ্যর্থনা করলেন। এক বৃদ্ধা বললেন, "আপনার নাম তো দত্ত? আপনি নিশ্চয় স্বামীজীর আত্মীয়। আমরা সবাই তাঁর ভক্ত। আপনার কাছে হিন্দুধর্মের কথা শুনতে চাই।" শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কি ভয়ানক! আমি তো Mrs C.-র কাছে এক দিনও বেদান্ত দর্শনের নাম করি নেই। তাঁর ছেলেকে রূপকথা বলি, এই অপরাধ। ভদ্রমহিলাকে ভালোমানুষ বলে জানতাম। তিনি আমার সঙ্গে এই দুশমনী করলেন! তাড়াতাড়ি বললাম, "আজ্ঞে না, আমি স্বামীজীর আত্মীয় নই, তাঁকে কখন চক্ষে দেখি নেই। আমি আইন পড়ছি, ধর্মের কিছুই জানি না।" আমার কথা কেউ কানেই তুললেন না। বৃদ্ধা বললেন, "আপনি হিন্দু তো! প্রত্যেক হিন্দুরই ভেডাণ্টে জন্মগত অধিকার। আপনি যা জানেন, তাই বলুন! তাতেই আমাদের লাভ।" গোরিং গাঁয়ের চাষাদের কাছে হিন্দুধর্ম কি, তা বোঝাতাম বটে! পারিসে ম্যুতেল পরিবারের কাছেও সনাতন ধর্মের সার্বজনীন ভাব নিয়ে বড়াই করেছি। কিন্তু এই বিবেকানন্দ-ভক্তদের কি বলব! যাই হোক, বাঙালির ছেলে, কথায় হার মানব! স্বামীজীর জাতভাইও তো বটে! জুড়ে দিলাম যম-নচিকেতার গল্প। সেটা জানা ছিল। মার্কিনরা, বিশেষ করে সেই বৃদ্ধাটি, "বি-ই-উ-টী-ফুল" ইত্যাদি বলে আমাকে উৎসাহিত করলেন। সেদিনকার মতন রেহাই পেলাম। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কেতাবগুলো হাতড়ে হাতড়ে রমেশ বাবুর *"Ancient India"* টেনে বের করলাম। রাত দুটো পর্যন্ত সেটা পড়ে অনেক কিছু বাগালাম। সেই বিদ্যার জোরে দুটি দিন চালালাম ধর্মব্যাখ্যা। তেসরা দিন মার্কিনী দল চলে গেলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম! এদের দলে একটি বছর পনেরো যোলোর ছোকরা ছিল। দিব্যি দুর্বৃত্ত চালাক ছেলে। যাবার আগে সে আমাকে বলে গেল, "You are a cute fella.

How nicely you hoaxed the old birds! তুমি খুব ঘুঘু ছেলে, কি বোকা বানিয়েছ ঐ বুড়ো-বুড়িদের!"

পারিসের কথা বলি, আমি বুর্বঁ রাজাদের ভক্ত ছিলাম না। ফরাসিরা তাদের মাথা কেটেছিল, বেশ করেছিল, এই আমার মনোভাব। তবু, ভেরসাইয়ের রাজবাড়িতে চতুর্দশ লুই কি মারী আন্তোয়ানেতের যে সব চিহ্ন ছিল, তা দেখে মনে বড়ো কষ্ট হত। কষ্ট হত, তবু বার বার দেখতে যেতাম। তাদের বাসের ঘর, ঘরসজ্জা, মায় বিছানা পর্যন্ত সাজান ছিল। এই রাজবাড়ি কত পুরানো স্মৃতিতে ভরা। লুইয়ের লাভালিয়ের ও মন্তেস্পাঁর সঙ্গে যৌবনে প্রেমলীলা—তাঁর বুড়ো বয়সে বুড়ি মেন্তেনঁর হুকুম-বরদারী—পরের যুগে পম্পাদুর ও দুব্যারী কর্তৃক শনৈঃ শনৈঃ ফ্রান্সের সর্বনাশ সাধন—ত্রিয়ানঁতে নবীন সুন্দরী আন্তোয়ানেতের লীলাখেলা—তার পর সর্বশেষ দৃশ্য, ক্ষুধার্ত পারিসিয়ান canaille-এর (জনতার) অভিযান—এ সবই ত ঘটেছিল এই ভেরসাইতে! জরী-জড়োয়া-পরা রাজা রানীর ভিড়ের মাঝখান থেকে এক একবার উঁকি মারত একটি কালো বেঁটে পাগড়ীবাঁধা মূর্তি—দ্যুবারীর পোষা বাঁদর, জামর—Zamor। বাঙালীর ছেলে সে, ফিরিঙ্গি ডাকাতে তাকে ধরে নিয়ে গেছল ছেলেবেলায় কোন্ নদীপারের ছোট্ট গ্রাম থেকে। পাগড়ী বেঁধে ভাঁড়ামি করত, রাজা রানীর মন যোগাত। কিন্তু তার অন্তরের আগুন কোনোদিন নেবে নেই। ১৭৯০ সালের ভীষণ তাণ্ডবে ফরাসির সঙ্গে নেচেছিল এই অনামা বাঙালি ক্রীতদাস।

লুভরে কি কি দেখেছিলাম এখন ভুলে গেছি। দুটো জিনিস শুধু মনে আছে। এক, Venus de Milor মূর্তি। দ্বিতীয়, সেকেন্দর ও পুরুরাজের ছবি। Venus-এর মূর্তিটি জগদ্বিখ্যাত, সর্বাঙ্গসুন্দর। ফরাসিরা একে রেখে দিয়েছে আদর করে এক আলাদা ঘরে। চারি দিকে লাল মখমলের পরদা ঝুলছে। সুন্দরের উপযুক্ত সমাদর। কিন্তু আমার এইটুকু দোষ চোখে পড়েছিল যে এ মানবীর মূর্তি, দেবত্বের চিহ্ন মাত্র এতে নেই।

পুরুরাজের ছবি আমাকে মোহিত করেছিল। আজও মনে আঁকা রয়েছে। জগজ্জয়ী সেকেন্দর বসে রয়েছেন ঘোড়ার উপর, সম্মুখে বিজিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু নৃপতি, তাকে ধরে রয়েছে গ্রীক সেনানীরা। কি আশ্চর্য চোখ এই পুরুরাজের! কি কথা কইছে ঐ চোখ! "আমার শরীর শেকলে বেঁধেছো, সম্রাট্! কিন্তু মনকে বাঁধতে পারবে না তুমি!" মনকেও কিন্তু বাঁধলেন সেকেন্দর! যে সুতো দিয়ে বেঁধেছিলেন, সে সুতো কি আজও পাওয়া যায়!

১০

পারিসে যত দিন থাকবার ইচ্ছা ছিল, তা হল না। কয়েক হপ্তা বাদ এক নিমন্ত্রণ পেলাম পশ্চিম ইংলণ্ড হতে শ্বশুর-স্থানীয় গুরুজনের আমন্ত্রণ, না বলবার উপায় ছিল না। ছুটির তখনও অনেক দিন বাকী, পারিসেও দেখবার অনেক কিছু বাকী। তবু, করি কি, তলপী-তলপা বেঁধে রওয়ানা হলাম। ইংরেজের রাজধানী এবার আরও একঘেয়ে নিরানন্দ লাগল। একে তো লণ্ডনের চেহারা চিরদিনই ঐ রকম, তায় আবার এই মৌসুমে, শরৎকালে, শহর একেবারে খালি। সবাই গেছে বেড়াতে বেরিয়ে। যার নিতান্ত সংগতি নেই, সেই শুধু পড়ে আছে।

দু দিন দুটো নাটক দেখে নিয়ে, তিন দিনের দিন বেরিয়ে পড়লাম পেডিংটন থেকে পশ্চিম মুখে। অনেক পথ অতিক্রম করে নামলাম গিয়ে সমারসেট জেলায় Minehead বলে এক স্টেশনে। এই মাইনহেড অঞ্চলেরই চাষারা একদিন ধর্মের নামে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন টলিয়ে দিয়েছিল। পারে নি কিছু করতে শেষ পর্যন্ত। দলে দলে বেচারারা প্রাণ দিয়েছিল কসাই-জজ জেফ্রিসের হাতে। কিন্তু জগৎকে তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছল যে ইংলণ্ড আর কোনো দিন রোমের হুকুম-বরদারী করবে না। স্টুয়ার্ট রাজাদের তখনকার মতো জয় হয়েছিল সত্যি, কিন্তু কদিনের জন্য!

আর সত্যিই ক্যাথলিক ধর্ম ইংরেজচরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। আমার যে এক ঘর ক্যাথলিক বন্ধু ছিলেন, তাঁদের যতই দেখতাম, ততই এটা বুঝতাম। তাঁদিকে কেমন মনে হত আধা-ইংরেজ! সাধারণ ইংরেজের চেয়ে তাঁদের ভাব ঢের বেশি cosmopolitan, উদার ছিল।

হপ্তাখানেক রইলাম আমরা Minehead-এর কাছে পোরলক বলে গ্রামে, এক মুচির দোকানের উপর তলায়। ছোট্ট গ্রাম, চারি দিকে নিচু পাহাড় ও বন। এ দেশের একটা মস্ত সুবিধা যে বনগুলোতে ঝোপজঙ্গল মোটে নেই, অবাধে সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো যায়। কোথায় ঘাসের ভেতর থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে বেরিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াবে, কোথায় ঝোপের মধ্য হতে বন-বরা দাঁত উঁচিয়ে তাড়া করবে, এ সবের ভয় নেই। বনের ভেতর সাধ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাব্য-চর্চা করা যায়। এক চিত্রকর-দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা গ্রাম থেকে বহু দূরে বনের মাঝখানে বাড়ি নিয়েছেন। চাকর-বাকর রাখেন নেই, রান্না-বাড়া নিজেরাই করেন। গ্রাম হতে এক বুড়ি দিনান্তে এক বার এসে হাঁড়ি-কুঁড়ি মেজে ঝাড়-পোঁছ করে দিয়ে যায়। আমাদিকে একদিন তাঁরা চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। খুব

আনন্দে সারা বিকেলটা কাটিয়ে আসা গেল। বসবার ঘরে প্রকাণ্ড সেকেলে খোলা আতশ-খানা। তাইতে গাছের মোটা মোটা ডাল জ্বলছে! সবাই তার চারি দিকে বসলাম। মেম-সাহেব বড়ো বড়ো রুটির চাকতি, মোটা-মোটা নোনা মাংসের ফালি, ডেভনের মালাই ও ভাপা দই, এন্তার খাওয়ালেন। এঁরা নব-পরিণীত, কিন্তু বয়স নিতান্ত কচি নয়। রোজ এগারোটার মধ্যে রেঁধে খেয়ে বেরিয়ে পড়েন ছবি আঁকতে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা ছবি এঁকে শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন। একটু বিশ্রাম করে, চা, টোস্ট ডিম খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়েন। এবার এঁদের উদ্দেশ্য নিছক প্রেমচর্চা। বোধ হয়, দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘোরেন। হয়তো, বেড়াতে বেড়াতে কানে কানে কত কি বলেন! কে জানে! সে সব তো আর অভিনয় করে আমাদিকে দেখালেন না। তবে বনে সব নিভৃত মনোরম স্থান আমাদিকে দেখাতে দেখাতে তাঁদের চোখে-চোখে যে বিজলী খেলছিল, তা কর্তারা না দেখলেও আমার চোখ এড়ায় নেই। বাবুটির বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, গিন্নীর বছর পঁচিশ, অতএব আমার চোখে বুড়ো-বুড়ি। তাদের রকম-সকম দেখে একটু মনে মনে হেসেছিলাম বই-কি! বনের নানা সুন্দর স্থানের ছবি দুজনে এঁকেছেন। কত আনন্দে, কত উৎসাহে সে সব আমাদের দেখালেন। ছবি মন্দ নয়, তবে তাঁদের কাছে অমূল্য। কেননা তাঁদের জীবনের মধুমাসের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই ছবির সঙ্গে!

পোরলকে সাত দিন মন্দ কাটল না। তবে তখনও পারিসের শোক ভুলতে পারি নেই। নূতন জায়গা লিণ্টনে পৌঁছে কিন্তু সব ভুলে গেলাম। চারি দিকে কী চমৎকার দৃশ্য! গ্রীষ্মকালে টেমস্-তীরে যে সৌন্দর্য দেখেছিলাম, তার সঙ্গে এর ঢের তফাৎ। এ সম্পূর্ণ আরেক রকমের জিনিস। ছোটো বড়ো পাহাড়ে ঘেরা গ্রামখানি। অদূরে সমুদ্র। সমতল ভূমি প্রায় নেই। রাস্তা সব উঁচু-নিচু, ঢেউ-খেলানো। কাছে বন নেই। রাস্তার দুধারে সবুজ ঘাস। সমুদ্রের ধারের পাহাড়টা একেবারে খাড়া। তার গা কেটে তাকের মতন এক সরু বেড়াবার পথ তৈরি করেছে। এখানকার লোকে তার নাম দিয়েছে কার্নিশ। সেই কর্নিশের উপর বড়ো জোর তিন জন লোক পাশাপাশি চলতে পারে। মাথার উপর নীল আসমান, পায়ের তলায় নীল দরিয়া, একা চলতে চলতে একটু স্বপ্নের আমেজ আসে। কিন্তু ঠিক স্বপ্ন দেখার মতো জায়গা নয়। খুব সাবধানে চলতে হয়। সারাক্ষণ একটা ঝড়ের মতন হাওয়া পাহাড়ের গায়ে ঝাপটা মারছে, একবার পা ফসকালেই আর হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কার্নিশের এক দিকটা থেকে হাজার খানেক হাত নামলেই লিনমাউথ বলে

আর এক গ্রাম, জেলেদের বসতি। সামনে পোস্তা-বাঁধা। তার নীচে কাতার দিয়ে মেছো ডিঙি সব নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঢেউয়ের উপর নাচছে। দুচারখানা ডিঙি আবার বালির উপর টেনে তোলা রয়েছে। তাদের মেরামতি চলছে। জেলেগুলোর রং রোদে পুড়ে, নোনা জলে ভিজে, মেহগিনির মতো হয়ে গেছে। আমি তো ক্রমাগত চারি দিকে, উপরে নীচে, ঘুরে বেড়াতাম। এ অঞ্চলের জেলে, চাষাভুষো, সকলের সঙ্গেই যেচে আলাপ করেছিলাম। তবে আলাপ বেশি দূর এগোতে পারত না, ভাষাবিভ্রাটের জন্য। এদের বাঙাল-ইংরেজি, আর আমার বাবু-ইংলিশ, এ দুয়ের সঙ্গত কিছুতেই জমত না। হাত পা নাড়াই দু'পক্ষের প্রধান সম্বল ছিল। হপ্তাখানেক অভ্যাসের পরে তাইতেই কাজ চলে যেত। লিনমাউথ থেকে খানিকটা হেঁটে গেলেই এক সুন্দর বন। কতকটা পোরলকের বনের মতই তবে তার চেয়ে আরও মনোরম। সেই বনের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে লিন নদী। নামেই নদী, কিন্তু সত্যি একটি পাগলী নির্ঝরিণী। কোথাও পাথর থেকে পাথরে লাফ মেরে মেরে ছুটেছে, কোথাও বা বাধা পেয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, আবার কোথাও বা পাথরগুলোকে পাশ কাটিয়ে কুলু-কুলু করে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলেছে। ভারি চমৎকার দেখতে! এ বিলেত দেশটার মজাই এই। বন, পাহাড়, নদী, মায় সমুদ্র পর্যন্ত, সব যেন খেলাঘরের দৃশ্যপট! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটুও ভয় করে না। ভয় হয় বরং এখানকার বিশালকায় রক্তবদন মানুষগুলোকে দেখলে। কিন্তু তাদেরও কেবল বাইরেটা ওইরকম। অন্তর ছেলে-মানুষের। আমাদের মতন ইঁচড়ে-পাকা পদার্থ এ দেশে দুর্লভ।

ইংরেজদের খাওয়া-দাওয়া কতকটা আমাদের হিন্দুস্থানীদের মতন। মোটামেঠো স্বাস্থ্যকর খাবার খানিকটা পেটে পুরলেই হল। যাতে তাকৎ হয়। সে ভোজনের ভেতর সভ্যতা বা মার্জিত রুচির চিহ্নমাত্রও আমার নজরে পড়ে নেই। পাঠককে তো বলেছি যে লিণ্টনে আমি শ্বশুর বাড়িতে বাস করছিলাম। সুতরাং ভোজনাদি জামাই আদরেই চলছিল। গ্রাউস নামে এক শিকারের পক্ষী ওই মৌসুমে সকল বড়ো লোকেই খায়। কর্তা একদিন সে উপাদেয় পদার্থ আমার জন্য ফরমায়েশ করলেন। খবর শুনে আমি খুব খানিকটা jog trot দৌড়ে খিদে বাড়িয়ে এলাম। খানায় বসে প্রথমে মামুলি সুরুয়া, ও ময়দার-কাইসংযুক্ত সিদ্ধ মাছ খাওয়া হল। আমি তখন অজানার প্রতীক্ষায় একটু উত্তেজিত। বাড়িওয়ালি যখন ধূমায়মান এক বড়ো বারকোশ হাতে প্রবেশ করলে, তখন আমি মনের আবেগে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা উৎকট গন্ধ এসে আমার নাকে ঢুকল। আমি বসে

পড়লাম। কর্তা একটু হেসে বললেন, "Hallo, don't you like the flavour? কি হে, গন্ধ কেমন লাগছে? ওই তো তোমার গ্রাউস। খেয়ে দেখ, কী চমৎকার!" আমি তখন মর্মাহত। এত আশায় ছাই পড়ল। আস্তে আস্তে নিবেদন করলাম, "আমাকে ক্ষমা করতে হবে। ও জিনিস মুখে দিলে ভারি মুশকিল হবে।" পেটের তখনও খিদে মেটে নেই বটে, কিন্তু flavour, খাই কি করে! কর্তা রাগ করলেন। নিজেও মুখে দিলেন না। বাড়িওয়ালিকে বললেন, "নিয়ে যাও। তোমরা খাও গিয়ে।" গোটা বারো টাকা নষ্ট হল। পরে শুনলাম, যে পক্ষীটি দিন পনের আগে নিহত হয়েছিল, আর ঐ রকম একপক্ষের বাসি মাংস না হলে সুস্বাদু হয় না। মগেরা ঞাপি খায় বলে তাদের কত নিন্দা। রাজার নন্দিনী, পিয়ারী, যা কর তাই শোভা পায়।

লিণ্টন অঞ্চলে তখনকার দিনে রেল ছিল না। পোরলক থেকে কতকটা হেঁটে আর কতকটা ফেটিন গাড়ি চেপে এসেছিলাম। ফেরবার সময় বার্ণস্টেপলে ট্রেন ধরলাম। স্টেশন পর্যন্ত চৌদ্দ মাইল পথ এক প্রকাণ্ড মান্ধাতার আমলের স্টেজকোচে গেলাম। চার ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়ার পিঠে postillion সহিস, লোক সরাবার জন্য থেকে থেকে একটা লম্বা শিঙা ফুঁকছে, বেশ মজার লাগল। তবে পথে Robin Hood কি Dick Turpinএর সাক্ষাৎ না মিললে স্টেজ-কোচের পুরো মজাটা পাওয়া যায় কি!

এবার লণ্ডন ফিরে আমার হস্টেলজীবনের শৃঙ্খল খসল। ব্যাপারটা সহজে সংঘটিত হয় নেই। বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, বিশেষত আমার মাস্টার-মহাশয় রেনকে নিয়ে। তবে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত মানলেন যে আমি সাবালক হয়েছি, আমাকে আলাদা বাসা করে থাকতে দেওয়া যেতে পারে।

শৃঙ্খল খসল বলেই পাঠক যেন মনে করবেন না যে আমার জীবনটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল। তা হয় নেই। তবে কতকটা বিশৃঙ্খল যে হল, তা নিশ্চিত। গেল ক মাস লণ্ডনে সাহেব-সংসর্গেই দিন কাটছিল। খাওয়া-দাওয়া, ঘোরা-ফেরা, গল্প-গুজব সবেতেই তাঁরা প্রধান সাথী ছিলেন। মাঝে মাঝে আমার স্বদেশী গুরুজন-স্থানীয়াদের বাড়িতে উৎপাত করে আসতাম, এই পর্যন্ত। কিছুদিনের জন্য, পরীক্ষা পাস করব বলে একটা উৎসাহও মনে এসেছিল। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে সব উল্টে গেল। সমবয়স্ক স্বদেশী বন্ধুবান্ধব অনেক মিলল। তাঁদের কেউ কেউ আমার মতন সিবিল সার্বিসের উমেদার ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশেরই লেখাপড়ার বিশেষ বালাই ছিল না। তখনকার দিনে বার পরীক্ষার জন্য তো পড়াশুনার আবশ্যক ছিল না!

আমার এই বন্ধুমণ্ডলীর কেউ কেউ গত হয়েছেন, কেউ কেউ বা আছেন। তাঁরা সবাই আমাকে এত স্নেহ করতেন যে, একবার তাঁদের নাম করে স্নেহাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা হবার নয়! আমি কত কি যা-তা লিখছি, এর মাঝে কারও নাম না করাই ভালো!

আমাদের নানাস্থানে নানা রকমের আড্ডা জমত। কোথাও বা তাস-পাশা চলত, কোথাও বা সৌন্দর্য-চর্চা, কোথাও বা ভারত-উদ্ধার। বিলেতে ছাত্রজীবনে সুন্দরী সন্ধান যেমন বিপদসংকুল, তেমনই ব্যয়-সাপেক্ষ। আমার অর্থাভাব ছিল না, বিপদকেও ডরাতাম বলে মনে নেই। তবু একটা সেকেলে ব্রাহ্ম কুসংস্কার সৌন্দর্য-চর্চা সম্বন্ধে আমাকে কেমন অন্ধ করে রেখেছিল। যাক্, তাতে নোকসান কিছু হয় নেই।

তরুণ বয়সে মানুষ যেটা যথার্থ চায়, সেটা excitement, উত্তেজনা। তাস খেলাতে দু পাঁচ টাকা হেরে জিতে সেটা না পাওয়া গেলেও ভারত-উদ্ধারের কাজে তার অপ্রতুল ছিল না! তবে পাঠক হয়তো হেসে জিজ্ঞাসা করবেন, বিলেতে সাহেব সেজে আড্ডা দিয়ে দুঃখিনী জননীর কোন দুঃখটা মোচন করেছিলে? এ কথার আমি উত্তর দেব না। আমাদের সেই বয়সের পাগলামির কথা মনে করে নিজেই যে কম হাসি তা নয়। তবে কি জানেন, পাগলের কাণ্ড দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়, কিন্তু রাগ তো হয় না! যারা সে সময় লণ্ডন-ময় প্রকাশ্য সভা ও গুপ্ত মন্ত্রণা করে বেড়াতেন, তাঁদের অনেকেই পরের জীবনে যথেষ্ট কীর্তি সঞ্চয় করেছেন। তাঁদিকে নগণ্য জ্যাঠাছেলে বলে আবর্জনাস্তূপে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া যায় না। এই ছিল আমার বন্ধুমণ্ডলী। আজ আমি সরকারী মানুষ। রাষ্ট্রনীতি আলোচনা করা আমার পক্ষে অশোভন। তবে দু চারটে গল্প না করলে আবার পুরানো কথা -লেখকের কর্তব্য পালন হবে না।

পরীক্ষা পাস করার কয়েক সপ্তাহ পরে আমরা জনাকয়েক ভারত-সচিব মহাশয়ের দপ্তর থেকে এক পত্র পেয়েছিলাম, এই মর্মে— যদিচ আপনি এখনও সিবিল-সার্বিসের কর্মচারী নহেন, তথাপি সরকারী চাকরের রাষ্ট্রনীতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করা সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী আছে, তাহা আপনি পালন করিতে বাধ্য।

একখণ্ড নিয়মাবলীও এসেছিল চিঠির সঙ্গে! তাকিদসত্ত্বেও যে নিয়ম মেনে চলি নেই, এ খবর আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। ধূম দেখেছিলাম বইকি! তবে এ-সব অনেক পরের কথা, এখন মুলতুবী থাক।

আমি হোস্টেল ছেড়ে প্রথম উঠলাম এক বোর্ডিং হাউসে। সেখানে বেশি দিন টিকতে পারলাম না। সে-সব লোকের সঙ্গে সেখানে রোজ বসতে, খেতে হত, তারা ঠিক আমাদের gentry জাতের ছিল না। পাঠক তো জানেন, উনিশ শতকে জাতিভেদ কিরকম প্রবল ছিল! কার্ল মার্কসের দুন্দুভি তখনও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় নেই।

একটা বাজে গল্প বলি এই বোর্ডিং হাউসের। বাড়িওয়ালির একটি বছর ষোলোর মেয়ে ছিল, ভারি দুষ্টু। সে আমাদের সকলের প্রিয় পাত্রী ছিল। ষোলো বছরের মেয়েকে সেকালে বিলেতে তো আর কেউ স্ত্রীলোক মনে করত না! আমরা Q-কে পোষা বাঁদরটির মতনই দেখতাম। ইতিমধ্যে এক মজা হল। দেশ থেকে X নামে আমার এক বন্ধু এসে সেই বাড়িতে উঠলেন। সে ভদ্রলোক এ মেয়েটির পানে সোজা চাইতে পারতেন না। কখনও গায়ে গা ঠেকলে বিব্রত হয়ে উঠতেন। মুখ কান লাল হয়ে যেত। অথচ মাঝে মাঝে আড় চোখে তার দিকে তাকাতেও ছাড়তেন না। আবার আমরা মেয়েটাকে ঠেলা-ঠেলি ধাক্কাধাক্কি করলে বিরক্তিও প্রকাশ করতেন। একদিন গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, "মশায়, দেশে যখন চিঠি লিখবেন, Q-এর কথা কিছু লিখবেন না যেন। আমার দাদার কানে যদি কোনো রকমে যায়, তা হলেই হয়েছে। ষোলো বছরের তরুণীর সঙ্গে এক বাড়িতে আছি জানলে কেলেঙ্কারের শেষ থাকবে না।"

Q তরুণী শুনে আমার খুব মজা লাগল। কিন্তু সেই বাড়ির আর এক বাসিন্দা Z সেখানে বসে ছিলেন। তিনি চটে আগুন হয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, "হতভাগা! এ-সব লোক বিলেতে কেন যে আসে, জানি না! থাম, দেখে নিচ্ছি ওকে।"

সন্ধ্যাবেলায় এক বাক্স চকোলেট কিনে নিয়ে এসে Z আমাকে বললেন, "ওহে মেয়েটাকে একবার ডাকো তো!" Q এলে পর তাকে বললেন, "বাঁদরী! এক কাজ করতে পারিস তো তোকে এই চকোলেট দেব।" "সবটা?" "হ্যাঁ, সবটা।" "আচ্ছা কী করতে হবে, বল!" আজ খানার পর সকলে আমরা যখন বিলিয়ার্ড ঘরে বসব, তুই আচমকা গিয়ে X-এর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করবি, আর বলবি— আমি তোমায় বড্ড ভালোবাসি। পারবি?" মেয়েটা আস্ত বাঁদরী। দরদস্তুর আরম্ভ করে দিলে। আমাকে বললে, "তুমিও যদি এক বাক্স মেঠাই দাও, তো করব। নইলে পারব না। মার কাছে কানমলা খেতে হবে। আর— মাগো, যে চেহারা!" কী করি, আমি কবুল হলাম। ফলে খানার পর যখন বিলিয়ার্ড ঘরে জমায়েত হয়েছি,

তখন Q বন্ধুবরকে আক্রমণ করে বেশ থিয়েটারী ঢঙে প্রেম নিবেদন করলে। বন্ধুর মুখে কথা সরল না। কোনো রকমে পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিলেন। Q মার কাছে দুচারটে কানমলা ঠিক খেলে। রাত্রে Z আর আমি X-এর দরজায় দাঁড়িয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করলাম। তিনি খিল কিছুতেই খুললেন না। সকালবেলা নাগাদ কিন্তু ভদ্রলোক নিজেকে সামলে নিলেন। চায়ের টেবিলে সবাইকে খুব হেসে "গুড্ মর্নিং" বললেন, যেন কিছুই হয় নেই। তার পর বিকেলে Q-কে এক বড়ো বাক্স টফী কিনে এনে দিলেন।

X ঠিক normal হিন্দুর ছেলে ছিলেন, তা আমি বলছি না। তবে গল্পটা থেকে ইংরেজ মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের যে-সব অদ্ভুত ধারণা ছিল, তার আঁচ পাওয়া যায় বই-কি! সে যাই হোক, X মহাশয়ের পুরোদস্তুর সাহেব হতে বেশি সময় লাগল না।

এই বোর্ডিং হাউস থেকে উঠে আমি নিজের বাসা করলাম। অর্থাৎ একেবারে স্বাধীনতার ধ্বজা ওড়ালাম। আর অন্য লোকের সঙ্গে খেতেও হত না, বসতেও হত না। আড্ডা আরও বেশি জমতে লাগল। পাঠকের মনে থাকতে পারে যে ১৮৯৭ সালে দেশে নানা রকম বিভ্রাট ঘটেছিল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, প্লেগ, খুনোখুনি, কিছুই বাকী ছিল না। এই-সব ব্যাপারে প্রবাসে আমাদের মন বড়ো বিচলিত হয়ে উঠেছিল। দিবারাত্র এই জটলা চলত, যে আমাদেরই পাপে এই সব হচ্ছে। সেই বছর আবার রানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব। কথা হল যে লণ্ডনের ভারতসভা সারা দেশের তরফ হতে মহারানীকে একটা মানপত্র দেবেন, আর আঞ্জুমান মুসলিমের তরফ হতে আর একটা দেবেন। সীমান্তে পাঠানদের উপর অত্যাচার হয়েছে, এই অজুহাতে মুসলমান মানপত্র সহজেই নাকচ করা গেল। কিন্তু ভারতসভায় দেশপূজ্য দাদাভাই আমাদিকে আমলই দিলেন না। আমরা সভায় রীতিমত একটা খুব শোরগোল করে বেরিয়ে এলাম। আমাদের এতেই কাজ হাসিল হল, কেননা পরের দিন টাইম্‌স্ থেকে আরম্ভ করে সব খবরের কাগজই লিখলে যে ভারতের তরুণ দল আর ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। এর পর আমরা নানা প্রকাশ্য সভায় বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসনীতি-সম্বন্ধে আমাদের মতামত জাহির করতে লাগলাম। আমাদের কার্যক্রম কতকটা বে-আইনী ছিল বই-কি! হঠাৎ সুযোগ বুঝে আমাদের দলের কোনো নেতা দাঁড়িয়ে উঠে দুচার কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করলেই আমরা হাল্লা করে দল বেঁধে বেরিয়ে আসতাম। এই-সব ব্যাপারে মহাত্মা দাদাভাই যে আমাদের উপর সত্যি অসন্তুষ্ট হতেন, তা আমরা মনে করতাম না। তবে তিনি কংগ্রেস-দলের কর্তা,

আর কংগ্রেসের ধর্ম তো ছিল ভিক্ষাবৃত্তি, তাই প্রকাশ্যে তিনি আমাদিকে কোনো আস্কারা দিতেন না। একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলাম। আমাদের সমস্ত বক্তব্য তিনি শুনলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আমাদের মতন দুটি অর্বাচীন বালককে নিয়ে তিনি কাটালেন। এক মুহূর্তের জন্যও হাসলেন না, ঠাট্টা করলেন না! আমরা মোহিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। এটা স্থির বুঝে এলাম যে তিনি যথার্থ সারা ভারতের নেতা, একা কংগ্রেসের নয়।

দাদাভাই এই সময়টা অত্যন্ত গরিবানা ভাবে কাটাচ্ছিলেন। দূর শহরতলীতে একটি ছোট্ট কামরা নিয়ে থাকতেন। তার আসবাবপত্র নিতান্ত সাদা-সিদে। একটি সরু লোহার খাট, ছোটো একটি লেখবার টেবিল, খান দুই অতি সাধারণ কেদারা। চারি দিকে গাদাগাদা বই, কতক তাকের উপর, কতক ভুঁইয়ে পড়ে। খাটের পাশে দেওয়ালে ঝুলছে পিজবোর্ড কাগজে আঁটা একখানা ব্যঙ্গ-চিত্র। নাম, "কালা আদমী কে?" বিলেতের প্রধান মন্ত্রী সল্‌স্‌বেরী গায়ের জ্বালায় একদিন দাদাভাইকে Black man বলেছিলেন। সেই উপলক্ষে এই চিত্র একখানা বিলেতি কাগজে বেরিয়েছিল। চিত্র দেখে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, দাদাভাই মন্ত্রীমহাশয়ের চেয়ে অনেক ফরসা ছিলেন।

আমরা নবভারত সভা বলে এক সমিতি করেছিলাম। ফি শনিবারে কারও না কারও বাসায় বৈঠক জমত। সমিতির কাজ-সম্বন্ধে কোনো ঢাক-ঢাক গুড় গুড় ছিল না। বিজ্ঞাপনাদি খোলা পোস্টকার্ডেই যেত। তা ছাড়া, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতসচিবের একজন এল্‌চী এসে আমাদের সমিতিতে দাখিল হলেন। তিনি কি আর বলেছিলেন যে তিনি সরকারী আদমি! বরং ভারতজননীর জন্য আমাদের চেয়েও বেশি ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। তবে ভাবগতিকে বোঝা গেল যে তিনি আমাদের মতন বোকা নন, সমিতি করে দু পয়সা রোজগার করছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বয়সের যোগ্যই ছিল, অর্থাৎ বেজায় গরম। আমাদের দুই একজন মুরুব্বির নাম করলেই পাঠক আন্দাজ করতে পারবেন যে কত গরম। হাত কাটা ফিনিয়ান মাইকেল ডেভিট যিনি সেই সবে দশটি বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছিলেন, সোশিয়ালিস্টদের বড়ো কর্তা হাইণ্ড্‌ম্যান, মজুরদলের দুর্দান্ত নেতা টম ম্যান, এঁরাই আমাদিকে সলা পরামর্শ দিতেন। নবভারতের দল ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। গরম ভাবনা ও গরম বাক্য (কার্য ছিলই না, গরম কি ঠাণ্ডা!) আমাদের বয়সের লোকের বেশ ভালোই লাগত। ক্রমশ দেখা গেল যে অনেকে শনিবার সন্ধ্যার অন্য ভালোমন্দ আমোদ উত্তেজনা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বৈঠকে আসতে

আরম্ভ করলে। এতে, আর কিছু হোক আর না হোক, তাদের পয়সা বাঁচত।

একদিন ডেভিট্ আমাদের দুই একজন দলপতির কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। সেই প্রস্তাবমত কাজ হলে ভারতের রাজনীতির একটু তফাৎ হত বই-কি! ডেভিট্ বললেন, "আমাদের আইরিশ দলের বড়ো অর্থাভাব। তোমরা যদি বছরে আট লক্ষ টাকা নগদ দাও, তো তোমাদিকে আয়র্লণ্ডের আটটা seat, মেম্বরের জায়গা, দিতে পারি। বিলেত সংক্রান্ত সব বিষয়ে তোমাদের আট জনকে আইরিশ নেতার হুকুম মাফিক ভোট দিতে হবে, আর ভারত সংক্রান্ত বিষয়ে আইরিশ দল তোমাদের তরফে ভোট দেবে। রেডমণ্ডের সঙ্গে কথা কয়েছি। আমি তাঁকে রাজী করতে পারব। তোমরা কংগ্রেসের কর্তাদের বলে টাকাটার ব্যবস্থা করো।" এ কথায় কিন্তু দাদাভাই কানই দিলেন না। বললেন, "ওরকম কূটনীতিতে ভারতের উদ্ধার সাধন হবে না।" বোধ হয়, 'অভদ্র' কথাটাও বলেছিলেন। তখন ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের ভব্যতা আমাদের মজ্জায় ঢুকেছে কিনা!

একবার আমরা নওরোজী সাহেবকে খুব জোর জবরদস্তি করাতে তিনি প্রকাশ্য সভায় সরকারকে কড়া কড়া দু কথা শোনাতে রাজী হলেন। বেশ জোর একটা মন্তব্যের খসড়া হল। আমরা মহা উৎসাহে কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। ইংরেজ-সাধারণের মনেও বেশ একটু উত্তেজনা দেখা গেল। কিন্তু হঠাৎ আগের দিন আমাদের কানে এল যে একজন খুব সিনিয়ার ছাত্র মিস্টার নওরোজীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে সভায় বক্তৃতা করবেন। তখন আর কিছু করবার সময় নেই। লোকটাকে, দরকার হলে, তুলে রাস্তায় ফেলে দিতে হবে, এই স্থির করে পরের দিন আমরা চোখ পাকাতে পাকাতে সভায় গিয়ে বসলাম। আমরা ভব্যতার ধার ধারতাম না। এই আমাদের একটা বড়ো গর্বের বিষয় ছিল। দাদাভাই যখন রায়কে ডেকে পাঠালেন, আমরা ভাবলাম একটা কিছু রফার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা আরও গরম হয়ে উঠতে লাগলাম। একটু পরে রায় একখানা কাগজ এনে আমাদের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, "এই M-এর amendment, দাদাভাই বলছেন যে এতে তোমাদের কোনো আপত্তি থাকার তো কথা নয়!" পড়ে দেখি amendment-টা আসল মন্তব্যের চেয়েও বেশি কড়া। আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম। একজন ছাত্র বিশ্বাসঘাত করবে, এ চিন্তা আমাদের অসহ্য হয়েছিল। M খুব জোর বক্তৃতা করলেন। বোম্বাই বন্দর ও বস্টন বন্দরের নাম করে সরকারের উদ্দেশে যে-সব কথা বললেন, তা আজকের দিনে বলা চলে না। খুব হৈ হৈ করে মিটিং ভঙ্গ হল।

যথাকালে এই সভার খবর দেশে পৌছল। বোম্বাই ও কলকাতার প্রবীণ

মহারথীরা বড়ো বিচলিত হলেন। বৃদ্ধ দাদাভাই কতকগুলো বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছোঁড়ার পাল্লায় পড়ে কংগ্রেসের চিরন্তন নীতির মাথায় মুগুর মারবেন! এ তাঁরা কেমন করে সহ্য করবেন? দু পাঁচখানা কাগজে লিখলে যে, বৃদ্ধ দাদাভাইয়ের ভীমরতি ধরেছে, তাঁর আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। আমরা শুনে আগুন হয়ে উঠলাম। এত বড়ো আস্পর্ধা! একমাত্র স্বার্থত্যাগী দেশনেতা নওরোজী তাঁকে কিনা এই সব কথা বলে! আর বলে কে, যত স্বার্থসর্বস্ব পেট-মোটা উকীলবাবুরা! আমাদের দুই একজন তৎক্ষণাৎ দেশে ফিরে গিয়ে practical steps নেওয়ার কথা উত্থাপন করলেন। কিন্তু হঠাৎ কর্মবীর হওয়ার মতো উদ্যম আমাদের কারও বোধ হয় ছিল না। শেষ, অনেক পরামর্শের পর স্থির হল যে আমরা দাদাভাইয়ের এক শ্বেতপাথরের মূর্তি করিয়ে দেশে পাঠাব। খবর নিয়ে জানা গেল যে প্রায় তিনশো পাউণ্ড খরচ পড়বে। অত টাকা আমরা কোথায় পাব আমাদের একশো পাউণ্ড জমা হল। তাই নিয়ে ওয়েডারবার্ণ সাহেবের কাছে দুই একজন গেলেন। এই সাহেব একজন যথার্থ ভারতবন্ধু ছিলেন, আর দাদাভাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমাদের সব রকমে সাহায্য করতে রাজী হলেন, কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালেন দাদাভাই নিজে। তিনি বললেন, "আমার মূর্তির সাধ হয়, তো মুখের একটা কথা খসালেই তো আমার বন্ধু তাতা কাল একটা মূর্তি খাড়া করে দেবেন। তোমরা গরিব ছাত্র, আমার বন্ধু, তোমাদের পয়সা আমি কেন নেব! আমরা তখন প্রস্তাব করলাম যে আমরা সারা ভারতময় চার চার আনা চাঁদা সংগ্রহ করে টাকা তুলব। তাতে তো কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। ওয়েডারবার্ন্ এই প্রস্তাবে দাদাভাইকে রাজী করালেন। তখন আমরা ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস আপিসে চিঠি পাঠালাম যে আমাদের একশো পাউণ্ড তৈয়ের আছে, তাঁরা সকলে চেষ্টা করে আর দুশো পাউণ্ড তুলে দিন। সকলে দেখুক যে, দাদাভাই দেশের বিশ্বস্ত নেতা! সুরেনবাবু ও গোখলে আমাদের পত্রের একটা করে উড়ো রকমের জবাব দিলেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখলেন, "এ প্রকার কার্যের সহিত আমার এখন কোনোও সম্পর্ক নাই।" তিনি তখন হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। বাকি ছোটো বড়ো নেতারা কেউ বা কাড়লেন না। আমাদের রাগও হল দুঃখও হল। একজন বন্ধু বললেন, "দেশ এখনও জানে না, আমরা কে! একদিন চিনবে।" কথাটা বেশ শোনাল। কিন্তু আমাদের চেনা অতি সহজ। আমরা সেই চিরদিনের সোনার পাথরবাটি, কাঁটালের আমসত্ত্ব!

এই-সব ঝড় তুফানের মাঝে আমার I. C. S. তরীখানা প্রায় তলিয়ে গেছল

আর কি! কিন্তু হাল ছিল শক্ত হাতে, তাই শেষ পর্যন্ত কূল-কিনারা মিলল। তবে আমার তরী কূলে লেগে মঙ্গল হল কি না, কে জানে!

পরীক্ষার বছর-খানেক আগে কলেজটা ঝেড়ে ফেলে দিলাম। রেন সাহেব আমার মতন ভবঘুরের মাঝে কী দেখেছিলেন, জানি না। আমাকে এক বছর অর্ধেক মাইনেতে রাখতে চাইলেন। বললেন, "আমার টাকা মারা যাবে না। সে ভয় আমার নেই। পাস হয়ে দেশে ফিরে বাকি টাকাটা দিও।"

আমি বোঝালাম, "মহাশয়, আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়তো হয়ে উঠবে না। আপনি কেন মিছেমিছি টাকা নষ্ট করবেন। আমি পলিটিক্সে ঢুকব মনে করছি।"

সাহেব বললেন, "পলিটিক্স তো বেশ ভালো career (পেশা) হে! তোমার বুদ্ধিসুদ্ধিও একটু-আধটু আছে। কিন্তু তোমাদের দেশে তো পার্লামেণ্ট নেই, সেখানে কী পলিটিক্স করবে?"

আমি চেপে গেলাম। কী হবে পাগলের খেয়াল সব বুড়োকে বলে! শেষে বৃদ্ধের সঙ্গে এক রফা করলাম! আমি অন্য কোনো কলেজে যাব না, আর যদি পাস হই তো তিনি আমাকে তাঁর ছাত্র বলে দাবি করতে পারবেন। আমি এত গোলমালেও পড়াশুনো বন্ধ করি নেই। তবে পড়াটা দাঁড়িয়ে গেছল একটা গৌণ কাজ। আর নানা রকমের ধান্দাবাজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখ্য কাজ! সাতানব্বই সালটা এই ভাবেই কাটল।

এই সালে পূজার সময় আমি সুইস্ দেশে বেড়াতে গেছলাম। কয়েক সপ্তাহ জেনিভায় কেটেছিল। যে ক্ষুদ্র হোটেলে থাকতাম, সেখানে ইংরেজ সমাগম বড়ো একটা ছিল না। আমি তাই মনের সাধে দিবারাত্র নবভারত পলিটিক্স আওড়াতাম। কতকগুলি নানা দেশের ভবঘুরে শ্রোতাও জুটেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা খুব বক্তৃতা করছি, ইংলণ্ড সম্বন্ধে দুই একটা বেশ অভদ্র কথাও বলেছি, এমন সময় এক প্রকাণ্ড ষণ্ডামার্ক লালমুখো ইংরেজ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল। আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, "মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে। বাহিরে বাগানে আসবেন কি?" বলে বেরিয়ে গেল।

আমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। মনে হল, আমার জীবনে একটা মস্ত শুভ মুহূর্ত এসেছে। এক বছর থেকে আমি কিরীচ খেলা শিখছিলাম। পিস্তলও চলনসই রকম মারতে পারতাম। বড়ো সাধ ছিল যে continent-এ দুই একটা duel লড়ব। এত দিন মোকা মেলে নাই। আজ বিধি মুখ তুলে চেয়েছেন! কাছে বসেছিল এক ফরাসি বন্ধু। তার পিঠ জোরে চাপড়ে বললাম, "ভাই, আমার

সেকেণ্ড হবি তো?" সে হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, "Mais oui, mon ami, নিশ্চয় হব! কিন্তু ইংরেজ লড়বে না।"

আমি বাহিরে যেতেই ইংরেজ ভদ্রলোকটি একটু হেসে বললেন, "বসুন, মশায়। আচ্ছা, আপনি এই হতভাগা বিদেশীগুলোর কাছে ইংলণ্ডের নিন্দা করেন কেন, বলুন দেখি!"

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। খুব নাটুকে ঢঙে বললাম, "আমি ইংরেজ নই, ইংলণ্ডের নিন্দা কেন করব না! আমি সত্য কথাই বলে থাকি, মিথ্যা নয়। তার প্রমাণ চান তো দিতে পারি।"

ইংরেজ তখন হাসছে। বলল, "হলেই-বা সত্য! নিজেদের ঘরের কথা কি অপরকে বলতে আছে? পার্লামেণ্টে জানালে নিশ্চয় প্রতীকার হবে।"

আমি দু পা এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, "যে আসামী, তাকেই বিচারক করতে আমি প্রস্তুত নই। কিন্তু তর্কবিতর্ক বৃথা। আপনি পিস্তল ছুঁড়তে পারেন?"

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল, "ওহো! তোমার ফন্দী এতক্ষণে বুঝেছি। তুমি আমাকে duel লড়াতে চাও! আমি লড়ব না। সাফ বলে দিচ্ছি, my lad, লড়ব না।" তার পর সে আমাকে টেনে পাশে বসালে। বসিয়ে বলল, "দেখ, তুমি তো তর্ক করবে না। আমিও লড়ব না। বোসো, দুজনে একটু গল্পগুজব করা যাক।"

ধীরে ধীরে আমার বীররস উবে গেল। সাহেব বাস্তবিক চমৎকার লোক! এক ঘণ্টা দুজনে বসে গল্প করলাম। উঠবার সময় সে বললে, "বন্ধু, সে দিন এখনও আসে নাই। এখন থেকে রাগারাগি করে কী হবে! তবে বিনা যুদ্ধে আমরা ভারতবর্ষ ছাড়ব না, এটা নিশ্চিত।"

১১

জেনিভা আজ আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। কিন্তু চিরদিনই নির্ভীক, স্বাধীন, অভিনব চিন্তার সঙ্গে এই জায়গাটার কেমন একটা যোগ ছিল। সেকালে পোপের শক্তিকে যারা সব চেয়ে জোরে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই কাল্‌ভিনিস্ট্‌ সম্প্রদায়ের আড্ডা ছিল জেনিভা। তার পরের যুগে যে দু জন মহাপুরুষ অবাধ-রাজশক্তির ধ্বংসের সূত্রপাত করেন, তাঁদের সঙ্গেও এই জেনিভার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে আসতে প্রথমেই নজর পড়ে হ্রদের মাঝে রুসোর দ্বীপ। শহরের অন্য

দিক দিয়ে বেরিয়ে কোশ দশেক গেলেই ফরাসি সীমান্তের পরপারে ফেয়ার্নে গ্রাম। সেখানে আজও ভলতেয়ারের শাতো (আবাস) দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাগানে ভলতেয়ারের মূর্তি। মুখে তাঁর বিদ্রূপের হাসি। দেখলে মনে হয়, যেন বলছেন— রাজা! কে রাজা! Un soldat heureux, নসীবদার সিপাহী বই তো নয়! আমি কয়েক হপ্তা সাধ মিটিয়ে এই Lac Leman-এর ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়েছিলাম। আশ্চর্য হাওয়া! এতে প্রাণের আগুন নেভে না, বরং দ্বিগুণ জোরে জ্বলে ওঠে।

আমি যে হোটেলে বাস করছিলাম, সেখানে একদিন লম্বা চোগা-পরা দুজন উত্তর-আফ্রিকার শেখ এলেন। এঁরা জাতিতে, যাকে বলে, মুর। বয়সে প্রৌঢ়। মূর্তি শান্ত গম্ভীর। তাদের সঙ্গে আমি যেচে আলাপ করলাম। তাঁরা বললেন যে ইসলাম জগৎ সম্বন্ধে এক সভা হবে, তাইতে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশে এখানে এসেছেন। পরদিন বেড়াতে গিয়ে লেকের কিনারে দেখলাম অনেকগুলি তুর্কি যুবক বেড়াচ্ছেন। তাঁদের সব গায়ে কালো সাহেবি পোশাক ও মাথায় লাল Fez-টুপি। আমার শেখদের কাছে খবর পেলাম তাঁরা তুর্কী ও মিশরী তরুণ দল, তাঁরাও ইসলামী সভার জন্য এখানে এসেছেন। দিন দুই বাদে আমাদের হোটেলেই এঁদের সভা হল। সকাল বেলায় আমি লাইব্রেরি ঘরে বসে বিলেতি ছবির কাগজগুলো দেখছি, এমন সময় দুজন সুদর্শন তুর্কী যুবক এসে চোস্ত ফরাসিতে বললেন, "ম্যসিয়, আপনার অনুমতি পেলে আমরা এই ঘরে বসে আমাদের একটু জরুরী কাজ করে নিই।" বুঝলাম যে আমাকে সরে পড়তে বলছেন। বেরিয়ে গেলাম। ঘণ্টা দুই চারি দিক বন্ধ করে ওঁদের মন্ত্রণা-সভা চলল। বেরিয়ে যাবার সময় সেই তুর্কী যুবক দুটি বাগানে আমার সঙ্গে দু দণ্ড কথা কয়ে গেলেন। এঁদের এক জন কায়রোর রাষ্ট্রীয় নেতা মুস্তাফা কামাল, অন্য জন ইস্তাম্বুলের আনোয়ার বে। মুস্তাফা বেশি দিন বাঁচেন নেই। তবে যত দিন ছিলেন তার মধ্যেই লোকের শ্রদ্ধাভক্তি যথেষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর আল্‌লেওয়া কাগজের এক দিন খুব নামডাক ছিল। অন্য ভদ্রলোকটির কথা আর কী বলব! স্বাধীন তুর্কীর দুর্ধর্ষ জেনারেল Enver Pasha-র নাম কে না শুনেছে। আমি কিন্তু তখন এঁদের পরিচয় জানতাম না। তাই ভারতের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সবেগে নিজের মত জাহির করেছিলাম। আনোয়ার যাবার সময় বলে গেলেন, "আপনারা কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের হাত না করতে পারলে আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের ব্যবস্থা আমরা তো একরকম করে এনেছি। দুই এক বছরে সবাই জানতে পারবেন।"

সুইৎসারলণ্ডে থাকার সময় আমি অনেকগুলো ছোটো ছোটো পাহাড় চড়েছিলাম।

চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচু চূড়া ওদেশে অনেক আছে। আমার সাধ ছিল সেগুলো চড়ে চড়ে কতকটা অভ্যাস হলে পরের বছর বরফের পাহাড়ে (Mont Blanc) উঠব। কিন্তু মঁ ব্লাঁ চড়া ব্যয়-সাপেক্ষ। দেশে টাকার জন্য দরখাস্ত করলাম। মঞ্জুর হল না। কাজেই আবার, উত্থায় প্রাবিলীয়ন্তে দরিদ্রস্য মনোরথাঃ। যাক, সে পরের কথা। ইতিমধ্যে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে লাগলাম। সালেভ, (Saleve) চড়বার সময় এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। সে গল্পটা করি। হয়তো তাতে আমার মূর্খতা প্রমাণ হবে। কিন্তু মূর্খতা ছাড়াও আর পাঁচ রকম ভাব যে বিদেশী বাঙালি ছেলেদের মনে খেলে বেড়ায় তারও কিছু আভাস পাওয়া যাবে বই-কি! সালেভ-এর পথে এক জার্মানের সঙ্গে আলাপ হল। তার টুপিতে পালক লাগানো। হাতে লম্বা লাঠি। নানা রকম লম্বাচওড়া কথা কয়ে শেষ আমাকে টিপ্পনি কাটলে, "তুমি তো বাঙালি, সমতল দেশের মানুষ। তুমি কি একদমে সাড়ে চার হাজার ফুট চড়তে পারবে?" "তুমি তো বাঙালি", কথাটা গিয়ে একেবারে মর্মস্থলে বিঁধল। আমি একটুও দ্বিধা না করে উত্তর দিলাম, "হয়তো সুইস কি হাইলাণ্ডারের কাছে হার মানতে পারি, কিন্তু মশায়, তোমার অনেক আগে চূড়ায় পৌঁছাব।" সে হেসে বললে, "দেখা যাবে।"

চড়াই আরম্ভ হতেই আমি খুব বেগ দিলাম। লোকটাকে অনেক দূরে ফেলে হন হন করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। যাঁরা পাহাড়ে চড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এর বাড়া আর মূর্খতা নেই। নিজের দমটাকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে চড়াই ভাঙতে হয়। কিন্তু আমার কি তখন অত বুদ্ধি ছিল! "বাঙালি বলে ব্যাটা টিটকারী দিয়েছে; ওকে খতম করবই!" এই এক চিন্তা আমার মনে। যখন অর্ধেক পথ উঠেছি, হঠাৎ মনে হল যেন চারি দিক অন্ধকার; আর বুকটা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উপস্থিতবুদ্ধি-মত তৎক্ষণাৎ সেই পথের ওপর চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। মিনিট পাঁচেক ওই অবস্থায় থেকে যন্ত্রণাটা কমে গেল। ইতিমধ্যে এক ফরাসি-দম্পতি সেই পথে আসছিলেন। তাঁরা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মহিলাটি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে, অত দৌড়ে চড়াই উঠছিলেন কেন?" আমি উঠলাম। তাঁদের সঙ্গে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে জার্মান বাবুটির গল্প করলাম। ফরাসি ভদ্রলোক নাক সিঁটকে বললেন, "ওদের স্বভাবই ওইরকম। বড়াই বড্ড ভালোবাসে!" তিন হাজার ফুটের ওপর এক ছোট্ট কাফখানা ছিল। ফরাসিরা সেইখানে সরবৎ খেতে বসলেন, আমি শর্দি-গরমির ভয়ে কিছু খেলাম না, এক বেঞ্চে বসে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। একটু পরে

জার্মানটি এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে উপহাস করলেন, "কি হে, তোমার হয়ে গেছে তো!" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আপনি এগোন, মশায়।" সে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। তখন আমি কাফিখানার বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একটা চাকর আমার সঙ্গে দিতে পার, যে আমাকে বনের মধ্যে দিয়ে সোজা পথ দেখিয়ে দিতে পারবে?"

তিনি এক ছোকরাকে সঙ্গে দিলেন। সে সোজা খাড়া পথে আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যে চূড়ায় পৌঁছে দিলে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে Mein Her (জার্মান বাবু) আবির্ভূত হলেন। তখন আমি এক বেঞ্চে কাত হয়ে পড়ে পাইপ খাচ্ছি। আমাকে দেখে ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কতক্ষণ?" আমি উত্তর দিলাম, "অনেকক্ষণ এসেছি, মশায়। আমরা বাঙালিরা সুবিধা পেলেই পাগদাণ্ডি বেয়ে পাহাড় চড়ি।"

ফস্ করে মুখ দিয়ে এই সত্য কথাটা বেরিয়ে গেল। বাঙালি জাতটার দোষই বলুন, আর গুণই বলুন তো এই যে, ক্রমাগত শর্ট-কাট খুঁজছে।

একবার আমার এক বন্ধুবর ও আমি ছোটো এক খেয়াজাহাজে নর্থ সী পার হচ্ছি। সমুদ্র সেদিন প্রথম থেকেই একটু অশান্ত ছিল। জল যেন ফুলছিল। শেষের দিকটায় জোরে তুফান উঠল। জাহাজ ভীষণ রকম দুলতে আরম্ভ করলে। মাল্লারা প্যাসেঞ্জারদের ধরে সব জাহাজের খোলে বন্ধ করে দিলে। আমরা কাপ্তানের হাতে-পায়ে ধরে উপরেই রইলাম। দাঁড়ানো যাচ্ছিল না, কোনো রকমে দুজনে রেলিং ধরে ঝুলছিলাম। মাঝে মাঝে জাহাজের গায়ে বড়ো বড়ো ঢেউ ভেঙে জল উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমাদের কাপড় ভিজে সপ্ সপ্ করতে লাগল, কিন্তু কী আনন্দ! একবার একজন মাল্লা এসে জিজ্ঞাসা করে গেল, "আপনারা নীচে যাবেন না?" আমরা বুক ফুলিয়ে বললাম, "না।" "আচ্ছা, সাবধানে থাকবেন।" বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেল। সুহৃদ্‌বরের উৎসাহ আমার চেয়েও বেশি। তিনি বলতে লাগলেন, "এই রকম করে আমরা দাঁড়িয়ে থাকব শেষ পর্যন্ত! কাল দেশ-বিদেশে সবাই জানবে যে ঘোর বিপদের মাঝে দুটি বাঙালির ছেলে কেমন শান্ত ধীরভাবে তলিয়ে গেছে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য নির্লজ্জ হুড়োহুড়ি কামড়াকামড়ি করে নেই।" জাহাজ কিন্তু ডুবল না। হয়তো ডোববার সত্যি ভয় কখনো ছিল না। যখন আমরা শেল্ড নদীর শান্ত জলে পৌঁছে গেলাম, বোধ হল যেন বন্ধুবর একটু নিরাশই হলেন।

রিগি-র (Righi) চূড়ায় উঠবার সময় আমার সঙ্গে জুটেছিল বিখ্যাত সিবিলিয়ান রিসলী সাহেবের এক পুত্র। দিব্যি ছেলেটি! পাব্লিক স্কুলের ছাত্র।

হাসিহাসি মুখ। খোলা মন, চমৎকার মেজাজ। আমার কু-পরামর্শে আড়পথে পাহাড় চড়তে গিয়ে মিছেমিছি দু ঘণ্টা বেশি ঘুরতে হল। বেচারা ছেলেমানুষ, একেবারে কাবু হয়ে পড়ল, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও মেজাজ খারাপ করে নেই। সন্ধ্যাবেলা স্টীমারে লুসার্ন ফেরবার সময় আবার ঝড় উঠল। নিতান্ত মন্দ ঝড় নয়। একটুক্ষণ সবাই ভয় পেয়ে গেছল। কিন্তু এ ছোকরার দৃকপাতও নেই। যাই হোক, সন্ধ্যাবেলা তাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

বিসলীদের Sylvia বলে একটি ছোট্ট ছবছরের মেয়েও এই হোটেলে ছিল। সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। নীল চোখ, সোনার বরণ চুল। সর্বদা যেন প্রজাপতিটির মতন উড়ে বেড়াত। আমার সঙ্গে তার বড়ো ভাব হয়েছিল। ক্রমাগত পালিয়ে পালিয়ে আমার কাছে এসে হিন্দীতে গল্প করে যেত। হিন্দী কইলে তার মা কিন্তু রাগ করতেন। বলতেন, "এত বড়ো মেয়ে হয়েছিস, এখনও নেটিব ভাষায় কথা কওয়া কেন?" ভদ্রমহিলা আমাকে একদিন বললেন, "কি জানেন, ভদ্রলোকের হিন্দী তো ও কইতে জানে না। চাকরদের ভাষা শিখেছে। ওটা যত শীঘ্র ভুলে যায় সেই ভালো।" আমি হেসে বললাম, "আমার কাছে তো আর চাকরদের ভাষা শিখবে না! আপনি এ কটা দিন আর ওকে কিছু বলবেন না।" এই হিন্দী বলা নিয়ে একদিন ভারি রগড় হল। আমি হোটেলের বারান্দায় বসে আছি, Sylvia আমার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অনর্গল বকে যাচ্ছে। কাছে কয়েকটি আকাঠ অজ-ব্রিটিশার মেয়ে পুরুষ বসে ছিলেন। তাঁরা আমাদের দুজনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। আমি নজর করি নেই। Sylvia আমাকে কানে কানে বললে, "ওরা কী দেখছে?" হঠাৎ তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মাপ করবেন, মহাশয়। আপনি কোন্ দেশের লোক।" আমি উত্তর দিলাম, "আমি ভারতবর্ষের লোক।" ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে Sylvia-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর তুমি, ডারলিং?" ডারলিং অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "আমিও ইণ্ডিয়ান। শুনছেন না আমরা হিন্দুস্থানীতে গল্প করছি?" ভদ্রলোক একটু আমতা আমতা করে আমাকে আবার বললেন, "কিন্তু আপনারা দুজন তো মোটেই এক রকম দেখতে নন! মাপ করবেন এ কথা বলছি বলে।" আমি হেসে উঠলাম, "এক দেশের সব লোক কি এক রকম দেখতে হয়, মশায়!" লোকটি আরও ভ্যাবাচাকা লেগে গেল দেখে আমার দয়া হল। আমি বললাম, "আপনার ভয় নেই। মেয়েটি আপনারই মতন ইংরেজ। আমার দেশে জন্মেছে মাত্র। ওর বাপ মা ভারতবর্ষেই যাবজ্জীবন কাটিয়েছেন।" Sylvia নাছোড়বান্দা; খুব জোরে ঘাড় নেড়ে বললে, "কিন্তু আমি

ইণ্ডিয়ান।" বৃটিশ দলটি কী বুঝল কে জানে। বোধ হয় মনে করলে আমরা দুজনেই ফিরিঙ্গি। রিসলী সাহেবকে গল্পটা বলাতে তিনি হেসে উঠলেন, "আর দিন কয়েক বাদে কোনো ইংরেজ নিজেকে ইণ্ডিয়ানও বলবে না, অ্যাংলোইণ্ডিয়ানও বলবে না।" হয়েছেও তাই!

১৮৯৮ সালে শীতকালে বাড়ি থেকে কড়া হুকুম এল যে আমাকে পরীক্ষা দিতে বসতেই হবে, চাকরি নেওয়া না নেওয়া তাঁরা পরে বিবেচনা করবেন। কাজেই কেতাব-পত্র নিয়ে এক অজ-পাড়াগাঁয়ে বসে মাস তিনেক খুব লেখাপড়া করে এলাম। কতকটা সেই লেখাপড়ার ফলে, আর অনেকটা নসীবের জোরে, পাস হয়ে গেলাম। এখানেই বলে রাখি, যে শেষ পর্যন্ত চাকরিও নিতে হল। বাঁধন ছেঁড়বার মতো শক্তি আমি কোনো দিন সঞ্চয় করতে পারি নেই।

একবার এক বাঁধা বেলুনে চড়েছিলাম। সেদিন খুব জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। চারি দিকে লোকের রুমাল নাড়া আর হুররে হুররে রবের মাঝে যখন আমার বেলুন হেলে দুলে আকাশ-পথে উঠল, তখন কী ফুর্তি, কী আনন্দ! মনে হতে লাগল যেন আমি একজন রীতিমত বিমানচারী হয়েছি। কিন্তু হাজার বারো-শো ফুট উর্ধ্বে উঠে বাঁধনের রশি গেল ফুরিয়ে, রথও গেল থেমে। আধ ঘণ্টাখানেক উপরে খুব দোল খেলাম বটে, দুরবীন ধরে চারি দিকের দৃশ্যও দেখলাম, কিন্তু শেষে ভালো মানুষটির মতো আবার ভূপৃষ্ঠে নেমে আসতে হল। মুহূর্তেক আশা হয়েছিল যে, দমকা হাওয়ার জোরে দড়ি ছিঁড়বে ছটকে বেরিয়ে যাব এক দিকে। কিন্তু শক্ত বাঁধন, ছিঁড়ল না!

শেষ বছরটা বেশির ভাগ উলউইচে কাটালাম। সেখানে পল্টনী আবহাওয়াতে বেশ লেগেছিল। কেডেটদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তাম। নানা রকমের বাচ্চা অফিসারের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব বনত। চিরকালই এটা দেখে এসেছি যে আমাদের সিবিলিয়ানের চেয়ে এই জঙ্গী-অফিসাররা লোক ভালো! ওদের মুখে এক, মনে এক নেই। একটা সরল ছেলেমানুষি ভাব ওরা অনেক দিন বজায় রাখতে পারে।

ঘোড়ায় তো ছেলেবেলা থেকেই চড়তাম কিন্তু উলউইচের চড়া দেখলাম একটু আলাদা রকমের। শুধু ঘোড়া ছোটালেই হবে না, বসার কায়দা, রাশ ধরার কায়দা, সব নির্ভুল হওয়া চাই। কাজেই যত্ন করে ফিরে-ফিরতি সব শিখতে হল। রেকাব ছেড়ে দিয়ে, রাশ ছেড়ে দিয়ে, দৌড়ানো, লাফানো, এও কেডেটদের সঙ্গে করতে হত। সবই সযতনে করতাম। প্রাণে সদাই ভয় যে কেউ ভাববে— বাঙালি, তাই ভয়

পেয়েছে। বাঙালির ভয় পাওয়া কথাটা কিন্তু নিতান্ত বাজে। মায়ের আঁচলে বাঁধা না থাকলে বাঙালিও যা, অন্যেও তা। বাঙালি যারা নয়, তাদিকেও যথেষ্ট ভয় পেতে দেখেছি উলউইচে। এক মিলিশিয়ার সাহেব এক দিন বিনা কারণে ঘোড়া থেকে ধপ করে পড়ে গেল। ঘোড়াটা কিছুই করে নেই, একটু তাজা ছিল, এই মাত্র। সার্জেণ্টরা যখন তাকে তুলতে গেল সে তখন বেহোস, সেরেফ ভয়ে। ওখানে তো ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রথা ছিল না! লোকটাকে ঝট করে স্ট্রেচারে তুলে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার তাকে খুব বকে ধমকে দশ মিনিট পরে ফিরে পাঠিয়ে দিলেন। আবার ঘোড়ায় চড়তে হল।

উলউইচের একটা মজার গল্প বলি। আমার Land-lady, বাড়িওয়ালি, একদিন তড়বড় করে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "স্যার, আপনি কি বাংলা দেশ থেকে এসেছেন?" আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, I have that honour. কিন্তু তুমি কি করে জানলে?" "নীচেতলার কাপ্তান অমুক বলছিলেন। আপনাকে আজ আমি বেঙ্গল কারী-স্টু রেঁধে খাওয়াব।" আমি প্রমাদ গণলাম। কী খাইয়ে বুড়িটা আমাকে বধ করবে দেখছি! তখনকার দিনে কারী জিনিসটাকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখত। মাংস বেশ একটু বাসি না হলে তাকে কারী করা হত না। সন্ধ্যাবেলায় খেতে বসে কিন্তু দেখি যে ভাতের সঙ্গে এক ডোঙা ভরে মাছের ঝোল দিয়েছে। ঠিক আমাদের বাড়ির ঝোলের মতন দেখতে! মালেট মাছ, আলু কপি কড়াইশুঁটি দিয়ে বুড়ি অতি উপাদেয় পদার্থ রেঁধেছে। একবার মনে হল হাতে করে শপাশপ খাওয়া যাক। কিন্তু সাহসে কুলালো না। যাই হোক, কাঁটা চামচ দিয়েও ডোঙাটা সাবাড় করতে বেশি সময় লাগল না। বাসন তুলতে এসে বুড়ি এক গাল হেসে বলল, "আমি তো জানতাম না, আপনি বাঙালি! আমি যে অনেক বছর বারাকপুরে ছিলাম, স্যার! আমার স্বামী সেখানে পল্টনের সার্জেণ্ট ছিলেন।" এর পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে নানা জিনিসের বেঙ্গল কারী-স্টু খাওয়া হল। লণ্ডনের মিত্র-মণ্ডলীও এসে পরখ করে গেলেন। বুড়ি অনেক বকশিশ পেলে। আমাদের সময় লণ্ডনে এখনকার মতো দেশী খাবারের হোটেল ছিল না। একবার মাস তিনেকের জন্য মিস সোরাবজীর ভগ্নী বণ্ড স্ট্রীটে ধুম করে এক রেস্তরাঁ খুলেছিলেন। কিন্তু চালাতে পারলেন না। আমাদের নির্ভর ছিল মিসেস টার্নার বলে এক বাড়িওয়ালির উপর। সে ফরমায়েশ পেলে পোলাও কোর্মা কাবাব পরেটা রেঁধে দিয়ে যেত। কিন্তু dear old মাছের ঝোল, আর কোথাও পাই নেই!

কলকাতায় ছাত্র-অবস্থায় আমরা যেমন দুটো মুরগীর কাটলেটের লোভে

অসাধ্যসাধন করতাম, বিলেতেও তেমনি দেশী খাবারের, সামান্য কারী-ভাতটির পর্যন্ত, গন্ধ পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাতাম। একটা গল্প বলি। একবার আমার দিদি দেশ থেকে এক বড়ো বাক্স ভরে নানা রকমের বড়ি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, "দুটি দুটি করে খাস, ও বড়ি ছমাস চলবে।" যেদিন বড়ি এসে পৌঁছল, তার পরদিন কোথা থেকে একেবারে জনা আষ্টেক অনশনক্লিষ্ট বন্ধু বাড়ি চড়াও হয়ে এসে বললেন, "এই, তোর কাছে আজ চা খেতে এসেছি।" রুটি দিলাম, মাখন দিলাম, সার্ডিন মাছ দিলাম, কেক কিনে এনে দিলাম, সব খেলে। তার পর একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "এইবার তোর বড়ি বার কর দেখি নি।" কোথা থেকে জানলে এরা, কে জানে। কী করি, এক লিপ্টন চায়ের কৌটা ভরা ভাজা বড়ি এনে দিলাম। ঘরে আগুন জ্বলছিল। নিজেরাই বড়িগুলোকে মাখনে ভেজে নিলে। তার পর পোস্ত-বড়ি, টোপা-বড়ি, মায় কুমড়ো-বড়ি পর্যন্ত, যা কিছু ছিল, একে একে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নুন দিয়ে মেরে দিলে। আমাকে দুচারটে দেয় নেই, তা বলছি না। কিন্তু আমার ছয় মাসের খোরাক এক বেলায় লোপাট করলে! দিদিকে সেই মেলেই লিখে দিলাম, "এ দুর্ভিক্ষের দেশে আর বড়ি পাঠিও না।"

বিলেতে সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য পদার্থ ছিল লুচি। আমার এক বাড়িওয়ালিকে আমি শিখিয়ে নিয়েছিলাম। কাজটা সহজে সাধিত হয় নেই। প্রথম দিন টেবিলে যে চীজ উপস্থিত হল, তাকে Dog Biscuit (কুকুরের বিস্কুট) ছাড়া আর কিছু বলা যায় না তবে বুড়ি ভালো রাঁধুনী ছিল। যখন একবার বুঝতে পারলে লুচি দ্রব্যটা কী, তখন বেশি দেরী হল না। যেদিন প্রথম রসাল শুভ্র নিটোল লুচি টেবিলে এসে পৌঁছল, সেদিন কী ফুর্তি। যত বা ফুর্তি আমার, তত ফুর্তি রাঁধুনীর। নূতন নামকরণ হল, Fried wafers। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুরেন্দ্রনাথ যখন ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষী হয়ে বিলেতে এসেছিলেন, তখন একদিন আমার বাসায় এই লুচি খেয়ে গেছলেন। লুচি দেখে বৃদ্ধের কী আনন্দ! হেসে বললেন, "তোমরা যথার্থ ন্যাশনালিস্ট হে বিলেতে ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করছ।"

সুরেনবাবুর সঙ্গে বিলেতে এসেছিলেন ওয়াচ্চা সাহেব ও গোপাল রাও গোখলে। আমরা নব ভারতীয় দল, এঁদিকে স্টেশনে স্বাগত করেছিলাম, ও একদিন বড়ো হোটেলে খানায় নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ওয়াচ্চা ও সুরেনবাবু ছিলেন বিচক্ষণ নেতা। তাঁরা আমাদের মতন অর্বাচীন বালকের দলকেও অবজ্ঞা হেনস্তা করেন নেই। কিন্তু গোখলে নিজে তখন ছেলেমানুষ, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাদিকে বিদ্রূপবাণে এমনই জর্জরিত করেছিলেন যে, আমরা আর বড়ো একটা তাঁর কাছে

ঘেঁষি নেই। আমার সব চেয়ে খারাপ লেগেছিল তাঁর বাঙালির উপর, কী বলব, হিংসা না বিদ্বেষ? আমি ভুলি নেই। বহুকাল পরে যখন সুযোগ পেয়েছিলাম, নব ভারতের ঋণ পরিশোধ করেছিলাম। এত বড়ো লোকের এই ছোটো মন! রাগ হয় বই-কি!

একটা কথা বলব? সুরেনবাবু আমাদের স্পষ্টই আদেশ দিয়ে এসেছিলেন যেন আমরা দেশে ফিরে একটা Extremist (গরম) দল গড়ে তুলি। আমার বেশ মনে আছে, তিনি বললেন, "ওতে দেশের অনেক মঙ্গল হবে। কিন্তু মনে রেখো, আমি প্রকাশ্যে তোমাদের গালাগাল দেব।" অবশ্য সত্যের খাতিরে এটাও এখানে উল্লেখ করতে হয় যে আমরা দেশে ফিরে কোনোও দলই গড়ি নেই। আমি তো একেবারে আমলাতন্ত্রভুক্ত হয়ে পড়লাম। তবে আমাদের জন্য কি আর কোনোও কাজ আটকে ছিল!

আগেই বলেছি যে আমি ব্যারিস্টার হওয়ার অভিপ্রায়ে Gray's Innএ খানা খাচ্ছিলাম। তখন আমাদের Inn ছিল কৃষ্ণকায় ছাত্রদের প্রধান আড্ডা। লোকে ঠাট্টা করে "এশিয়া মাইনর" বলত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ইংরেজ ছোকরাদের স্বভাবের দোষ এই যে নিরীহ লোক দেখলে তারা খোঁচা না দিয়ে থাকতে পারে না। এই খোঁচা দেওয়া নিয়ে কিন্তু নানা গণ্ডগোল বাধত। কেননা আমরা সবাই তো আর নিরীহ গোবেচারা ছিলাম না! ক্রমে এমন হল, রোজই একটা না একটা কিছু নিয়ে খিটিমিটি লাগত। কেবলই ভয় হত, কোনো দিন একটা বড়ো কিছু বাধবে। পাঁচ রকম ভেবে আমি শেষে ডিনার খাওয়া ছেড়ে দিলাম। তখন পাস হয়ে গেছি, ব্যারিস্টার হওয়ার সে-রকম তাড়া তো আর ছিল না!

১৮৯৯ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় লড়াই বাধল, তখন ইংরেজ জাতটার দেশপ্রেম এমনি গেজে উঠল, যে আমরা পাঁচজন বাইরের লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যেখানে সেখানে, যখন তখন, বিনা কারণে, গর্দভবিনিন্দিত রাগে রাষ্ট্রীয় সংগীত চীৎকার শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে উঠল। সভা-সমিতির তো কথাই নেই, একদিন থিয়েটারে একজন লোক গ্যালারী থেকে গেয়ে উঠল,

> Till we have wiped the stain
> Off Britain's name,
> Of black Mazuba Hill.

খানার কাপড়-পরা Stalls-এর সাহেবরাও দাঁড়িয়ে উঠে গাইতে লেগে গেলেন!

চিরদিন শুনে আসছিলাম যে ল্যাটিন জাতির লোকেরা বায়ুগ্রস্ত, তারাই এইরকম আত্মহারা হয়। ভব্য, শিষ্ট, ইংরেজের এ কী হল!

শেষ, এইরকম বাঁদরামি শুরু করলে আমাদের Inn-এর ডিনারেও। খানার টেবিলে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয়-সংগীত জুড়ে দিত। আমাদের ভারি বিরক্ত বোধ হত। একদিন এইরকম মশগুল হয়ে গান চলেছে, সবাই দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাচ্ছে, আমার এক বন্ধু স. ও আমি দাঁড়ালাম না। বড়ো বিরক্ত বোধ হল। বসেই রইলাম। অমনি চার দিক থেকে রব উঠল "দাঁড়িয়ে ওঠ! দাঁড়িয়ে ওঠ!" এ পর্যন্ত আমাদের গরম হয়ে ওঠবার কোনো কারণই ছিল না। আমি বন্ধুবরকে বললাম, "চলো ভাই, বাড়ি যাওয়া যাক। এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" দুজনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় কতকগুলো লোক হুয়ো (hiss) দিয়ে উঠল! আমরাও দাঁড়িয়ে পাল্টা হিস্ করলাম। আমাদের নসীব খারাপ। কেননা, ঠিক সেই সময়ে গান চলেছিল, God bless the Prince of Wales। সবাই ভয়ানক চটে গেল। মনে করলে আমরা মাননীয় রাজপুত্রের অপমান করছি। সেদিন মার খেতে খেতে বেঁচে গেছলাম। তবে মারটা, বোধ হয়, একতরফা হত না। যাই হোক, এ-সব গল্প আজকের দিনে না করাই ভালো। বরং একটা মজার গল্প বলি। তার থেকে পাঠক বুঝবেন যে কিরকম সামান্য কথা নিয়ে ঝগড়া বাধত। একদিন আমার বন্ধু সেন ও আমি এক টেবিলে খাচ্ছি। পাশের টেবিলে খাচ্ছে তিনজন সাহেব ও একজন ভারতবর্ষীয় মুসলমান, নাম আবদুল লতীফ কমরুদ্দিন। তিনজনে মিলে তাকে ক্ষেপাতে আরম্ভ করলে ভারতবর্ষের কথা বলে। শুনলাম একজন বলছে, "তোমাদের ইণ্ডিয়ান নামগুলো কিরকম অদ্ভুত লম্বা!" আমরা চুপ করে গেলেই পারতাম। তা নয়, দুজনে মার-মুখো হয়ে উঠে গেলাম সেই টেবিলের কাছে। লোকটাকে সেন বললে, "তোমার নামটি কি বল দেখি, Throgmorton, না Higginbotham? আমাদের দুজনের নাম Sen ও Dutt." সাহেবটা ফোঁস করে উঠল। এরকম ছোটো-খাটো ব্যাপার তো নিত্য হত! ভায়া আবদুল লতীফ কমরুদ্দিন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর নামটাকে কেটে ছেঁটে ছোটো করেই নিলেন। ভারতবর্ষে ফিরে এসে তাঁর নূতন আখ্যা হল, আলমা লতীফী। আমাদের ঝগড়া করা বৃথায় গেল!

বিলাতের পর্ব এইখানে শেষ করব। ১৮৯৯ সালের শেষের দিকে চাকরির করার-নামা সই করে, সরকারের ছাড়পত্র নিয়ে ফরাসি জাহাজে দেশমুখো রওয়ানা হলাম। স্বতন্ত্র জীবনের শেষ কটা দিন সমুদ্রবক্ষে বেশ কাটল। প্রকাণ্ড জাহাজ, লোকে ভরা। খেলা-ধুলোয়, নাচ-গানে, সবাই মশগুল! যেন কারও সংসারের

ভাবনা চিন্তা নেই। অনেকগুলি পলটনের অফিসার এই জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছে। তারাই সব চেয়ে বেশি হৈ-চৈ করছে। প্রাণ দিতে চলেছে ভদ্রলোকেরা ওদের হৈ-চৈ করার অধিকার আছে বই-কি! প্রতি বন্দরেই আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খারাপ খবর পাচ্ছিলাম। কিন্তু এই সৈনিক-পুরুষদের পরোয়া নেই। আমি একজনের কাছে দরদ দেখাতে গেছলাম। সে গম্ভীরভাবে বললে, "Makes no odds really!" এর মানে, বোধ হয়— কী এসে যায় হার জিতে। সত্যিই তো, কী এসে যায়, যদি মরদের মতন জান দিতে পার! কত তফাৎ এদের সঙ্গে সেই লণ্ডনের বানরগুলোর, যারা স্থানে অস্থানে "Britannia rules the waves" গেয়ে লোককে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল!

পোর্ট সৈয়দ বন্দরে জাহাজে কেমন এক গানের জলসা দিয়েছিলাম, তার গল্পটা বলে আজকের মতো বন্ধ করি। প্রায় চার বছর পরে ইউরোপের ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি, মনের আনন্দে এক তুর্কী টুপি (Fez) মাথায় দিয়ে নামলাম বন্দরে। সঙ্গে বোম্বাইয়ের রতন তাতা। তাঁরও তুর্কী তাজ মাথায়। খুব খানিকক্ষণ শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে এক কাফিখানায় দুজনে বসলাম তুর্কী কাফি খাব বলে। একটি ভিখারি মেয়ে এসে মেণ্ডোলীন বাজিয়ে গান গাইতে লেগে গেল। বেশ গলা মেয়েটার, আর আমাদের জানা ফরাসি ও ইটালিয়ান চুটকী গান অনেক গুলো গাইলে। আমরা মাঝে মাঝে সিকিটা দুয়ানিটা ফেলে দিয়ে গায়িকার উৎসাহবর্ধন করছিলাম। ক্রমশঃ বেশ ভিড় জমে গেল। তখন আমি বললাম, "চলো, একে জাহাজে নিয়ে যাওয়া যাক, তাতা! খুব মজা হবে।" রতনজী রসিক লোক ছিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। বন্দরে পৌছলে, তিনি গিয়ে কাপ্তানের অনুমতি নিয়ে এলেন। জাহাজের বড়ো ডেকের উপর গান জুড়ে দেওয়া গেল। ইংরেজ অফিসারের দল সেই দিকে ভেঙে পড়লেন। প্রায় ঘণ্টা-খানেক জলসা হল। শেষ হয়ে গেলে মেয়েটা তাতার ও আমার সামনে এসে "Pasha!" বলে মুসলমানী প্রথায় কুর্নিশ করলে। আমরা কিছু কিছু বখশিশ দিলাম। ব্রিটিশ সেনানীরা নেটিবের কাছে হার মানবেন! তাঁরাও বেশ কিঞ্চিৎ পেলা দিলেন।

গায়িকা যখন নেমে গেল, তার চোখে জল। এর ভেতর একটু romance ছিল। তবে নিতান্ত মামুলী রকমের! মেয়েটি মণ্টা দ্বীপবাসিনী। বয়স কুড়ির বেশি হবে না। বছর দেড়েক আগে একজন ইটালিয়ান ওকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে আসে। কয়েকমাস একত্র ঘর করার পর, একদিন হঠাৎ লোকটা

কোথায় উধাও হয়ে যায়। সেই থেকে মেয়েটি রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে। অত্যন্ত কষ্টে দিন পাত করছে। কিছু টাকা সংগ্রহ হলেই সে ধারধোর শোধ করে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারে। এই কাহিনী সে বন্দরে আসতে আসতে আমাদিকে বললে। আমি বিশ্বাস করলাম। তাতা করলেন না। ইংরেজ অফিসারেরা, জাহাজের কাপ্তান, এরা তো কিছু জানতই না। জানতে চায়ও নেই। তাতে কিছু এসে গেল না। মেয়েটার সবসুদ্ধ ছয় সাত পাউণ্ড রোজগার হল সেদিন। সে তার দেশে ফিরে গেল কি না, কে জানে!

আমি কিন্তু যথাসময় আমার দেশে ফিরলাম, যদিচ বুকে চাপরাস!